শির্ক কী ও কেন?

(১ম খণ্ড)

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

ড. মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলী

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

IslamHouse.com

الشرك ما هو ولماذا؟

(الجزء الأول)

« باللغة البنغالية »

الدكتور محمد مزمل علي

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

সূচীপত্র

বিষয়

আল্লাহর অলিগণ গায়েব সম্পর্কে কিছুই জানেন না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বত্র হাজির ও নাজির মনে করার বিধান

দ্বিতীয় প্রকার : পরিচালনাগত শির্ক

আল্লাহ তা'আলা এককভাবে মানুষের ভাগ্যের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক ও পরিচালক

ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে মু'মিনদের কর্তব্য

ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষায় মু'মিনের করণীয়

কোন মানুষ বা কোন বস্তুকে সরাসরি উপকারী বা অপকারী বলা শির্ক

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত মানুষের অপর কোন আশ্রয় স্থল নেই

তৃতীয় প্রকার : উপাসনাগত শির্ক

আল্লাহ তা'আলার উপাসনার মাধ্যম

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ফরযকৃত উপাসনাদি

দু'আ ও এর প্রকার

শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপাসনা

দাঁড়িয়ে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ

সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রুকূ‘ ও সেজদা করা

কারো সম্মানার্থে মাথা নত ও কদমবুসী করা

কাউকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেজদা করা

লোক দেখানো সালাত বা সালাত

যাকাত আদয় করা

হজ্জ করা

কা‘বা গৃহ নির্মাণ ও এর হজ্জ করার নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য

কা‘বা গৃহ, মিনা, মুযদালিফাহ ও আরাফার ময়দানে যা করা ইবাদাত তা অন্যত্র করা শির্ক

পশু যবাই ও উৎসর্গ

যবাই সঠিক হওয়ার শর্ত

কোন মাযারে মানত পূর্ণ করা শির্ক

কবর কিভাবে মেলার স্থান ও প্রতিমায় পরিণত হয়?

দান ও সদক্বা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গৃহ পূজা

দেব-দেবীদের ধরন ও প্রকৃতি

মুশরকিরা পাথরের মূর্তি ছাড়াও ফেরেশতা, মানুষ ও জিনদের উপাসনা করতো?

আরব জনপদে প্রচলিত শির্কী কর্মকাণ্ড

কুরায়শ ও আরবদের জ্ঞানগত শির্কী কর্ম

কুরায়শ ও আরবদের পরিচালনাগত শির্কী কর্ম

দেবতারা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিতে সক্ষম

আউলিয়া নামের দেবতাদেরকে শাফা'আতকারী মনে করা

দেবতার নিকট থেকে ভাগ্য যাচাই করা

পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহে নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করা

ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদেরকে প্রতিপালকের বৈশিষ্ট্য দান করা

কোন কোন রোগ নিজ থেকে সংক্রমিত হয় বলে বিশ্বাস করা

আরব জনপদে প্রচলিত উপাসনাগত শির্কী কর্ম

চন্দ্র ও সূর্যকে সেজদা করা

দেবতাদের যিয়ারতে দূর-দূরান্তে সফর করা

দেবতাদের চার পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা

দেবতাদের পার্শ্বে অবস্থান করা

দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করা

দেবতাদের উদ্দেশ্যে হাদিয়া ও মানত দান করা

বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে দেবতাদের গায়ে হাত বুলানো

অন্তরের উপাসনার ক্ষেত্রে তাদের শির্ক

দেবতাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা

দেবতাদের অনিষ্টের গোপন ভয় করা

বিপদে দেবতাদের শরণাপন্ন হওয়া

বিপদে দেবতাদেরকে আশ্রয় স্থল হিসাবে মনে করা

দেবতাদের উপর ভরসা করা

আরব জনপদে প্রচলিত অভ্যাসগত শির্ক

দেব-দেবীদের নামে শপথ করা

দেব-দেবীদের নামে সন্তানাদির নাম রাখা

দেব-দেবীদের নিকট সন্তানদের জন্য কল্যাণ কামনা করা

আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কোন বস্তু হালাল বা হারাম করা

শির্কযুক্ত কথার মাধ্যমে ঝাড়ফুক দেয়া

শিশুদেরকে তা'বীজ পরানো

শিশুদের গলায় ঝিনুকের মুক্তা ঝুলিয়ে রাখা

রোগ নিরাময়ের জন্য ধাতব নির্মিত বালা ব্যবহার করা

মূর্তি ও প্রতিমার স্থলে মেলা বসানো

নবী ও অলিদের কবরে মসজিদ (গির্জা) নির্মাণ করা

পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা

অশুভ ধারণা

উপত্যকার জিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা

বরই গাছ দ্বারা বরকত গ্রহণ করা

কুরায়শ ও আরবদের দাবী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলাম পূর্ব যুগসমূহের মানুষের শির্কে লিপ্ত হওয়ার কারণ

প্রথম কারণ : সৎমানুষদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে শরী'আতের সীমালঙ্ঘন

দ্বিতীয় কারণ : পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ

তৃতীয় কারণ : দেব-দেবীরা কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা

চতুর্থ কারণ : দেব-দেবীদের আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মাঝে মাধ্যম বলে মনে করা

পঞ্চম কারণ : দেব-দেবীদেরকে শাফা'আতকারী বলে মনে করা

প্রথম অধ্যায়ের সারকথা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমদের মাঝে শির্কের বহিঃপ্রকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে জনগণ কর্তৃক তা গ্রহণের ধরন ও প্রকৃতি

বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে এদেশের ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

জনগণের ইসলাম গ্রহণের ধরন ও প্রকৃতি

ভারতীয় মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থার অবনতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে শির্ক চর্চার কেন্দ্রসমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাহেলী যুগের শির্কের কেন্দ্রসমূহের সাথে এ-সবের তুলনা

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যই, যিনি ব্যতীত আমাদের অপর কোন প্রতিপালক ও উপাস্য নেই। দরূদ ও সালাম সেই রাসূল, তাঁর পরিবার ও সাহবীদের প্রতি, যাঁর অনুসরণ, আনুগত্য ও ভালোবাসা ব্যতীত আমাদের ইহকাল ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তির কোনই উপায় নেই। কেয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা এককভাবে আল্লাহ তা'আলাকেই তাদের প্রতিপালক ও উপাস্য হিসেবে গণ্য ক'র এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মনে করে নিঃশর্তভাবে কেবল তাঁরই আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ করে, তাদের উপরেও আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

অতঃপর, আমরা মৃত্যুর সাথে সাথে এমন এক জগতে পদার্পণ করবো যেখানে চিরস্থায়ী শান্তি আর অনাবিল আনন্দ কেবল তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছে, যারা সেখানে সঠিক ঈমান ও 'আমলের অধিকারী বলে স্বীকৃতি লাভে ধন্য হবে। আর চিরস্থায়ী শাস্তি আর অকল্পনীয় দুঃখ ও দুর্দশা কেবল তাদের জন্যেই অপেক্ষা করছে, যারা সেখানে শির্কের মত ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে দণ্ডিত হবে।

এ পৃথিবী হচ্ছে মানুষের আখেরাতে শান্তিময় জীবন লাভের কর্ম ক্ষেত্র। মানুষ যাতে এখানে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদে বিশ্বাসী হয়, সে-জন্যে রয়েছে তাঁর নানারকম আয়োজন। আমরা রূহ জগতে থাকাকালে তিনি যেমন এ-জন্য আমাদের নিকট থেকে তাঁর রুবূবিয়্যাতের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বীকৃতি নিয়েছেন, তেমনি আমাদেরকে এখানে সৃষ্টি করার সময়ও তাঁকে স্বীকৃতি দানের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। আবার যখনই মানুষেরা পারিপার্শ্বিক বিবিধ কারণে তাঁর তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতে শির্কে লিপ্ত হয়েছে, তখনই তিনি তাদের হেদায়তের জন্যে যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন নবী ও রাসূল। তাঁদের সাথে দিয়েছেন হেদায়তের অমিয় বাণী। এ ধারাবাহিকতায় বিশ্ব মানবতার হেদায়তের জন্যে সর্ব শেষ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে। তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর সর্বশেষ বাণী আল-কুরআন। যার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তাঁর সুন্নাতের মাধ্যমে। যারাই তাঁকে ভালবেসে নিঃশর্তভাবে এ দু'য়ের অনুসরণ ও অনুকরণ করবে, তারাই হবে সেখানে সফলকাম। কিন্তু মানুষের এ সফলতার সম্মুখে অন্তরায় হচ্ছে তাদের চির শত্রু শয়তান। আদম আলাইহিস সালাম-কে সেজদা না করার ফলে যেদিন সে আল্লাহর অভিসম্পাত প্রাপ্ত হয়েছিল, সেদিনই সে

আদম সন্তানদেরকে তার মতই অভিশপ্ত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল। সে বলেছিল :

﴿قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝١٦ ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ۝١٧﴾ [الاعراف: ١٦، ١٧]

"আপনি যেমন আমাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করলেন তেমনি আমিও অবশ্য (এ আদমের সন্তানদেরকে) পথভ্রষ্ট করার জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব, অতঃপর তাদের সমুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে তাদের কাছে আসব। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।"[১]

বস্তুত শয়তান তার এ সংকল্প বাস্তবায়ন করার জন্যে নানারকম অপকৌশল গ্রহণ করে চলেছে। আর সে সব অপকৌশলের মাধ্যমে সে বনী আদমকে জড়িত করেছে বিবিধ রকমের অপরাধমূলক কর্মে। যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ হচ্ছে শির্ক। এ শির্কজনিত কারণেই সে অতীতের কাওমে নূহ, 'আদ ও ছামূদ...ইত্যাদি জনপদের লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। সৃষ্টিকর্তা, জীবন-জীবিকা, মৃত্যু ও সব কিছুর মূল পরিচালক

---

[1] . আল-কুরআন;সূরা আ'রাফ : ১৭, ১৮।

হিসেবে আল্লাহ তা'আলাকে স্বীকৃতিদানকারী, দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারীর দাবীদার, কা'বা শরীফের খাদেম কুরায়শ ও আরব জনপদের লোকদেরকেও সে এ শির্কের মাধ্যমেই পথভ্রষ্ট করেছিল। তাদেরকে কতিপয় সৎমানুষ এবং লাত, উজ্জা ও মানাত নামের কাল্পনিক দেবীসমূহ ছাড়াও আরো অসংখ্য প্রতিমা ও দেব-দেবীকে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের কোন কোন বৈশিষ্ট্যে শরীক বলে ধারণা দিয়ে তাদের উপাসনায় লিপ্ত করেছিল। আল্লাহর অলি ও সে-সব দেব-দেবীকে আল্লাহ তা'আলা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ও সুপারিশকারীর ভূমিকা পালনকারী বলেও তাদেরকে ধারণা দিয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যস্থতা ও সুপারিশ পাওয়ার নিমিত্তে আল্লাহর উপাসনার পাশাপাশি এদেরও নানাবিধ উপাসনা করতে অভ্যস্থ করেছিল। তৎকালে হাতে গোণা কিছু লোক ব্যতীত অবশিষ্ট সকল লোকদেরকেই বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে শয়তান তার অতীত সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। সে জন্য কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের মানুষের ঈমান ও 'আমলের শোচনীয় অবস্থা বিচারে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন :

﴿ وَلَقَدۡ صَدَّقَ عَلَيۡهِمۡ إِبۡلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٗا مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٠ ﴾ [سبا: ٢٠]

“আর শয়তান তাদের উপর তার ধারণা সত্যে পরিণত করেছিল। ফলে তাদের মধ্যে মু'মিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করেছিল।”[২]

তবে আল্লাহ তা‘আলার অপার অনুগ্রহে সর্বশেষ নবীর শুভাগমন এবং তাঁর ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীদের সুযোগ্য নেতৃত্বে ইসলামের জয়যাত্রার ফলে আরব বিশ্বসহ এর পার্শ্ববর্তী পারস্য ও রোমান অঞ্চল থেকে শির্ক বিতাড়িত হয়ে সেখানে তাওহীদের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। সেখান থেকে ধীরে ধীরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তাওহীদের অমিয় বাণী। যার ফলে ছিন্ন হয়েছিল শয়তানের দীর্ঘ দিনের পাতানো চক্রান্তের জাল। আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ মানুষ শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পরিণত হয়েছিল এক আল্লাহর দাসে।

সভ্যতার উত্থান ও পতন এটি যেন ইতিহাসের একটি অমোঘ বিধান। তাই এ বিধানের হাত থেকে ইসলামও রক্ষা পায়নি। অতীতের বিভিন্ন জাতির লোকেরা যেমন শয়তানের চক্রান্তে পড়ে ধীরে ধীরে সঠিক দ্বীন পালন থেকে বিচ্যুত হয়ে পুনরায় শির্কে নিমজ্জিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি ইসলামের পরবর্তী অসংখ্য

---

[2] . আল-কুরআন, সূরা সাবা : ২০।

অনুসারীরাও শয়তানের চক্রান্তে পড়ে ধীরে ধীরে সঠিক দ্বীন পালন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। শয়তান অতীতের মানুষদেরকে যে-সব ধ্যান-ধারণা দিয়ে ও অপকৌশল প্রয়োগ করে বিভ্রান্ত করে আল্লাহর রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতে শির্কে লিপ্ত করেছিল, সে সব ধ্যান-ধারণা ও অপকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমেই সে অসংখ্য মুসলিমকেও আল্লাহর রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতে শির্কে লিপ্ত করেছে। তাই শির্কের মত জঘন্য অপরাধে আজ বিশ্বের অসংখ্য মুসলিম জর্জরিত। প্রবল প্রতাপের সাথে যে-সব স্থানে ইসলাম তার তাওহীদী চিন্তাধারা নিয়ে প্রবেশ করে শির্ককে বিদায় জানিয়েছিল, বহুযুগ পূর্বেই সে সব স্থানের সাধারণ মুসলিমদের মাঝে তাওহীদী চিন্তার পাশাপাশি শির্কও পুনরায় আপন স্থান করে নিয়েছে। সে হিসেবে আমাদের দেশে তাওহীদের অবস্থা যে কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়। এখানে যেমন ইসলাম এসেছে অনেকটা ধীরগতিতে, তেমনি আসার পথে প্রভাবিত হয়েছে ভারতীয় হিন্দু বৈরাগ্যবাদের বিষক্রিয়ায়। যার ফলে এদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে প্রকৃত তাওহীদ সম্পর্কেই যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে নি। যারা পেরেছিল তাদের পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা ধর্মীয় শিক্ষার অভাব ও এখানে বৃটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সে জ্ঞান বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি। যার ফলে দেখা যায়, যে সব আলেম ও অলিগণ

এদেশে এসেছিলেন শির্ক বিনাশ করে তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে, সময়ের পরিবর্তনে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে তাঁদের ভক্ত ও সাধারণ অজ্ঞ মুসলিমদের দ্বারা স্বয়ং তাঁদের কবর ও মাযারসমূহই শির্ক চর্চা করার একেকটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর রহমতে ধীরে ধীরে ইসলামী জ্ঞানের চর্চা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে এ সব মাযার ও কবর সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা অনেকটা দূরীভূত হলেও এখনও সাধারণ মানুষের অন্তর থেকে অলিদের ব্যাপারে শির্কী চিন্তাধারার অবসান ঘটে নি। অলিদের মাযার কেন্দ্রিক ছাড়াও এ দেশের সাধারণ মুসলিমদের মাঝে আরো বিভিন্ন উপায়ে শির্কী কর্মকাণ্ড অহরহ হয়েই চলেছে।

শির্ক মানুষের ধ্যান-ধারণা, কর্ম ও অভ্যাসের মধ্যকার যেখানেই হোক, এটি এমন একটি বিষক্রিয়া যে, যদি কারো জীবনে কখনও একটি মাত্র শির্কও সংঘটিত হয় এবং তাথেকে সে ব্যক্তি তাওবা করে মরতে না পারে, তা হলে এই একটি শির্কই তার ঈমান ও জীবনের যাবতীয় সৎকর্মকে নিষ্ফল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এ ধরনের লোকদের ঈমান ও ‘আমলের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم بِٱلۡأَخۡسَرِينَ أَعۡمَٰلًا ١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ صُنۡعًا ١٠٤ ﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤]

"বলুন : আমি কি তোমাদেরকে সে-সব লোকদের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সে-সব লোক, যাদের পার্থিব জীবনের প্রচেষ্টা বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে তারা সৎকর্ম করছে।"[৩]

এ পৃথিবীতে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি দান, এর সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। এটি এমন একটি কাজ যে, এনিয়ে কারো দ্বিমত পোষণ বা এ নিয়ে মতবিরোধ করারও কোন অবকাশ নেই। সে জন্য মহান আল্লাহ বলেন :

﴿أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ [الشورى: ١٣]

"তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার মতবিরোধ করো না।"[8]

এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার মূল কথা হচ্ছে কালিমায়ে তাওহীদকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা ও এর উপর মৃত্যু পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত

---

[3] . আল-কুরআন, সূরা কাহাফ : ১০৪-১০৫।

[4]. আল-কুরআন.সূরা : শুরা : ১৩।

থাকা। আর এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার দাবী হচ্ছে এ তাওহীদকে বিনষ্টকারী শির্ক নামের মহা অপরাধটি কী এবং সমাজে এটি কেন সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখা। তা না হলে যে কোন সময় শয়তানের খপ্পরে পড়ে যে কারো ঈমান ও জীবনের সৎকর্মের যাবতীয় সাধনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এ হেন গুরুতর পরিণতির হাত থেকে যেমন নিজেকে রক্ষা করা আবশ্যক, তেমনি এথেকে দেশবাসী ও বিশ্বের সকল মুসলিমকেও রক্ষা করা আবশ্যক। আর এ আবশ্যকতাবোধই আমাকে এ ব্যাপারে একটি গবেষণাকর্ম চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মানব কল্যাণমূলক এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণাকর্মের তৌফিক দানের জন্য আমি সর্বাগ্রে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। অতঃপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, একাডেমিক শাখাসহ অন্যান্য শাখার কর্মকর্তা ও কমর্কচারীবৃন্দের, যাঁরা আমাকে ‘‘বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রচলিত শির্ক ও বেদ‘আত : একটি সমীক্ষা’’-এ শিরোনামের উপর পি. এইচ. ডি.গবেষণা করার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমার এ গবেষণাকর্মটি আরবী ভাষায় সম্পাদিত হওয়ার কারণে দেশের জনগণের অধিকতর উপকারের স্বার্থে এর শির্ক অংশটিকে বাংলা ভাষায় প্রকাশের জন্য আমি তাতে প্রয়োজনীয় কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করে এর শিরোনাম দিয়েছি **“শির্ক কী ও কেন?”**। আশা

করি, আল্লাহ চাহে তো এ বইখানা পাঠ করলে ইসলাম থেকে বহিষ্কারকারী ও আমল বিনষ্টকারী এ জঘন্য অমার্জনীয় অপরাধ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া সম্ভব হবে এবং সমাজে তা সংঘটিত হওয়ার জন্য পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে কোন্ কোন্ কারণকে দায়ী করা যায়, সে সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হওয়া সম্ভব হবে।

আল্লাহ তা'আলার তাওহীদকে সংরক্ষণ, এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করাই হচ্ছে একজন মু'মিনের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমি আমার এ বইখানা লেখার প্রয়াস চালিয়েছি। এতে উপস্থাপিত বক্তব্য ও তথ্যাবলী সঠিক হলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকবে; আর অনিচ্ছাকৃতভাবে কোথাও কোন ভুল হলে তা হবে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি মার্জনা করেন এবং আমার এ প্রয়াসকে কবুল ও মঞ্জুর করেন; এর দ্বারা তিনি যেন বিপথগামী মুসলিমদেরকে সরল ও সঠিক পথের সন্ধান দান করেন।এর ওসীলায় যেন আমাকে, আমার পিতা-মাতা, পরিবার, সন্তানাদি, মু'মিন ও মু'মিনাত আত্মীয় স্বজন এবং এ বইখানা লিখতে ও তা প্রকাশ করতে যারা নিষ্ঠার সাথে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আখেরাতে জাহান্নামের

আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাত নসীব করেন, আমীন ছুম্মা আমীন।

ড. মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলী
অধ্যাপক
আল-হাদীস এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রথম অধ্যায়	
শির্ক ও যুগে যুগে এর বহিঃপ্রকাশ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	শির্ক শব্দের অর্থ ও এর প্রকারভেদ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	আদি মানুষেরা তাওহীদ পন্থী না শির্ক পন্থী ছিল ?
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	সর্বপ্রথম কোন্ জাতি শির্কে লিপ্ত হয় ?
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	প্রাক ইসলামী যুগে আরব জনপদে প্রচলিত শির্ক
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	আরব জনপদের লোকদের শির্কে লিপ্ত হওয়ার কারণ

শির্ক কী ও কেন ?

প্রথম অধ্যায়

শির্ক ও যুগে যুগে এর বহিঃপ্রকাশ

পাপ মূলত দু’প্রকারঃ একটি বড় আর অপরটি ছোট। আবার বড় পাপের রয়েছে অনেক প্রকার। তবে আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে তন্মধ্যে তিনটি পাপ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর। আবু বকরাঃ নুফাই‘ ইবন হারিছ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلاَثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ - أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

“হে আমার সহচরগণ! আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় অপরাধ সম্পর্কে সংবাদ দেব”? ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিনবার বলেন। আমরা বললাম : হে আল্লাহর রাসূল আপনি বলুন।“তিনি বললেন : সবচেয়ে বড় ও

মারাত্মক পাপের কাজ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া’’। এ কথা বলার পর তিনি পিঠ হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন : ‘‘মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা’’। ‘‘তিনি এ কথাটি বারবার বলতে থাকলে আমরা মনে মনে ভাবলাম, হায় যদি তিনি নীরব হতেন।’’[৫]

এ-হাদীসে যে তিনটি অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে পরিণতির দিক থেকে আল্লাহ তা‘আলার সাথে শির্ক করা হচ্ছে সর্বাধিক মারাত্মক অপরাধ। যারা এ অপরাধ করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার পরিষ্কার কথা হচ্ছে- তিনি কস্মিনকালেও তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

---

[5]. আল-বুখারী, ‘আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ঈসমাঈল, **আস-সহীহ**; সম্পাদনা : ড. মুস্তফা আদীব আল-বাগা, (বৈরুত : দ্বার ইবনে কাছীর আল-ইয়ামামা : ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), কিতাবুস শাহাদাত, বাব নং ১০, হাদীস নং- ২৫১০, ২/৯৩৯ ; আল-ক্বুশাইরী, মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, **আস-সহীহ**; সম্পাদনা : মুহাম্মদ ফুআদ ‘আব্দুল বাক্বী, (বৈরুত : দ্বার এহইয়াউত তুরাছিল ‘আরাবী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানিল কাবাইর , ১/৯৩।

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শরীক করা হলে তিনি কখনও তা ক্ষমা করেন না, (তবে) এর চেয়ে নিম্নমানের অপরাধ হলে তিনি যাকে ইচ্ছা (তা) ক্ষমা করেন।"[৬]

উপর্যুক্ত আয়াতের মর্মের প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যে সব অপরাধ করে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে পরিণতির দিক থেকে তন্মধ্যে শির্কই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ। একটি শির্কমূলক অপরাধ একজন মুসলিমের জন্য পরিণতির দিক থেকে অত্যন্ত ভয়াবহ হওয়ায় দেশের মুসলিম জনগণকে এ জঘন্য অপরাধ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত করানো একান্ত প্রয়োজন। আর এ- প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই আলোচ্য অধ্যায়কে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে।

وما توفيقي إلا بالله

[6] . আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা : ৪৮।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শির্ক শব্দের অর্থ এবং এর প্রকারভেদ

শির্ক শব্দের আভিধানিক অর্থ :

ইবন মানযুর বলেছেন : 'আশ-শির্কাতু' ও 'আশ-শারকাতু' (الشِرْكَةُ وَ الشَّرْكَةُ) সমার্থবোথক দু'টি শব্দ। যার অর্থ : দু'শরীকের সংমিশ্রণ। তিনি আরো বলেন : 'ইশতারাকনা' (اشْتَرَكْنا) আমরা শরীক হলাম শব্দের অর্থ : 'তাশারাকনা' (تَشَارَكْنَا) আমরা পরস্পর শরীক হলাম। দু'জন শরীক হলো আর পরস্পর শরীক হলো বা একে অপরের সাথে শরীক হলো কিংবা শরীক হওয়া, এ-সব শব্দের অর্থ 'আল-মুশারিক' (الْمُشَارِكُ) বা অংশীদার। 'আশ-শির্কু' (الشِّرْكُ) শরীক করাও শরীক হওয়ার মতই। এর বহু বচন হলো : 'আশরাক' ও 'শুরাকা-উ' '(أَشْرَاكٌ وَ شُرَكَاءُ) অর্থাৎ : সকল শরীকান বা অংশীদার।

তিনি আরো বলেন : 'আশ-শির্কু' (اَلشِّرْكُ) শব্দটি 'আল-হিস্সাতু' (اَلْحِصَّةُ) : অংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : [مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِيْ عَبْدٍ...]"- "যে তার কোন

ক্রীতদাসের অংশকে মুক্ত করে দিল...।”[৭] বলা হয়ে থাকে “ طَرِيْقٌ مُشْتَرَكٌ” অর্থাৎ সম্মিলিত রাস্তা, যা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। ‘আশরাকা বিল্লাহি’ (أَشْرَكَ بِاللهِ) সে আল্লাহর সাথে শরীক করলো, অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্বে কাউকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করলো।[৮] (নাউযু বিল্লাহি)

আল-মুনজিদ নামক অভিধানে বলা হয়েছে : (أَشْرَكَ فِيْ أَمْرِهِ) অর্থাৎ- তার কাজে সে (অপর কাউকে) শরীক করে নিয়েছে। (أَشْرَكَ بِاللهِ) অর্থাৎ- সে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। আর যে তা করলো সে মুশরিক হয়ে গেল।[৯]

শেখ যাকারিয়্যা আলী ইউছুফ বলেন :

“কোন ক্ষেত্রে ‘শারাকতুহু’ ও আশ-রাকতুহু’ (شَرَكْتُهُ وَ أَشْرَكْتُه) তখনই বলা হয় যখন সে ক্ষেত্রে আমি কারো ‘শরীক’

---

[7]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল এৎক, বাব নং ৪, হাদীস নং ২৩৮৬, ২/৮৯২; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল এৎক, হাদীস নং ১৫০১, ৩/১২৮৭।

[8]. ইবন মানযুর, লেছানুল ‘আরব; শব্দমূল : الشِّرْكُ, (কুম:নাশরু আদাবিল হাওযাঃ সংস্করণ বিহীন, ১৮০৫হি.), ১০/৪৪৮-৪৫০।

[9]. অধ্যাপক আনতুয়ান না‘মাঃ ও গং, **আল-মুনজিদ**; (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক, সংস্করণ ২১, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ.৩৮৪।

(شَرِيْكٌ) অংশীদার হয়ে গেলাম, ‘শা-রাকতুহু’ (شَارَكْتُهُ)শব্দটিও শরীক এর অর্থ প্রকাশ করে।‘আশরাকতুহু’ (أَشْرَكْتُهُ) শব্দের অর্থ: আমি তাকে শরীক করে নিলাম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي ٣٢ ﴾ [طه: ٣٢]

(হে আল্লাহ) “তুমি হারূনকে আমার নবুওতের অংশীদার করে দাও।”[১০]

তিনি আরো বলেন: ‘শির্ক’ শব্দমূলটি সংমিশ্রণ ও একত্রিকরণের অর্থ প্রকাশ করে। কোন বস্তুর অংশ বিশেষ যখন একজনের হবে, তখন এর অবশিষ্ট অংশ হবে অপর এক বা একাধিকজনের। আল্লাহর বাণী :

﴿أَمۡ لَهُمۡ شِرۡكٞ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ [فاطر: ٤٠]

“তবে কি আকাশমণ্ডলীতে তাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে”[১১] এ-আয়াতে বর্ণিত ‘শির্কুন’ শব্দের দ্বারা এ অংশীদারিত্বের অর্থই প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, একজন অংশীদার

---

10 . আল-কুরআন, সূরা ত্বাহা : ৩২।

11 . আল-কুরআন, সূরা আহকাফ : ৪।

তার অপর অংশীদারের সাথে সংমিশ্রণকারী এবং তার অংশ অপরের অংশের সাথে মিলিত।

তিনি আরো বলেন : কোনো বস্তুতে একাধিক শরীক হলে সে বস্তুতে তাদের প্রত্যেকের অংশ সমান হওয়াটি অত্যাবশ্যক নয়, তাদের একের অংশ অপরের অংশের চেয়ে অধিক হওয়ার পথেও তা কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না, যেমন মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর রেসালতের ক্ষেত্রে স্বীয় ভাই হারূন আলাইহিস সালামকে তাঁর সাথে শরীক করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করলে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ قَالَ قَدۡ أُوتِيتَ سُؤۡلَكَ يَٰمُوسَىٰ ٣٦ ﴾ [طه: ٣٦]

"হে মূসা! তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা হলো।"[১২]

এ কথা বলে আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালাম-এর কামনা পূর্ণ করে থাকলেও রেসালতের ক্ষেত্রে হারূন আলাইহিস সালাম-কে সমান অংশীদার করে দেন নি; বরং সে ক্ষেত্রে হারূন

---

[12] . আল-কুরআন, সূরা ত্বাহা : ৩৬।

আলাইহিস সালাম-এর অংশ মূসা আলাইহিস সালাম-এর অংশের চেয়ে কম ছিল।[১৩]

উপর্যুক্ত বর্ণনার আলোকে আমাদের নিকট এ-কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, 'শির্ক' শব্দমূলটি মূলগতভাবেই মিশ্রণ ও মিলনের অর্থ প্রকাশ করে থাকে এবং এ মৌলিক অর্থটি এর সকল রূপান্তরিত শব্দের মধ্যে নিহিত থাকে। আর দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যকার অংশীদারিত্ব যেমন ইন্দ্রিয় অনুভূত বস্তুসমূহের মধ্যে হতে পারে[১৪], তেমনি তা কোন অর্থগত বা গুণগত[১৫] বস্তুতেও হতে পারে।

---

[13]. যাকারিয়্যা আলী ইউছুফ, **আল-ঈমান ওয়া আ-ছারুহু ওয়া আশশির্কু ওয়া মাযাহিরুহু;** (কায়রো : মাকতাবাতুস সালাম আল- আলমিয়্যা : ২য় সংস্করণ, তারিখ বিহীন), পৃ. ৭৮।

[14]. যেমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কোনো বাড়ী, জমি বা গাড়ীতে সমঅংশে বা বেশ-কমে অংশীদার হওয়া।

[15]. যেমন মানুষ এবং ঘোড়া প্রাণী হওয়ার ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশীদার এবং দু'টি ঘোড়া বাদামী বা লাল বর্ণের হওয়ার ক্ষেত্রে সমানভাবে শরীক হতে পারে।

শির্ক শব্দের পারিভাষিক অর্থ :

ড. ইব্রাহীম আল-বুরাইকান শির্ক-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

'শির্ক'-এর দু'টি অর্থ রয়েছে :

এক. সাধারণ অর্থ, আর তা হচ্ছে- গায়রুল্লাহকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ করা। সমকক্ষ বলতে এখানে মুক্ত শরীকানা বুঝানো হয়ে থাকে, শরীকানায় আল্লাহর অংশ গায়রুল্লাহের অংশের সমান হতে পারে অথবা আল্লাহর অংশ গায়রুল্লাহের অংশের চেয়ে অধিকও হতে পারে। তিনি আরো বলেন :

শির্কের উপর্যুক্ত সাধারণ অর্থের ভিত্তিতে শির্ক তিন প্রকার :

এক. আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শির্ক। এর সংজ্ঞা হচ্ছে- আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে সমকক্ষ করা অথবা কোনো বৈশিষ্ট্যকে তিনি ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা। যেমন সৃষ্টি, জীবিকা, জীবন ও মৃত্যু ইত্যাদির সম্পর্ক অন্যের সাথে করা।

দুই. আল্লাহর উলূহিয়্যাতে শির্ক। এর সংজ্ঞা হচ্ছে- আল্লাহর উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে কাউকে সমকক্ষ করা। যেমন : সালাত, সাওম, পশু উৎসর্গকরণ ও মানত ইত্যাদি অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা।

তৃতীয়. আল্লাহ তা‘আলার নামাবলী ও গুণাবলীতে শির্ক। এর সংজ্ঞা হচ্ছে- আল্লাহর নামাবলী ও গুণাবলীতে কোনো সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ করা।

শির্কের দ্বিতীয় অর্থ :

"আল্লাহর পাশাপাশি গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও মান্যবর হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন, সুন্নাহ ও অগ্রবর্তী মনীষীগণের কথায় শির্ক শব্দটি যখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর দ্বারা শির্কের দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।"[১৬]

আক্বীদার বিভিন্ন কিতাবাদিতে শির্ক-এর যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, তা অনেকটা ড. ইব্রাহীম বুরাইকান কর্তৃক বর্ণিত উপর্যুক্ত সংজ্ঞারই অনুরূপ। উপর্যুক্ত এ সংজ্ঞার দ্বারা যদিও শির্ক'র পারিভাষিক অর্থ অনুধাবন করা যাচ্ছে, তবে আমরা যদি আরো পরিষ্কারভাবে এর সংজ্ঞা জানতে চাই, তা হলে শির্ককে তাওহীদ-এর সংজ্ঞার বিপরীতে দাঁড় করালে তা জানা যেতে পারে। কেননা, শির্ক শব্দটি তাওহীদ শব্দের অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর প্রবাদে রয়েছে 'প্রত্যেক বস্তুকে তার বিপরীতধর্মী বস্তু দিয়ে

---

[16]. ড. ইব্রাহীম বুরাইকান, আল-মাদখালু লিদেরাসাতিল 'আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যাহ 'আলা মাযহাবি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ; (আল-খুবার : দ্বারুস সুন্নাহ লিন নসরি ওয়াত তাওযী', সংস্করণ বিহীন, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১২৫, ১২৬।

পরিচয় করা যায়।’ তাই নিম্নে প্রথমে তাওহীদ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করা হলো এবং পরবর্তীতে এর সংজ্ঞা থেকেই শির্ক-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা হলো।

তাওহীদ শব্দের পারিভাষিক অর্থ :

‘তাওহীদ’ শব্দের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা জুরজানী বলেন: “তাওহীদ হলো: অন্তরে যা কিছুর কল্পনা বা ধারণা হয়, সে সব থেকে আল্লাহ তা‘আলার জাতসত্তাকে মুক্ত করা। তাওহীদ তিনটি বিষয়ের সমষ্টি : মহান আল্লাহকে রব হিসেবে জানা, তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তাথেকে সকল শরীকদের অস্বীকার করা।”[১৭]

আল্লামা জাযাইরী বলেন : তাওহীদ হলো : “মহান আল্লাহ তা‘আলার যাত, তাঁর গুণাবলী ও কর্মসমূহে কারো সমকক্ষ থাকা বা সে সকল ক্ষেত্রে তাঁর কোন সাদৃশ্য হওয়া এবং তাঁর রুবুবিয়্যাত ও উপাসনায় কারো অংশীদারিত্ব থাকা অস্বীকার করাকে তাওহীদ বলা হয়।”[১৮]

---

[17]. আল-জুরজানী, শরীফ আলী ইবন মুহাম্মদ, **কিতাবুত তা‘রীফাত**; (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ.৬৭।

[18].আল-জাযাইরী, আবু বকর জাবির, **‘আক্বীদাতুল মু‘মিন**; (জেদ্দা : দারুস সুরুক, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ.৮৭।

তাওহীদের উপর্যুক্ত দু'টি সংজ্ঞাই অনেকটা সংক্ষিপ্ত হওয়াতে নিম্নে এর অপর একটি বিস্তারিত সংজ্ঞা প্রদান করা হলো :

শেখ আব্দুল আযীয বলেন : "শর'য়ী পরিভাষায় তাওহীদ হলো : বান্দা এ-কথা স্বীকার করবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা হলেন সেই রব যিনি সকল সৃষ্টির জীবিকা প্রদান ও তাদের পরিচালনার কাজ এককভাবেই করে থাকেন, তিনি সকল সৃষ্টির উপাস্য, যাবতীয় উপাসনা ও আনুগত্য এককভাবে তাঁর জন্যেই নিবেদিত। আরো মনে করা যে, তিনি এককভাবে বড়ত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলীর সার্বিক পূর্ণতায় অধিষ্ঠিত।"[১৯]

'শির্ক' যখন 'তাওহীদ' এর বিপরীত তখন শেখ 'আব্দুল 'আযীয কর্তৃক উপরে তাওহীদের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, সে হিসেবে এর বিপরীতে 'শির্ক' এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

"মহান আল্লাহকে সকল সৃষ্টির জীবন-জীবিকা দানকারী, তাদের ভাগ্যের ভাল-মন্দ ও সমগ্র জগত পবিচালনাকারী একক রব হিসেবে মনে না করা। বরং এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির ছোট বা বড় কোনো বস্তু যেমন গ্রহ, নক্ষত্র, বা অলি ও দরবেশ নামের কোনো

---

[19].আব্দুল আযীয আল-মুহাম্মদ আল-সলমান, **আল-আসইলাতু ওয়াল আজইবাতিল উসূলিয়্যাতি আলাল 'আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাতি লি ইবনে তাইমিয়্যাহ;** (প্রকাশ বিহীন, ২১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩২।

নেক মানুষকে এর কোনো কিছুর পূর্ণ বা আংশিক মালিক কিংবা শরীক, অথবা তা পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্যকারী বলে মনে করা। আল্লাহর সমীপে তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কারো জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অপর কোনো অলির শাফা'আত উপকারী হয়ে থাকে বলে বিশ্বাস করা। উপর্যুক্ত রকমের ধারণার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর একক উপাসনা ও আনুগত্য করার পরিবর্তে তাঁদের ওসীলা ও সুপারিশে উত্তম জীবন, জীবিকা ও সৌভাগ্য লাভ করার জন্য তাঁদের উপাসনা ও আনুগত্য করা। আল্লাহর জ্ঞান, তাঁর বড়ত্ব, মহত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে সৃষ্টি জগতের কাউকে তাঁর সমকক্ষ করা।"

অন্য কথায় "এমন সব বিশ্বাস, কাজ, কথা ও অভ্যাসকে শির্ক বলা হয় যার দ্বারা বাহ্যত মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত ও গুণাবলীতে অপর কারো অংশীদারিত্ব বা সমকক্ষতা প্রতীয়মান হয়।"

অপর কথায় বলা যায় : "গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত ও গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যে গায়রুল্লাহকে সমকক্ষ করাকে শির্ক বলা হয়।" শির্কের এ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দু'টি কুরআনুল কারীম থেকে প্রমাণ করা যায়।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ قَالُواْ وَهُمۡ فِيهَا يَخۡتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ۞ إِذۡ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۞ ﴾ [الشعراء: ٩٦، ٩٨]

"তারা (মুশরিকরা তাদের উপাস্য দেব-দেবীদের সাথে) জাহান্নামে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে: আল্লাহর কসম! আমরা তথায় (পৃথিবীতে) প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম।"[২০]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা তাদের পাথর ও কাঠ ইত্যাদির মূর্তিসমূহকে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে সমকক্ষ বানিয়ে নেয়ার কারণেই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে মুশরিক হয়েছিল।

শির্ক যখন আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত ও গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত, তখন সর্বাগ্রে আমাদেরকে এ তিনটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে কেননা; এতে আমাদের নিকট শির্কের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

'রব' হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার গুণগত নাম। আর এ-গুণগত নামবাচক শব্দ থেকেই 'রুবূবিয়্যাত' শব্দটি উদগত হয়েছে। এটা

---

[20]. আল-কুরআন, সূরা শু'আরা : ৯৬-৯৮।

‘রব’ নামের সম্পর্ক বর্ণনাসূচক শব্দ। ‘রব’ শব্দটি আভিধানিক দিক থেকে প্রভু, মালিক, মনিব, প্রতিপালক, কর্তা, অভিভাবক ও দেবতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২১] এ শব্দটি আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্যের বেলায়ও রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে আল্লাহ তা‘আলার বেলায়ই এর ব্যবহার হচ্ছে মূল বা আসল। উপরে ‘রব’ শব্দের যে সব অর্থ বর্ণিত হয়েছে, সে সবই মূলত আল্লাহ তা‘আলার ‘রুবূবিয়্যাত’-এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বিষয়াদি। তবে শর‘য়ী পরিভাষায় আল্লাহ তা‘আলাকে ‘রব’ বলে স্বীকৃতি দিতে হলে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহকে তাঁর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং এর বিপরীতধর্মী চিন্তা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে :

1. তিনি আমাদের ও এ জগতের ছোট বড় সব কিছুর একক সৃষ্টিকর্তা। যেখানে যা কিছু সৃষ্টি করা প্রয়োজন, সেখানে তিনি নিজেই তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী তা সৃষ্টি করেছেন ও করেন। তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত কোনো সৃষ্ট বস্তুর প্রভাবে অপর কোনো বস্তু আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হতে পারে এমন বিশ্বাস করা তাঁকে একক সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাসের পরিপন্থী বলে মনে করা।

---

[21]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, **আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান**; (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ.২৮৫।

2. তিনি এ বিশ্বজগতের সব কিছুর একক মালিক, নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। এ ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরীক ও সাহায্যকারী নেই। এ-জগত পরিচালনা কর্মে তাঁর অনুমতি ব্যতীত শাফা'আতের নামে তাঁর নিকট অনধিকার চর্চা করার মতও কেউ নেই। ফেরেশতাগণকে কোনো কোনো বিষয় পরিচালনা কর্মে ব্যবহার করে থাকলেও তারা তাঁর নির্দেশানুযায়ীই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন মাত্র। মানুষদের মধ্য থেকে গাউছ, কুতুব ও আবদাল নামের কোন অলিদেরকে কোনো কিছু পরিচালনা করার কোনই কর্তৃত্ব তিনি দান করেন না।

3. তিনি আমাদের জীবনের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়াদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় হেদায়াত তথা আদেশ ও নিষেধ দানের মালিক। তাঁর বিধানসমূহ বিস্তারিত ও মৌলিক নীতিমালার আকারে বর্ণিত হয়েছে কুরআনুল কারীম ও তাঁর নবীর সহীহ হাদীসে। এগুলো অবতীর্ণ করেছেন সকল স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বাস্তবায়নের যোগ্য করে। আমরা নীতিগতভাবে তাতে বর্ণিত বিধানসমূহ মানতে বাধ্য। তাতে বর্ণিত কোনো বিধানের বিকল্প কোনো বিধান রচনা করার আমাদের কোনো বৈধ অধিকার নেই। অনুরূপভাবে কোনো বিধান রচনা করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাতে বর্ণিত নীতিমালার বাইরে শরী'আতের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিধান রচনা

করারও আমাদের কোনো অধিকার নেই। আমরা যদি নিজেদেরকে সেরকম কিছু করার যোগ্যতাবান বলে মনে করি, তা হলে এতে আমরা প্রকারান্তরে নিজেদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নেব এবং কুরআনুল কারীমের সূরা আল-মায়িদাহ : এর ৪৪, ৪৫, ও ৪৭ আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যের মর্মানুযায়ী আমরা এ অপরাধের কারণে ইয়াহূদীদের ন্যায় কাফির, যালেম ও ফাসিকে পরিণত হবো।

4. তিনি আমাদের জীবন ও জীবিকার ভাল ও মন্দ সব কিছু দানের একচ্ছত্র মালিক। আমাদেরকে পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষী করে রাখা এবং আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা গ্রহণ করার নিমিত্তে আমাদের প্রত্যেকের জন্য যে জীবন ও জীবিকা প্রদান করা উচিত- কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও মুসলিম নির্বিশেষে তিনি সবাইকে সে জীবন ও জীবিকাই দান করে থাকেন।

5. তিনি আমাদের দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক। তিনি আমাদের কোনো কল্যাণ করতে চাইলে তা রোধ করার কেউ নেই। আবার তিনি কারো অকল্যাণ করতে চাইলে সে লোকের কল্যাণ করার মতও কেউ নেই। কোন মৃত অলি কারো কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করাতো দুরের কথা, কোন

জীবিত অলি বা কুতুব[22]ও নিজ থেকে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারেন না। অনুরূপভাবে কোন বস্তুও তাঁর ইচ্ছার বাইরে নিজ থেকে কারো কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে না।

6. তিনি আমাদের সকলের মৃত্যু ও পুনর্জীবন দানের মালিক।

7. ইহ-আখেরাতে একমাত্র তিনিই আমাদের যাবতীয় অপরাধ মার্জনা করার মালিক। আখেরাতে বিচার দিবসে শাফা'আতের চাবিকাঠি থাকবে তাঁরই হাতে। তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কারো পক্ষে কারো শাফা'আত করার আদৌ কোন সুযোগ নেই।

8. তিনি মানুষকে যাবতীয় কর্তৃত্ব ও সম্মান দানের মালিক। তাঁরই ইচ্ছায় জনগণ কোন রাজনৈতিক দলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে। আবার তাঁরই ইচ্ছায় জনগণ সে দলকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে। তাই ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক ঈমান ও আমলের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন পূর্বক তা প্রতিষ্ঠা করে দেয়ার জন্য তাঁর কাছেই

[22] যদিও বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, এ ধরনের উপাধীধারী লোকদের অস্তিত্ব কোথাও নেই। [সম্পাদক]

সাহায্য চাইতে হবে। তিনি ইচ্ছা করলে জনগণের সহযোগিতায় সে লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে, অন্যথায় নয়।

উপর্যুক্ত এ বিষয়গুলো যে আল্লাহ তা‘আলার রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বিষয়, এর প্রমাণ আমরা নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহে দেখতে পাই :

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির উপাস্য দেবতাদের সমালোচনা পূর্বক তাদের নিকট স্বীয় উপাস্য প্রভুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

﴿ قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ٧٥ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡدَمُونَ ٧٦ فَإِنَّهُمۡ عَدُوّٞ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٧٧ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهۡدِينِ ٧٨ وَٱلَّذِي هُوَ يُطۡعِمُنِي وَيَسۡقِينِ ٧٩ وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ٨٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ ٨١ وَٱلَّذِيٓ أَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لِي خَطِيٓـَٔتِي يَوۡمَ ٱلدِّينِ ٨٢ رَبِّ هَبۡ لِي حُكۡمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ٨٣ ﴾ [الشعراء: ٧٥، ٨٣]

তিনি বলেন : “তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যাদের উপাসনা করছো, তাদের যথার্থতা নিয়ে কি কোন সময় তোমরা ভেবে দেখেছ ? সমগ্র জগতের প্রতিপালক ব্যতীত এদের সবাই আমার শত্রু। সমগ্র জগতের প্রতিপালক তিনিই- যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন, যিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন, যখন আমি রোগাক্রান্ত হই

তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন, যিনি আখেরাতে আমার অপরাধ মার্জনা করবেন বলে আমি আশাবাদী, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কর্তৃত্ব দান কর এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্গত কর।"[২৩]

উপর্যুক্ত এ আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, উপরে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যকার সাতটি বৈশিষ্ট্যই এ আয়াতগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'খালাকানী' ﴿خَلَقَنِيْ﴾ শব্দের দ্বারা প্রথম বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, 'ইয়াহদ্বীনী' ﴿يَهْدِيْنِيْ﴾ শব্দের দ্বারা তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, 'ইউত্বইমুনী ওয়া ইয়াছক্বীন' ﴿يُطْعِمُنِيْ وَ يَسْقِيْنِ﴾ শব্দদ্বয় দ্বারা চতুর্থ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, 'মারিদতু ফাহুয়া ইয়াশফীন'﴿ مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴾ বাক্য দ্বারা পঞ্চম বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, 'ইউমীতুনী ওয়া ইউহয়ীন'يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ বাক্যদ্বয় দ্বারা ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, 'আত্বমাউ আন ইয়াগফিরা লী খাত্বীআতী' أَطْمَعُ أَن يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْئَتِيْ .. এ বাক্যের দ্বারা সপ্তম বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, 'রাববী হাবলী হুকমান' رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا.. এ

---

23. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা :৭৫-৮৪।

বাক্যের দ্বারা অষ্টম বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন :

﴿ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ﴾ [السجدة: ٥]

"তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়াদি পরিচালনা করেন।"[২৪]

আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের মৌলিক এ বিষয়গুলোর বর্ণনা কুরআনুল কারীমের অন্যান্য স্থানেও বিক্ষিপ্তভাবে দেয়া হয়েছে। যেমন তিনি যে সৃষ্টিকর্ম এবং যাবতীয় আদেশ ও নিষেধের বিধান দানের মালিক, সে সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন :

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ﴾ [الاعراف: ٥٤]

"জেনে রেখো! সৃষ্টি যার নির্দেশও তাঁর।"[২৫]

তিনি যে সকলের জীবিকার মালিক সে সম্পর্কে বলেছেন :

﴿هَلۡ مِنۡ خَٰلِقٍ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [فاطر: ٣]

"আল্লাহ ব্যতীত কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে কি যে আকাশ ও পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে রেজেক দান করবে।"[২৬]

---

[24]. আল-কুরআন, সূরা সেজদাহ : ৫।

[25]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : ৫৪।

[26]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাত্বির : ৩০।

তিনি যে সকলের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক সে-সম্পর্কে বলেছেন :

﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾ [الفتح: ١١]

"আপনি (কাফিরদের) বলুন : আল্লাহ যদি তোমাদের কোন অকল্যাণ কামনা করেন, তবে কে তোমাদেরকে সে অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা করার শক্তি রাখে, অথবা তিনি তোমাদের কোন কল্যাণ চাইলে কে তোমাদেরকে সে কল্যাণ থেকে মাহরূম করার শক্তি রাখে"।[২৭] এ ভাবে ইচ্ছা করলে আমরা উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের আরো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবো। তবে যাতে বই এর কলেবর বৃদ্ধি না পায়, সে-জন্য পাঠকদের বুঝার জন্যে এ-পর্যন্ত উপস্থাপন করাকেই যথেষ্ট বোধ করলাম।

যিনি হবেন উপাস্য তিনিই হবেন রব :

কেউ কারো উপাস্য হতে হলে তাকে অবশ্যই তার রব হতে হবে। আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের উপর্যুক্ত এসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলেই তিনি আমাদের 'রব'। আর এ বৈশিষ্ট্যগুণেই তিনি আমাদের উপাস্য বা ইলাহ। যিনি জনগণের ইলাহ হবেন, তাকে

27. আল কুরআন, সূরা আল-ফাত্বির : ১১।

যে অবশ্যই তাদের 'রব' হতে হবে, এ মহা সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [غافر: ٦٢]

"সেই আল্লাহই তোমাদের রব, তিনি প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, সত্যিকারের উপাস্য বলতে তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই।"[২৮] উপাস্য বলতে আর কেউ নেই এ জন্যে যে, যিনি কারো ইলাহ বা উপাস্য হবেন তাঁকে অবশ্যই উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য বলে তার রুবূবিয়্যাতের মালিক হতে হবে। কিন্তু মানুষেরা বাস্তবে যাদেরকে তাদের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, তারাতো উপর্যুক্ত এসব গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের কোন একটিরও অধিকারী নয়। আর সে জন্যেই তারা তাদের রব বা উপাস্য কোনটাই নয়। যুগে যুগে মানুষেরা এ ভুলের শিকার হয়েছে বলেই নূহ আলাইহিস সালাম-থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলগণ নিজ নিজ জাতির জনগণকে এই বলে আহ্বান করেছেন :

﴿ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ﴾ [الاعراف: ٥٩]

---

[28]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাত্বির : ৩।

"হে জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অপর কোনো হক্ক ইলাহ নেই।"[২৯]

উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম। মানুষ অপর মানুষের নিকট থেকে যে উপকারই লাভ করুক না কেন সে উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ কোন মানুষই অপর কোন মানুষের উপাসনা করতে পারে না। কেননা, মানুষ হিসেবে তারা সকলেই সমান। তারা কেউ কারো রব নয়, তাদের উপকারগুলোও রব হওয়ার জন্য যেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়, সেসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বিষয়ও নয়; তাই কাউকে অলৌকিক পন্থায় কারো কোন উপকার করতে দেখলে সে উপকারী ব্যক্তির ব্যপারে এ ধারণা পোষণ করা যাবে না যে, তিনি বোধ হয় আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে গেছেন, অথবা আল্লাহ বোধ হয় তাকে তাঁর রুবূবিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ এমন কোন কর্মও করা যাবেনা যা তাকে উপাস্যের মর্যাদায় সমাসীন করে। তবে মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার যে দয়া ও করুণা রয়েছে, তা তাঁকে মানুষের রবের আসনে সমাসীন করে। সে কারণেই তিনি মানুষদেরকে কেবল তাঁরই উপাসনা

---

[29]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : ৫৯, ৬৪, ৭২, ৮৪।

করতে আদেশ করেছেন এবং অপর কারোর উপাসনা করতে নিষেধ করেছেন। এবার একজন মানুষ যখন বলবে ‘আল্লাহ আমার রব’ তখন তাকে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের উপর্যুক্ত এ মৌলিক বিষয়গুলোকে কেবল আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট বলে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং জীবনভর এ বিশ্বাসের উপর থেকেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তার কোন বিশ্বাস, কর্ম, কথা বা অভ্যাসের দ্বারা এ মৌলিক বিষয়গুলোর কোন একটির ক্ষেত্রেও যদি কোন ব্যতিক্রম ঘটে, তা হলে তার উক্ত স্বীকৃতি আপনা আপনি বাতিল বলে গণ্য হবে।

মানব জাতির ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই একদল মানুষ আল্লাহকে তাদের ‘রব’ হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে তারা প্রকৃতিবাদী হয়েছে। হূদ আলাইহিস সালাম-এর জাতির জনগণের মাঝে এ-জাতীয় চিন্তা-ভাবনা বিরাজমান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। জীবন ও জগত সম্পর্কে তাদের ধারণার বহিঃপ্রকাশ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে তারা বলতো :

﴿إِنۡ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا نَحۡنُ بِمَبۡعُوثِينَ ٣٧﴾ [المؤمنون: ٣٧]

“আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন, আমরা মরি ও

বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না।”[৩০] বর্তমান সময়েও বিশ্বে এদের উত্তরসূরীদের অভাব নেই। কিন্তু জ্ঞানের এ অভিনব অগ্রগতির যুগে একদল চিন্তাশীল মানুষ যেমন আল্লাহকেই তাদের ‘রব’ বলে স্বীকার করে নিচ্ছে, তেমনি আরেকদল মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করে বলছে- আল্লাহ বলতে কিছুই নেই। এ জগত ও মানুষ এক মহা বিস্ফোরণের ফল। আল্লাহ বলতে কেউ এসব সৃষ্টি করে নি; বরং মানুষই আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে।[৩১]

আবার যারা আল্লাহকে তাদের ‘রব’ বলে স্বীকার করেছে তারা তাঁর উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের অনেক ক্ষেত্রে একত্ববাদী হতে পারে নি; বরং তারা বুঝে হোক আর না বুঝে হোক আল্লাহর কোনো না কোনো সৃষ্টিকে তাঁর কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যের সাথে শরীক করে নিয়েছে এবং আজও নিচ্ছে। যারা সাধারণ ধার্মিক তারা বিশেষ করে মানব জীবনের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কিত যে মৌলিক বিষয় রয়েছে, সে ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার অনেক ছোট-বড় সৃষ্টিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে উপকারী ও প্রভাব

---

[30]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু‘মিনুন : ৩৭।

[31]. জয়ন্তানুজ বন্দোপধ্যায়, **ধর্মের ভবিষ্যৎ**; (কলিকাতা : এলাইড পাবলিশারস, ১ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন), পৃ. ২৫।

বিস্তারকারী দেখে সেগুলোকে তাঁর এ মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে শরীক করে নিয়ে এগুলোকে উপকারী বা অপকারী মনে করে নিয়েছে। এরই ভিত্তিতে তারা চন্দ্র, সূর্য, তারকা, গাছ-পালা, আগুন, পানি, পাথর ও পশু ইত্যাদিকে তাদের উপাস্যে পরিণত করেছে। একইভাবে অতীতের বহু নবী-রাসূল ও সৎ মানুষগণকে মৃত্যুর পরেও অদৃশ্যভাবে সাধারণ মানুষের জীবনের নানা সমস্যাদি সমাধান করতে সক্ষম ভেবে তাঁদেরকেও তারা আল্লাহর সে বৈশিষ্ট্যের সাথে শরীক করে নিয়েছে। এমন কি এ চিন্তাধারা এখনও মুসলিম সমাজের অনেক জ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের মাঝে অত্যন্ত প্রকটভাবে বিরাজমান রয়েছে। এ কথাটি কে না জানে যে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপাসনা করার উদ্দেশ্যে, তাঁর জগত পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা করার জন্যে নয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও অনেক মানুষকে আউলিয়াদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করতে দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্যে গাউছ, কুতুব, নকীব[32], আবদাল ও আবরার ইত্যাদি পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এমন অনেক বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গ নাকি রয়েছেন, যাদেরকে মহান আল্লাহ এসব পদ

---

[32] বাস্তবে এগুলো অস্তিত্বহীন। [সম্পাদক]

মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে তাঁদেরকে পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে থাকেন।[৩৩]

এসব ধার্মিকদের মাঝে আবার আরেক ধরনের মানুষ রয়েছেন যারা জ্ঞানী, গুণী, পীর ও মুরব্বীগণের অনুসরণ ও তাকলীদ করার ক্ষেত্রে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত এর বৈধ সীমারেখা অতিক্রম করে তাঁদের অন্ধ তাকলীদ করার মাধ্যমে তঁদেরকে প্রকারান্তরে নিজের রবের মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন।

---

[33] ইনকিলাব পত্রিকার মালিক একসময়ের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা 'আব্দুল মান্নান এ-প্রসঙ্গে বলেন : ‘‘মানুষ স্বীয় কর্মের দ্বারা সামান্য একজন মানুষ থেকে কুতুবের দরজায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যার হাতে আল্লাহপাক দুনিয়ার শাসন শৃঙ্খলা বিধানের ভার ন্যস্ত করেন। মনে রাখতে হবে, আল্লাহপাক দুনিয়ার শাসন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোককে নিযুক্ত করেন। তাদের সংখ্যা হলো ৩৫০, মতান্তরে চার হাজার। তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে কিছু কাজ করেন।...এই সব লোকেরা একে অপরকে চেনেন না।...এদের প্রথম স্তরে রয়েছেন তিনশ' 'আবদাল', এদের উপর আরো সাত জনকে বলা হয় 'আবরার'। এদের উপর আরো চার জনকে বলা হয় ‘‘আওতাদ'। এদের উপরে আরো তিন জনকে বলা হয় 'নকীব'। আর এদের সবার উপরে আছেন একজন যার উপাধি হলো 'কুতুব' বা 'গাউছ'। অর্থাৎ আল্লাহপাকের নির্দেশে তারাই সমস্ত পৃথিবী পরিচালনা করেন।’’ দৈনিক ইনকেলাব, ২৫ সেপ্টেম্বর , ১৯৯৭ খ্রি., পৃ.৬। [নাউযুবিল্লাহ, এসবই হিন্দুদের বিশ্বাসের অনুরূপ বিষয়, (সম্পাদক)]

যারা ধর্ম-কর্ম নিয়ে বেশী চিন্তা ভাবনা করেন না, তাদের অবস্থা হচ্ছে- একটি যন্ত্রকে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে সে যন্ত্রের সাথে এর নির্মাণ কোম্পানীর দেয়া নির্দেশিকার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তাকে তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও তাদের নিজেদের জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাদের রবের দেয়া নির্দেশিকার প্রতি তারা আদৌ কোনো গুরুত্ব দেন না। বরং তাদেরকে সে নির্দেশিকা পরিহার করে নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য সংবিধান ও আইন রচনা করতে সদা তৎপর দেখা যায়। আল্লাহর দেয়া সে নির্দেশিকাকে তারা পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় বলে মনে করে এর অনুসরণ না করে পশ্চিমাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে পছন্দ করতে দেখা যায়। এভাবে তারা যে নিজেদেরকে এবং পশ্চিমাদেরকে নিজের রবের আসনে সমাসীন করে নিয়েছেন, সে ব্যপারে এবং এ কর্মের পরিণতি সম্পর্কে তাদের কোনই অনুভূতি নেই। এমন লোকদের ব্যাপারেই মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ أَفَرَءَيۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾ [الجاثية: ٢٣]

"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে।"[৩৪]

[34].আল-কুরআন, সূরা জাছিয়াহ : ২৩।

আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য:

'উলূহিয়্যাত' শব্দটি 'ইলাহ' শব্দমূল থেকে গৃহীত এবং এরই সম্বন্ধ জ্ঞাপক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে- উপাস্য (مَعْبُوْدُ), যার আনুগত্য করা হয় (مَتْبُوْعُ) ও মান্যবর (مُطَاعُ)। উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- যিনি উলুহিয়্যাতের মালিক হবেন তিনি অবশ্যই তাঁর উপাসকদের রব হওয়ার বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ অধিকারী হওয়ার কারণে তাদের একচ্ছত্র উপাস্য, আনুগত্য লাভের অধিকারী ও মান্যবর হবেন। আমরা পূর্বেই আল্লাহর রুবূবিয়্যাত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, কারো মানুষের রব হওয়ার জন্য তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যক, তা মহান আল্লাহর মাঝে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই মানুষের প্রতি তাদের রবের অবদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের যাবতীয় উপাসনা ও আনুগত্য কেবল তাঁকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হবে। তারা বেঁচে থাকলে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বেঁচে থাকবে, জীবন দিতে হলে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনকে কেন্দ্র করেই দিতে হবে। প্রকাশ্য ও গোপন আল্লাহর যত রকমের উপাসনা রয়েছে তাতে সে কশ্মিনকালেও কাউকে শরীক করবে না, এ মর্মেরই একটি ইস্পাত কঠিন সংকল্প লালিত হবে প্রতিটি মুসলিমের মনের গভীরে।

এ সংকল্পের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣ ﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

"আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যু সবই সমগ্র জাহানের প্রতিপালক আল্লাহের জন্যেই নিবেদিত, তাঁর কোন শরীক নেই। এ ঘোষণা দেয়ার জন্যেই আমি আদিষ্ট হয়েছি, আমিই হলাম সর্বপ্রথম মুসলিম।"[৩৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ সংকল্পের কথা শিক্ষা দেয়া হয়েছে তাঁর উম্মতকে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই। এ জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে শির্কী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার আদেশ করতে যেয়ে বলেন:

«لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ»

"তুমি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে না যদিও তোমাকে কেটে ফেলা হয় বা আগুনে পুড়ে হত্যা করা হয়।"[৩৬] আল্লাহর উপাসনায় কাউকে শরীক না করার জন্য এতই কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে কেবল এ-জন্যে যে, মানুষের যাবতীয় রকমের উপাসনা

---

[35]. আল-কোরআন, সূরা আল-আন'আম : ১৬১ ও ১৬২।

[36]. ইবনে মা-জাঃ, মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ, **আস-সুনান**; কিতাবুল ফিতান, বাবুস সাবরি আলাল বালা-ই, সম্পাদনা : মুহাম্মদ ফুআদ 'আব্দুল বাকী, (স্থান বিহীন : দ্বার এহইয়াউত তুরাছিল আরাবিয়্যা :, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ২/১৩৩৬।

পাবার একক অধিকার রয়েছে কেবল আল্লাহ তা'আলারই। কেননা, কারো উপাসনা পাবার জন্যে উপাস্যের যে-সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া আবশ্যক, সে সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলতে এ-বিশ্বজগতের অন্তরালে কেউ থাকলে আছেন কেবল তিনিই। সে জন্যেই তিনি তাঁর সে বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে পৃথিবীর সকল মানুষকে কেবল তাঁরই উপাসনা করার দিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন :

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ﴾ [البقرة: ٢١]

"হে মানব সকল! তোমরা সে প্রতিপালকের উপাসনা কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আশা করা যায় এতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।"[৩৭]

তিনি মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন বলেই তিনি তাদের রবের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, আর এ মর্যাদা বলেই তিনি তাদের উপাস্যের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর একান্ত দয়া ও করুণার উপরেই যখন তাদের জীবন-জীবিকা, এ জগতে আগমন ও নির্গমন এবং তাদের ভাগ্যের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, তখন কারো অবদানের কৃতজ্ঞতা ও সম্মান

---

[37]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : ২১।

প্রকাশার্থে তারা যদি কারো উপাসনামূলক কোন কাজ করে, তা হলে তা করবে কেবল তাদের রবের জন্যেই। কেননা; তাদের প্রতি তাদের রবের যে অবদান রয়েছে, সে রকম অবদান ব্যতীত কেউ কারো উপাসনা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে না। মানুষের জীবনের প্রতি নবী ও অলিগণের যে অবদান থাকে, তা উপর্যুক্ত রকমের নয় বলে তাঁরা কারো উপাসনা পেতে পারেন না। তাই তাঁদের সম্মানে আল্লাহর উপাসনার পদ্ধতিতে কোনো কাজ করা যাবে না। যুগে যুগে সাধারণ মানুষেরা এ বিষয়টি বুঝতে পারে নি বলেই নবী-রাসূল ও অলিদের কবরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উপাসনামূলক কর্মে লিপ্ত হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলার উত্তম নামাবলী ও সুমহান গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য :

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে :

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

"আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামাবলী রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সে সব নামাবলীর মাধ্যমে আহ্বান কর।"[৩৮]

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا»

---

[38]. আল-কুরআন, সূরা আল-অ'রাফ :১৮০।

“আল্লাহ তা‘আলার নিরানববইটি নাম রয়েছে।”[৩৯]

কুরআনুল কারীমের সূরা ‘আল-বাকারাহ’-এর ২৫৫ নং আয়াতে, সূরা ‘আল-হাশর’-এর শেষ তিন আয়াতে ও সূরা ‘আল-হাদীদ’-এর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সে সব নামসমূহের কতিপয় নামের বর্ণনা দিয়েছেন। জামে‘ তিরমিজীতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ সব নাম সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, “যে ব্যক্তি এ সব নামসমূহ স্মরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[৪০] আল্লাহ তা‘আলার এ

---

[39].বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং ১২, হাদীস নং- ৬৯৫৭; ৬/২৬৯১; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুয যিকর, বাব নং: ১, হাদীস নং- ২৬৭৭; ৪/২০৬২।

[40]. হাদীসটি নিম্নরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لله تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الأَوَّلُ الآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيَ الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ

সব নামের মধ্যকার কেবলমাত্র একটি নাম হচ্ছে তাঁর জাতি বা সত্তাগত নাম। সে নামটি হচেছ-'আল্লাহ'। আর অবশিষ্ট নামসমূহ হচ্ছে তাঁর সিফাতী বা গুণগত নাম। গুণগত এ নামগুলো প্রকৃতপক্ষে তাঁর রুবূবিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত। যেমন তাঁর সে সব নামের মধ্যে রয়েছে- তিনি চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক (حَيٌّ و قَيُّوْمٌ), তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা خَالِقٌ و رَازِقٌ , তিনি যাবতীয় রকমের কল্যাণ ও অকল্যাণকারী (نَافِعٌ و ضَارٌّ), তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুর জ্ঞানী (عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ) , তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (سَمِيْعٌ و بَصِيْرٌ), তিনি সব কিছু পরিচালনাকারী (مُدَبِّرٌ) ইত্যাদি। মহান আল্লাহ এ সব গুণের অধিকারী হয়েছেন বলেই তিনি এ জগতের সব কিছুর রবের

الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ قَالَ أَبُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ছাওরা : **আল-জামেউস সুনান**; (বৈরুত : দ্বার এহইয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন, কিতাবুদ দা'আওয়াত, বাব নং ৮৩, হাদীস নং ৩৫০৭; ৫/৫৩০। (তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল। বস্তুত এ নামগুলো ইমাম তিরমিযীর কোনো এক উর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে সংযোজিত। যদিও এর অধিকাংশই কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে নেওয়া। [সম্পাদক])

আসনে সমাসীন হয়েছেন। তাঁর এ সব নামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার যে যত বড় গুণী আর উপকারীই হোক না কেন কেউই তাঁর এ সব নামে নামান্বিত ও গুণান্বিত হতে পারে না। সে জন্যে যেমন এ সব নামে কারো নাম রাখা যায় না, তেমনি কাউকে এ সব নামে ডাকাও যায় না, আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে কেউ এ সব গুণের বিন্দুমাত্র অধিকারীও হতে পারে না। তিনি চিরদিন থেকে এ সব গুণের অধিকারী। এ সব গুণের অধিকারী বলেই তিনি এ বিশ্বজগত পরিচালনা করছেন। এ সব গুণের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরীক বা সমকক্ষ নেই।

আল্লাহর সত্তাগত নামাবলী :

আল্লাহ তা'আলার এ সব গুণগত নামের বাইরে তাঁর জাতসত্তা ও তাঁর কর্মের সাথে সম্পর্কিত কিছু গুণের বর্ণনা পবিত্র করআন ও সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়। জাতসত্ত্বার সাথে সম্পর্কিত গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহর হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ও আঙ্গুল থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

যেমন হাত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ﴾ [الفتح: ١٠]

"আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।"[৪১]

---

[41]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাত্‌হ : ১০।

তাঁর চক্ষু ও কর্ণ সম্পর্কে বলেছেন :

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

"কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৪২]

তাঁর পা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : "জাহান্নাম যখন বার বার আল্লাহর নিকট জাহান্নামীদেরকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য চাইতে থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা মুবারক জাহান্নামের উপর রাখবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন :

«لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ»

"মহান প্রতিপালক জাহান্নামের উপরে তাঁর পা মুবারক স্থাপন করবেন, তখন তা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং এর এক অংশ অপর অংশের সাথে নিম্নমুখী হয়ে মিলে যাবে, আর কাত্ব, কাত্ব, কাত্ব করে শব্দ করতে থাকবে।"[৪৩]

---

[42]. আল-কুরআন, সূরা আশশুরা : ১১।

[43].বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুততাফসীর, বাবনং-৩৩৩, হাদীস-নং ৬৭;৪/১৮৩৬; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জান্নাহ, বাব নং ১৩, হাদীস নং ২৮৪৬,

আল্লাহর হাত সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে :

«إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»

"নিশ্চয় সকল বনী আদমের অন্তরসমূহ একটি অন্তরের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুল সমূহের দু'টি আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত, তিনি যেমন ইচ্ছা তা পরিচালনা করেন।"[88]

আল্লাহ তা'আলার কর্মগত গুণ যেমন 'কথা বলা', এ-সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤﴾ [النساء: ١٦٤]

"আল্লাহ স্পষ্টভাবে মূসার সাথে কথা বলেছেন।"[8৫]

আল্লাহ তা'আলার হাসা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

«يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»

৪/২১৮৬; ইমাম আহমদ, **মুসনাদ**; (বৈরুত : দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ২/২৭৬।

[44].মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ক্বাদর, বাব নং ১, হাদীস নং ২৬৫৪, ৪/২০৪৫, তিরমিযী; কিতাবুল ক্বাদর, বাব নং ৫, হাদীস নং ২১৪০, ৪/৪৪৮।

[45]. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা : ১৬৪।

“আল্লাহ তা‘আলা দু’ব্যক্তির কর্ম দেখে হাসেন, এদের একজন অপরজনকে হত্যা করে, অবশেষে (হত্যাকারী ইসলাম গ্রহণ করার ফলে) তারা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[৪৬]

আল্লাহর আনন্দ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

«لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ، مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ، إِذَا وَجَدَهَا»

“একজন উটের মালিক মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া তার উট ফেরত পেলে যেরূপ আনন্দিত হয়, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের কারও তাওবা করা দেখে সে ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন।”[৪৭]

এ ছাড়াও আল্লাহ তা‘আলার আরো কিছু সত্তাগত ও কর্মগত গুণের কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যার বিশদ বর্ণনা ‘আক্বীদার কিতাবাদিতে রয়েছে। এ সব গুণাবলী সম্পর্কে সালাফে সালেহীনগণের ঐক্যবদ্ধ মত হচ্ছে : এ সব গুণাবলীর দ্বারা বাহ্যিক যে অর্থ বুঝা যায়, সেগুলোকে সে অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। সাধারণভাবে এ গুলোর অর্থ আমাদের বোধগম্য হলেও এ সবের আকৃতি প্রকৃতির প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভাল করে জানেন।

---

[46]. বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৬৭৫; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জান্নাহ, বাব নং ৩৫, হাদীস নং ১৮৯০, ৩/১৫০৪।

[47]. তদেব ; কিতাবুত তাওবাঃ, বাব নং ১, হাদীস নং ২৭৪৬, ৪/২১০২।

তবে এ কথা সত্য যে, এ সব গুণাবলীর সাথে আল্লাহর কোনো সৃষ্ট জীবের গুণাবলীর আদৌ কোনো সামঞ্জস্য নেই।

কেননা, তিনি তাঁর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন :

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

“তাঁর অনুরূপ কোন বস্তু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”[৪৮]

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ একদিকে যেমন তাঁর নিজের জন্যে শ্রবণ করা ও দেখার দু’টি গুণের কথা স্বীকার করেছেন, অপর দিকে তেমনি এতে কারো সাথে সাদৃশ্য থাকার কথাকেও অস্বীকার করেছেন। এতে দু’টি বিষয় প্রমাণিত হয় :

এক. তিনি যে মাধ্যম দিয়ে শ্রবণ করেন ও দেখেন, সেটির নাম কান ও চক্ষু। তবে তাঁর কান ও চক্ষুর প্রকৃতির সাথে তাঁর কোনো সৃষ্টির কান ও চক্ষুর প্রকৃতির কোনই সাদৃশ্য নেই।

দুই. শ্রবণ করা ও দেখার এ দু’টি মৌলিক গুণের ক্ষেত্রে কেউ তাঁর অনুরূপ হলেও উভয়ের শ্রবণ করা ও দেখার মধ্যে আদৌ কোনো সামঞ্জস্য নেই। কেননা, তিনি তাঁর সুমহান আরশে অবস্থান করেই সব কিছু শ্রবণ করেন ও দেখেন। কোন কিছুই তাঁর শ্রবণ করা ও দেখার সামনে আড় বা বাধা হতে পারে না। তাঁর কাছে অদৃশ্য বলতে কিছুই নেই। পক্ষান্তরে তাঁর সৃষ্টির শ্রবণ

---

[48]. আল-কুরআন, সূরা আশশুরা : ১১।

ও দেখার মাধ্যমকে কান ও চক্ষু বলে নামকরণ করা হলেও তা নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে শ্রবণ করতে ও দেখতে পারে না।

সালাফগণ এ আয়াতের মর্মকে সামনে রেখেই কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার জাতসত্তার সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় গুণাবলীকে এর বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : তাঁরা কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত সকল প্রকাশ্য **সুস্পষ্ট** (صريح) বিষয়াদির কোনো প্রকার তা'বীল ছাড়াই তা বাহ্যিক বা আক্ষরিক অর্থে স্বীকার করেন। জাহমিয়্যাঃ[৪৯] সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম পথভ্রষ্ট ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, সাবিঈন, মুশরিক ও দার্শনিকদের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার

---

[49]. মহান আল্লাহর গুণাবলীসমূহকে পূরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করার চিন্তাধারা ইসলামী যুগে সর্ব প্রথম জা'দ ইবন দিরহাম নামের এক ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই চিন্তাধারা জাহাম ইবন সাফওয়ান নামের এক ব্যক্তি তাথেকে গ্রহণ ও প্রকাশ করে। সে জন্যেই এ চিন্তাধারাকে জাহাম ইবন সাফওয়ান এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আরো বলা হয়ে থাকে যে, জা'দ ইবন দিরহাম এ চিন্তাধারাটি এব্বান ইবন সিম'আন নামক এক ব্যক্তির নিকট থেকে গ্রহণ করেছিল এবং এববান তা লবীদ ইবন আ'সাম নামের সেই ইহুদী থেকে গ্রহণ করেছিল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জাদু করেছিল। দেখুন : **'আব্দুল আযীয আল-মুহাম্মদ আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪০-৪১।**

সত্তাগত ও কর্মগত গুণাবলীসমূহকে অস্বীকার করেছে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এ বাতিল চিন্তাধারা বিশর ইবন গিয়াছ আল-মির্রীছী-এর মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বে ব্যাপক আকারে প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে মু'তাজিলা সম্প্রদায়ও জাহমিয়্যাদের এ চিন্তাধারা অনুসরণ করে। যেমন- তারা আল্লাহর কান ও চক্ষু সম্পর্কে উপরে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছে : 'তিনি কর্ণ ছাড়া শুনেন ও চক্ষু ছাড়া দেখেন।'[৫০] তবে যুগে যুগে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' এর ইমামগণ এ বাতিল চিন্তাধারার প্রতিবাদ করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত গুণাবলীসমূহের ব্যাপারে কী চিন্তা ও বিশ্বাস করতে হবে, তা সুস্পষ্ট ভাষায় জনগণের মাঝে প্রচার করেছেন।

আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে মান্যবর ইমামগণের মত :

এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন :

"وله يد ووجه و نفس ... فهو له صفات بلا كيف... وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف."

"আল্লাহ তা'আলার হাত, মুখ ও আত্মা ... গুণাবলী রয়েছে, তবে এর ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না। আর তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টির

---

[50]. মুহাম্মদ খলীল হাররাস, **শরহুল আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ;** (মদীনা : মারকাযুদ দাওয়া :, সৌদি আরব, ৭ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন), পৃ. ১০০।

গুণদ্বয় রয়েছে, তবে এগুলোর ধরণ ও প্রকৃতির কোনো বর্ণনা দেয়া যাবে না।”[৫১]

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন :

“আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে কারো কোনো কথা বলা ঠিক নয়। তবে আল্লাহ নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন তাঁকে সে গুণে গুণান্বিত করা উচিত। এক্ষেত্রে নিজের চিন্তা প্রসূত কোনো কথা বলা ঠিক নয়।”[৫২]

আল্লাহ ইমাম মালিক (রহ.)-কে

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ ﴾ [طه: ٥]

‘রহমান আরশের উপর ইসতেওয়া করেন” (উঠেন), এ আয়াতে বর্ণিত ‘ইসতেওয়া’ শব্দের অর্থ সম্পর্কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলে তিনি অপর কোনো প্রতিশব্দ দিয়ে এ শব্দের তা’বীল বা ব্যাখ্যা না করে বলেন :

"الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة."

---

[51]. দেখুন : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কর্তৃক রচিত ‘আল-ফিকহুল আকবার’ কিতাবের ব্যাখ্যা হিসাবে লিখিত মুল্লা ‘আলী ক্বারী আল-হানাফী এর **‘শরহু কিতাব আল-ফিকহুল আকবার’**; (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃ. ৫৮-৫৯।

[52]. আল-আলূছী, মাহমূদ, **রূহুল মা‘আনী**; (বৈরুত : দারু এহইয়াইত তুরাছিল ‘আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি..), ১৫/১৫৬।

“ইস্তেওয়ার অর্থ বোধগম্য, এর প্রকৃতি অজ্ঞাত, এর প্রতি ঈমান আনয়ন ওয়াজিব, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বেদ‘আত।”[৫৩]

ইমাম শাফিঈ (রহ.) কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : “আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্যে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সে গুলোর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর পক্ষ থেকে যে উদ্দেশ্যে আল্লাহর যে সব গুণাবলীর বর্ণনা এসেছে, আমি সেগুলোর উপরেও ঈমান রাখি।”[৫৪]

এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন: “আল্লাহর গুণাবলীসমূহের প্রতি আমি ঈমান আনয়ন করি, এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করি। তবে এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি জানি না, এর কোনো কিছুকে আমি প্রত্যাখ্যানও করি না।”[৫৫]

---

[53]. আল-হানাফী, ইবনু আবিল ইজ্জ, **শরহুল ‘আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাঃ** ; (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন), পৃ. ১২৮; আল-খাযিন, ‘আলা উদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ, **তাফছীরুল খাযিন**; (লাহোর : নু‘মানী কুতুবখানা , সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), ১/১০০।

[54]. ‘আব্দুল আযীয আল-মুহাম্মদ আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৪।

[55]. তদেব।

আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী সম্পর্কে এটাই হচ্ছে মূল ‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত’ এর অনুসারীদের আক্কীদা বা বিশ্বাস। তবে আব্বাসী খেলাফত আমলে যখন মুসলিম মনীষীগণ গ্রীক দর্শন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন, তখন অনেকের কথামতে আল্লাহ তা‘আলাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য থেকে রক্ষার জন্য তাঁরা আল্লাহর এ সব গুণাবলীর ব্যপারে তাঁদের পূর্বসূরীদের কথা থেকে সরে এসে এ সবের তা’বীল বা ব্যাখ্যায় লিপ্ত হন। এ মতের পুরোধা ইমাম আবুল হাসান আল-আশ‘আরী (মৃ.৩২৪হি.) প্রথমত আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলীর মধ্য থেকে কেবল কান, চক্ষু, ইচ্ছা, সামর্থ্য, কথা, জ্ঞান ও জীবন এ সাতটি গুণকে স্বীকার করে অবশিষ্ট যাবতীয় গুণাবলী যেমন- ইসতেওয়া বা উপরে উঠা, অবতরণ, আগমন করা, হাসা, সন্তুষ্ট হওয়া, ভালোবাসা, অপছন্দ করা, রাগান্বিত ও আনন্দিত হওয়া, এ সব গুণাবলীর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করে এ-গুলোর তা’বীল বা ব্যাখ্যা করেন। তাঁরই পথ ধরে ইমাম গাযালী[৫৬], ইমাম রাযী[৫৭] এবং আরো অনেকে মুসলিম

---

[56]. ইমাম গাযালী, ‘আল-ইক্কতেসাদ ফী উসূলিল এ‘তেকাদ’ গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্টা দ্রষ্টাব্য।

[57]. ইমাম রাযী ‘ইসতেওয়া’ শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করে ‘ইসতীলা’ শব্দ দ্বারা এর তা‘বীল করেছেন। দেখুন : আর-রাযী, **তাফসীরুল কবীর**, (স্থান বিহীন, ৩য় সংস্করণ , তাং বিহীন), ১১/৬।

বিশ্বে তাঁর এ মতবাদ প্রচার করেন, যা আজও আমাদের দেশসহ অনেক মুসলিম দেশে প্রচলিত রয়েছে। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, যার নামে এই মতবাদ প্রচলিত রয়েছে সেই ইমাম আবুল হাসান আল-আশ‘আরী তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর এ মত পরিবর্তন করেছিলেন এবং ‘আল-এবানাহ ‘আন উসূলিদ দিয়ানাঃ’ নামে একটি গ্রন্থ লিখে তাতে তিনি আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ব মত পরিহার করে সালাফগণের মতের পূর্ণ অনুসরণ করেছিলেন। আমাদের কাছে আশ্চর্য বোধ হয় যে, আমরা যেখানে পদে পদে মহামান্য ইমামগণকে অনুসরণ করে চলেছি, সেখানে কী করে এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের বিপরীত চিন্তার অনুসারী হয়ে গেলাম। এর অর্থ কি এ নয় যে, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সাহাবাদের থেকে নিয়ে সমস্ত সালাফগণের আক্বীদা সঠিক ছিল না!! نعوذ بالله রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজেই আল্লাহ তা‘আলার সত্তাগত গুণাবলীর ধরণ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা করেন নি, তখন কারো পক্ষেই এ সবের তা’বীল করা সমীচীন ছিল না। কেননা, এ সবের তা’বীল করা আর অস্বীকার করা মূলত একই কথা। মু‘তাযিলারা ভেবেছিল- আল্লাহর এ সব গুণাবলী থাকলে তাঁর প্রতিটি গুণকে একেকটি আল্লাহ বলে গণ্য করতে হবে, কিন্তু আল্লাহ এক, সুতরাং আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাঁকে এ সব গুণাবলী থেকে মুক্ত বলে

বিশ্বাস করতে হবে (এ ভ্রান্ত ধারণাই মু'তাযিলাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে)। বস্তুত যারা সিফাত বা আল্লাহর গুণাবলীর তা'বীল করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য থেকে রক্ষা করা। কিন্তু এ সবের তা'বীল না করেও যে আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করা থেকে রক্ষা করা যায়, তা তাঁদের চিন্তায় আসে নি। আল্লাহ তা'আলার জাতসত্তার সাথে তাঁর কোনো সৃষ্টির সত্তার যখন কোনো সাদৃশ্য নেই, তখন তাঁর জাতের সাথে সংশ্লিষ্ট গুণাবলীর সাথেও তাঁর কোনো সৃষ্টির গুণাবলীর কোনো সাদৃশ্য থাকবে না- এটাই স্বাভাবিক কথা। নামের দিক থেকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বাহ্যিক কিছু মিল পাওয়া গেলেও এতে উভয়ের মাঝে আকৃতি ও প্রকৃতিগত মিল হয়ে যাওয়া জরুরী হয়ে যায় না।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [الروم: ٢٧]

"আল্লাহর জন্যেই রয়েছে উৎকৃষ্ট উদাহরণ।"[৫৮]

তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর উদাহরণ সকল কিছুর উর্ধ্বে। এ প্রসঙ্গে মিশরের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সইয়্যিদ সাবেক বলেন :

---

[58]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহাল : ৬০।

“আল্লাহ তা‘আলার সাথে তাঁর কোনো কোনো গুণাবলীতে তাঁর সৃষ্টির তুলনা কেবল নামকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, প্রকৃতি বা মূলগতভাবে উভয়ের মাঝে কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই। কারো ব্যপারে যদি বলা হয় যে, তিনি একজন জ্ঞানী, তিনি জীবিত, তিনি আছেন, তিনি সামর্থ্যবান, তিনি বিজ্ঞ ও দয়ালু, তখন এর অর্থ এ দাঁড়াবে যে, তিনি বাহ্যিক দিক থেকে এ সব গুণে গুণান্বিত, তবে তার এ সব গুণাবলী আল্লাহর গুণাবলীর তুলনায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থিত; আর আল্লাহর ব্যাপারে এ সব গুণের অর্থ হবে তিনি এ সব গুণের ক্ষেত্রে পূর্ণতার চরম শিখরে অবস্থিত।”[৫৯]

ড. বুরাইকান বলেন : “সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে কোনো কোনো গুণাবলীর ক্ষেত্রে এমন একটি সাধারণ অর্থের দিক থেকে মিল রয়েছে যা কারো জন্যে এককভাবে প্রযোজ্য নয়। এ মিল থাকার ফলে উভয়ের মাঝে সেই নিন্দিত তুলনা আবশ্যক হয়ে যায় না, যা শরী‘আতের দলীল ও সুস্থ বুদ্ধি অগ্রাহ্য করে; এ জন্যে যে, প্রতিটি অস্তিত্ববান দু’টি বস্তুর মাঝে অল্প পরিমাণে হলেও উভয়ের মাঝে কিছুটা মিল থাকে। এ মিল থাকাতে প্রত্যেকের যে আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাতে একে অপরের অনুরূপ হওয়া জরুরী হয়ে যায় না। কারণ, বিশেষত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের গুণের যে অবস্থা থাকে, তা

---

[59]. আস-সাইয়্যিদ সাবেক, **‘আল-আক্বাইদুল ইসলামিয়্যাহ;** (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ‘আরাবী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৭৫ খ্রি..), পৃ. ৫৮।

উভয়ের যৌথ গুণাবলীর অবস্থার চেয়ে ভিন্নতর হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকের সে ভিন্ন গুণাবলীই তখন একের দ্বারা অপরকে বুঝানোর পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।’’[৬০]

আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী সম্পর্কে কোনো অযথা তর্কে লিপ্ত না হয়ে সহজ সরলভাবে যে বিশ্বাস পোষণ করা উচিত, সে সম্পর্কে অবগত হওয়াই আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আর সে প্রয়োজনটুকু পূরণ করার জন্যেই আমি নিম্নে মসজিদে নববীর পেশ ইমাম শেখ ‘আব্দুর রহমান আল-হুযাইফী এর বক্তব্য পাঠক সমাজের সম্মুখে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরলাম। তিনি বলেন :

‘‘আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী মূলত দু’ধরনের রয়েছে:

এক. এমন সব গুণাবলী যা আল্লাহ তা‘আলার মধ্যে রয়েছে, যেগুলোকে প্রমাণিত বা হ্যাঁ বাচক গুণাবলী (ثُبُوْتِيَّةٌ) বলা হয়ে থাকে।

দুই. এমন সব গুণাবলী যা আল্লাহ তা‘আলার মধ্যে নেই, যেগুলোকে অপ্রমাণিত বা না বাচক (سَلْبِيَّةٌ) বলা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা‘আলার সত্তা ও কর্ম সংক্রান্ত যে সব গুণাবলীর বর্ণনা কুরআন ও সহীহ হাদীসে এসেছে, সেগুলোকে প্রমাণিত ধরনের গুণাবলী বলা হয়। এ জাতীয় গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহ

---

60. ড. ইব্রাহীম আল-বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৩।

তা‘আলা তাঁর নিজের জন্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ পূর্ণতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং এর বিপরীতে অবস্থিত যে সব অসম্পূর্ণতা রয়েছে, তাথেকে যে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র, তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলী হলো সেগুলোই যদ্দ্বারা তিনি অনন্তকাল থেকে গুণান্বিত রয়েছেন এবং চিরকাল যে সব গুণে তিনি গুণান্বিত থাকবেন। সত্তাগত গুণাবলীর ন্যায় তিনি কর্মগত গুণেও অনন্তকাল থেকেই গুণান্বিত রয়েছেন। উভয় প্রকার গুণের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে- সত্তাগত গুণাবলীসমূহ তাঁর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। আর কর্মগত গুণাবলীসমূহ তাঁর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। তিনি ইচ্ছা করলে তা করেন, না হয় না করেন। কর্মগত গুণাবলীর মধ্যে এমনও কিছু গুণাবলী রয়েছে যা বিশেষ বচনের ক্ষেত্র ছাড়া আল্লাহর বেলায় তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয় না। সেরূপ গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে- আল্লাহর চক্রান্তকারী ও বিদ্রূপকারী হওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٥٤ ﴾ [ال عمران: ٥٤]

“কাফিররা চক্রান্ত করলো, আল্লাহ তা‘আলাও (তাদের বিপরীতে) চক্রান্ত করলেন। আর তিনি উত্তম চক্রান্তকারী।”[৬১]

অপর আয়াতে রয়েছে :

﴿ ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ ﴾ [البقرة: ١٥]

“আল্লাহ তা‘আলা তাদের সাথে বিদ্রূপ করেন।”[৬২]

উপর্যুক্ত দু’টি আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা নিজেকে সাধারণভাবে চক্রান্তকারী ও বিদ্রূপকারী হওয়ার দু’টি গুণে গুণান্বিত করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তবে সাধারণ অর্থে তিনি এ দু’টি গুণে গুণান্বিত নন। কেননা; প্রকৃতপক্ষে তিনি এ দু’টি কর্ম দ্বারা কাফির ও ইসলামের শত্রুদের ইচ্ছা ও কর্মের বিরুদ্ধে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে, তাই ব্যক্ত করেছেন। উদ্দেশ্য এটা বুঝানো যে, কাফিরদের চক্রান্ত ও বিদ্রূপের মুকাবেলায় আল্লাহ যে পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন, তা যেন তাদের কর্মেরই সমান হয়ে থাকে। এ-জাতীয় গুণ আল্লাহ তা‘আলার জন্যে পূর্ণতা প্রমাণকারী কেবল তখনই হয়ে থাকে যখন তা কাফিরদের কর্মের মুখোমুখি অবস্থানের কথা বর্ণনা

---

[61]. আল-কুরঅন, সূরা আলে ইমরান : ৫৪।

[62]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৫।

প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়। অন্যথায় তা আল্লাহ তা'আলার জন্যে পূর্ণতা প্রমাণকারী নয়।

যে সকল গুণাবলী অসম্পূর্ণতা (نقص) **এর** অর্থ বহন করে, সে-সব গুণে আল্লাহ তা'আলা গুণান্বিত হতে পারেন না। যেমন- তন্দ্রা ও নিদ্রা, এ দু'টি অসম্পূর্ণতার অর্থ বহন করে বিধায়, আল্লাহ তাঁর নিজের পূর্ণতা প্রমাণ এবং নিজ থেকে অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের জন্যে তিনি এ দু'টি গুণে গুণান্বিত না থাকার কথা জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

"তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অপর কোনো হক্ব উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুকে তিনি ধারণ করে রয়েছেন, তন্দ্রা ও নিদ্রা কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।"[৬৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের জন্যে 'হাইউন' ও 'কাইউম' নামের দু'টি গুণ প্রমাণ করেছেন কারণ; এর দ্বারা তাঁর পূর্ণতা প্রমাণিত হয়; পক্ষান্তরে 'তন্দ্রা' ও 'নিদ্রা' তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না বলে এ দু'টি গুণে তিনি গুণান্বিত নয় বলে জানিয়েছেন কারণ; এ দু'টি অসম্পূর্ণতা এবং তা তাঁর পূর্ণতা প্রমাণকারী প্রথম দু'টি গুণের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী।

---

[63]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ২৫৫।

উপর্যুক্ত এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা যে সব গুণাবলী তাঁর নিজের জন্য প্রমাণ করেছেন, এর দ্বারা তিনি তাঁর নিজের পূর্ণতা প্রমাণ ও অসম্পূর্ণতা দূর করতে চেয়েছেন। আর যে সব গুণে তিনি গুণান্বিত না থাকার কথা বলেছেন, এর দ্বারা তিনি তাঁর নিজ থেকে অসম্পূর্ণতা দূরীকরণ ও এর বিপরীতে যে পূর্ণতা রয়েছে, তা তাঁর নিজের জন্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

আল্লাহ তা‘আলার নামাবলী ও গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- কারো সাথে কোনো প্রকার সাদৃশ্য ছাড়াই তিনি এ সব গুণে গুণান্বিত রয়েছেন। এগুলোর ক্ষেত্রে একত্ববাদী হওয়ার অর্থ হচ্ছে- এ কথা মনে প্রাণে স্বীকার করা যে, এ-গুলো দ্বারা মহান আল্লাহ এককভাবে গুণান্বিত। কোনো ভাবেই তাঁকে এ সব গুণাবলী থেকে মুক্ত করা যাবে না। এগুলোর অর্থের ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যাও দেওয়া যাবে না, এর কোনো তুলনা ও প্রকৃতিও বর্ণনা করা যাবে না।

এ সব ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের করণীয় হচ্ছে- কুরআনে কারীম ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তা‘আলার এ সব সত্তাগত ও গুণগত গুণাবলী থাকার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা না করা, কেননা; আমরা শরী‘আত কর্তৃক এরূপ বিশ্বাস স্থাপনের জন্যেই আদিষ্ট হয়েছি। যারাই এ সব গুণাবলী নিয়ে

অধিক চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তারা হয় (معطلين) তথা মহান আল্লাহকে তাঁর গুণাবলী থেকে মুক্তকারীদের অন্তর্গত হয়েছেন, নতুবা (محرفين) তথা বিকৃতকারীদের অন্তর্গত হয়েছেন, তা না হয় (ممثلين) তথা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যকারী অথবা (مكيفين) তথা এর ধরন-প্রকৃতি বর্ণনাকারীদের অন্তর্গত হয়েছেন। এতে করে তারা সালাফে সালেহীন তথা মূল 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর অনুসৃত পন্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী থাকার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে এবং যে সব গুণের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো দলীল প্রমাণ নেই, আল্লাহ তা'আলার ব্যপারে সে সব গুণ প্রমাণের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাতগণের অনুসৃত পন্থা হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য স্বীয় কিতাবে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে যে সব গুণাবলী প্রমাণ করেছেন, সে সব গুণাবলী কোনো প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ-প্রকৃতি ও সাদৃশ্য বর্ণনা ছাড়াই প্রমাণ করা। আর অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের পন্থা হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা নিজ কিতাবে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার জন্য যে সব গুণাবলী না থাকার কথা বলেছেন, সেগুলো অস্বীকার করা। এ সব অস্বীকৃত গুণাবলীর বিপরীতে অবস্থিত গুণাবলীর মধ্যেই আল্লাহর পূর্ণতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। আর যে সব গুণাবলীর প্রমাণে বা

অপ্রমাণে কোনো দলীল প্রমাণাদি না থাকা সত্ত্বেও লোকেরা তা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে, যেমন- আল্লাহর শরীর থাকা বা না থাকা, তাঁর জন্য স্থান ও দিক নির্ধারণ করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলার জন্য এ সব শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে তাঁরা নীরবতা পালন করেন। কুরআন ও হাদীসে এ সবের কোনো বর্ণনা না থাকায় তাঁরা এগুলো স্বীকারও করেন না, আবার অস্বীকারও করেন না। আল্লাহর বেলায় কেউ এগুলো উচ্চারণ করলে তাঁরা সে ব্যক্তির নিকট এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে যদি আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র রাখা জরুরী এমন কোনো বাতিলের উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলে তাঁরা তা অস্বীকার করেন। আর যদি এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে এমন কোনো সত্যকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে তাঁরা তা স্বীকার করেন। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে যত মত ও পথ রয়েছে, তন্মধ্যে উপর্যুক্ত এ মত ও পথই হচ্ছে অনুসরণের অত্যাবশ্যক পথ। এ মতই হচ্ছে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও সাদৃশ্য পোষণকারীদের মতের মাঝে অবস্থিত একটি মধ্যপন্থী মত।"[৬৪]

---

[64].এ কথাগুলো তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনায় আমাদেরকে আক্বীদা : বিষয়ে পাঠ দান উপলক্ষে ক্লাসে লিখিয়ে দিয়েছিলেন।

উপরে আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাত, তাঁর নামাবলী ও গুণাবলী সম্পর্কে যা আলোচিত হলো এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনেক নাম ও গুণাবলী রয়েছে। এর সাথে তাঁর সৃষ্টির কারো কোনো নামের বা গুণের বাহ্যিকভাবে মিল থাকতে পারে, তবে এ মিল থাকাটা উভয়ের নামের ও গুণের অর্থ ও প্রকৃতির দিক থেকে কোনো অবস্থাতেই এক ও অভিন্ন বা সাদৃশ্যপূর্ণ নয়; বরং উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে, যা বর্ণনা করে বুঝাবার মত কোনো উপায় নেই। কারণ, সৃষ্টি আর স্রষ্টা কোনো দিন এক হতে পারে না এবং স্রষ্টার নামের ও গুণের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তিনি তাঁর কোনো সৃষ্টিকে কোনো দিন সে বৈশিষ্ট্যের অধিকারীও করেন না, কোন সৃষ্টি নিজ প্রচেষ্টায়ও সে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে না। আল্লাহর এ সব নাম ও গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে বৈশিষ্ট্য গুণেই তিনি আমাদের ও সমগ্র জগতের একমাত্র রব বা প্রতিপালক। আর তিনি এ জগতের সব কিছুর একক প্রতিপালক হওয়ার কারণেই এ জগতের সব কিছুর একক উপাস্যের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, কারণ; কাউকে উপাস্য হতে হলে তাঁকে উপাসকের প্রতিপালকের মর্যাদায় আসীন হতে হয়। আল্লাহই যখন আমাদের একক প্রতিপালক, তাঁর হাতেই যখন আমাদের সৃষ্টি, জীবন, জীবিকা, ইহ ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও

অকল্যাণ নিহিত, তখন তিনি ব্যতীত অপর কেউ আমাদের উপাস্য হতে পারে না। অতএব, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যকার কোনো নবী-রাসূল, ফেরেশ্তা, কোনো অলী-দরবেশ, জিন-পরী, কোনো গাছ-পালা বা পাথর ইত্যাদিকে তাঁর নাম ও গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে- বুঝে বা না বুঝে তাদের বিশ্বাসে বা কথায় বা কর্মে- শরীক করে নেয়, তারা প্রকারান্তরে তাঁদেরকে ও সে সবকে তাদের প্রতিপালক ও উপাস্য বানিয়ে কোনো না কোনো শির্কে নিমজ্জিত হয়।

শির্কের প্রকারভেদ :

শর‘য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে শির্ককারীর পরিণতি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, শির্ক মূলত তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার : শির্কে আকবার বা বড় শির্ক

শির্কে আকবার এর সংজ্ঞা :

বিশ্বাস জাতীয় বিষয়াদি ও উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক বা সমান করাই মূলত শির্কে আকবার। কুরআনুল কারীমে উপাসনা কেন্দ্রিক শির্ক সম্পর্কে অধিক আলোচনা হওয়ার কারণে অনেকে শির্কে আকবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এটাকে শুধু উপাসনার সাথেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যেমন-

কেউ এর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন : ‘‘শির্কে আকবার হচ্ছে : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যেমন- অন্যকে আহ্বান করা, অন্যের নিকট কিছু কামনা করা, অন্যকে ভয় করা, অন্যকে আল্লাহর ন্যায় ভালোবাসা, অন্যের জন্য পশু উৎসর্গ বা মানত করা।’’

কেউ আরো সংক্ষেপ করে বলেছেন : ‘‘আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে আহ্বান করাই হচ্ছে শির্কে আকবার।’’

কেউ বলেন : "আল্লাহর উপাসনাসমূহের কোনো উপাসনা গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে করাকে শির্কে আকবার বলা হয়।"[৬৫] তবে যেহেতু শির্কে আকবার কেবলমাত্র উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের মধ্যেও হয়ে থাকে, সে জন্য আমার মতে এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ হওয়া উচিত :

"আল্লাহ তা'আলার নামাবলী ও গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমাদের একক রব ও উপাস্য, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কোনো অলি দরবেশ, জিন-পরী বা গ্রহ ও তারকা, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে সে সব বৈশিষ্ট্যের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যের সমান বা আংশিক অধিকারী বলে মনে করা এবং নবী, অলী, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে মুখ, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা উপাসনামূলক কোনো কর্ম করাকে শির্কে আকবার বলা হয়।"

শির্কে আকবারকারীর পরিণতি :

পরিণতির দিক বিবেচনা করে এ শির্ককে বড় শির্ক বলা হয়। কেননা, তা শির্ককারীকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করে দেয়। কারণ; তা একটা প্রকাশ্য কুফরী কাজ। যেমন- কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন :

---

[65]. 'আব্দুল 'আযীয আল-মুহাম্মদ আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০।

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٌ فَلَا تَكۡفُرۡ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“তাঁরা (হারূত ও মারূত) কাউকে এ কথা বলেই জাদু শিক্ষা দিতেন যে, আমরা তোমাদের জন্য ফেতনা বিশেষ, সুতরাং তোমরা তা শিক্ষা করে কুফরী করো না।”[৬৬]

আমরা বাহ্যত দেখতে পাচ্ছি যে, এ আয়াতে জাদু শিক্ষা করাকে কুফরী কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; এটা এ জন্যে যে, তা নিজ থেকে মানুষের অকল্যাণ করতে পারে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষা করা শির্কের অন্তর্গত কাজ। অনুরূপভাবে হাদীসে কুদসীতে দেখতে পাওয়া যায় যে, তারকার প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় বলে বিশ্বাস করা শির্কী বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও এটিকে কুফরী বলে গণ্য করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

" أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ "

“আমার বান্দাদের মধ্যে কতিপয় বান্দা আমার উপর বিশ্বাসী আর কতিপয় অবিশ্বাসী হয়েছে, যারা এ কথা বলেছে যে, আল্লাহ তা‘আলার করুণায় আমাদেরকে বৃষ্টি দান করা হয়েছে, তারা আমার উপর ঈমান এনেছে। আর যারা বললো : অমুক অমুক

---

[66]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ: ১০২।

তারকার প্রভাবের ফলে আমাদেরকে বৃষ্টি দান করা হয়েছে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং তারকার প্রভাবের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে।"[৬৭]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে জাদু শিক্ষা করা আর কোনো তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয় বলে বিশ্বাস করা যদি কুফরী কর্ম বলে স্বীকৃত হয়, তা হলে জ্ঞানগত, উপাসনাগত, পরিচালনাগত ও অভ্যাসগত অন্যান্য যত সব শির্ক রয়েছে, নিঃসন্দেহে তাও কুফরী কর্ম বলে গণ্য হবে। কেউ যদি এ সব বিষয়ে সতর্ক না হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করা ছাড়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তবে তার সমগ্র জীবনের যাবতীয় সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেয়ে জান্নাত তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে এবং জাহান্নামই তার চিরস্থায়ী আবাস স্থলে পরিণত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ﴾ [المائدة: ٧٢]

"যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।"[৬৮]

---

67. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আযান, বাব নং ৭২, হাদীস নং ৮১০, ১/২৯০; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ঈমান, বাব নং৩২, ১/৮৩।

মানুষেরা যাতে এ ধরনের শির্ক করা থেকে সতর্ক হয়, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি এই বলে সতর্কবাণী দিয়েছেন :

﴿لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ۝٦٥﴾ [الزمر: ٦٥]

"তুমি যদি শির্ক কর, তবে তোমার যাবতীয় 'আমল ভস্ম করে দেয়া হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হয়ে যাবে।"[৬৯]

শির্কের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ভাবে সতর্ক করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর উম্মতকে এ সম্পর্কে সতর্ক করা। তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তারা যদি বুঝে বা না বুঝে কোনো শির্কী বিশ্বাস পোষণ করে বা কোন শির্কী কর্ম করে, তা হলে তাদের সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাতসহ জীবনের অন্যান্য যাবতীয় সৎকর্ম আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে যাবে।

শির্ক করার ফলে যার অবস্থা এই হয়ে দাঁড়ায়, সে ব্যক্তি যদি স্বীয় শির্ক থেকে স্বেচ্ছায় পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে ইসলামে নতুন করে প্রবেশ না করে, তা হলে আখেরাতে সে জাহান্নামী হবে। আল্লাহ তা'আলা করুণার সাগর হয়ে থাকলেও কাফির-

---

[68]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ : ৭২।

[69]. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৬৫।

মুশরিকদের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর। তাই তিনি তাদের সৎকর্মের বিষয়টি কোনো বিবেচনায় এনে তাদের প্রতি কোনো করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না। যারা স্বেচ্ছায় তা পরিত্যাগ না করে তিনি তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করার জন্যে তাদের অপকর্ম আরো চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। যেমনটি সুযোগ করে দিয়ে পাকড়াও করেছিলেন আরবের কুরাইশ বংশের কাফির ও মুশরিকদের। কুরআনুল কারীমের বর্ণনানুযায়ী যদিও তারা আল্লাহ তা'আলাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা এবং যাবতীয় বিষয়াদির পরিচালনাকারী বলে অকপটে স্বীকার করতো। যেমন- এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ﴾ [الزمر: ٣٨]

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেসা করো যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তখন তারা বলবে আল্লাহই তা সৃষ্টি করেছেন।"[৭০] অপর স্থানে বলেছেন:

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ﴾ [يونس: ٣١]

---

[70]. আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার : ৩৮।

"তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর, কে তোমাদেরকে জীবিকা দান করে আকাশ ও জমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা করেন? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ।"[৭১]

আল্লাহ তা'আলাকে সবকিছুর স্রষ্টা, জীবন ও জীবিকা দানকারী ও পরিচালনাকারী বিশ্বাস করার পাশাপাশি তারা নিজেদেরকে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর দ্বীনের যথার্থ অনুসারী বলেও দাবী করতো। সে দ্বীনের উপাসনাদির মধ্যকার কিছু উপাসনা যেমন- কা'বা গৃহের হজ্জ করা, সাফা ও মারওয়াঃ পর্বতদ্বয়ের মাঝে সা'য়ী করা, কুরবানী করা, মিনায় অবস্থান গ্রহণ করা ইত্যাদি উপাসনাও তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করতো। কিন্তু, তারা শির্ক করতো বলে তাদের এ সব সৎকর্ম তাদের কোন উপকারে আসে নি। বরং তাদের ব্যপারে আল্লাহ তা'আলার এ-হুকুম জারী হয়েছিল যে, তারা কাফির ও মুশরিক, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যেখানে তারা সবাই প্রবেশ করবে অত্যন্ত নিগৃহীত হয়ে।

---

[71]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ৩২।

দ্বিতীয় প্রকার : শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক

শির্কে আসগার এর সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে কোনো কোনো মনীষী বলেছেন : ‘‘শির্কে আকবার নয় এমন যে-সব কর্মকে শরী‘আতের ‘নস’ অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা শির্ক বলে নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগার। যেমন- কেউ যদি বলে : (ماشاء الله و شئت)‘আল্লাহ আর আপনি যা চান’, (و لو الله و أنت) আল্লাহ আর আপনি যদি উপস্থিত না থাকতেন তা হলে আমার মহা বিপদ হয়ে যেতো’। অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে শপথ করা ইত্যাদি।’’[৭২]

ড. ইব্রাহীম বুরাইকান এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : ‘‘আমলের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা‘আলার সমান করে নেয়াকে শির্কে আসগর বলা হয়, যেমন- কোন কাজে বা কথায় লোক দেখানোর ভাব করা।’’[৭৩]

ইমাম ইবন কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাঃ (৬৯১-৭৫১হিঃ) শির্কে আসগার এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেনঃ ‘‘উপাসনায় লোক দেখানো ভাব করা, মানুষের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা, আমি আল্লাহ ও আপনার উপর ভরসা করেছি এমনটি বলা,

---

[72]. আস-শায়খ ‘আব্দুল আযীয আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০।

[73]. ড. ইব্রাহীম আল-বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ.১২৬।

আল্লাহ ও আপনি না হলে এমনটি হতো। এ সব উদাহরণ প্রদানের পর তিনি বলেনঃ শির্কে আসগার কখনও কর্তা ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শির্কে আকবারেও রূপান্তরিত হতে পারে।''[৭৪]

আমার মতে 'শির্কে আসগার'এর সংজ্ঞা হলো : ''এমন সব কথা বা কাজ বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সমান করে নেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও এই সমান করাটি প্রকৃতপক্ষে কর্তাব্যক্তির উদ্দেশ্য নয়।'' 'শির্কে আসগার' এর কতিপয় উদাহরণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নের উদাহরণগুলোও তা পরিচয়ের জন্য লক্ষ্যণীয় : যেমন- কোনো ব্যক্তির কথা : 'আল্লাহ আর এই পোষা কুকুরটি না হলে আজ রাতে আমার বাড়ীতে চুরি হয়ে যেতো।' 'আল্লাহ এবং আপনি না হলে আজকে মহা অঘটন ঘটে যেতো।' 'আমি মাটি হাতে নিয়ে বা মায়ের নাম নিয়ে বা সন্তানের মাথায় হাত রেখে শপথ করে বলছি।' 'আমি আল্লাহর অনুগ্রহে এবং আপনাদের দু'আয় ভাল আছি' ইত্যাদি ধরনের কথা।

---

[74]. আশ-শায়খ সুলাইমান ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিল ওয়াহহাব, **তাইসীরুল 'আযীযিল হামীদ ফী শরহে কিতাবিত তাওহীদ;** (বৈরুত : আল-মাকতবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০২হি.), পৃ.৪৫; আস-শায়খ আব্দুল 'আযীয আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ.১৭০-১৭১।

শর‘য়ী দৃষ্টিতে শির্কে আসগারকারীর পরিণতি :

এ শির্কটি পূর্বে বর্ণিত ‘শির্কে আকবার’ এর চেয়ে কম বিপজ্জনক। কেননা, এটি কর্তাব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না বা এতে যে শির্কে আকবার হয়ে থাকে, তাও বলা যায় না। এর প্রমাণ হলো- হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, “একজন মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্নে এক ইয়াহূদী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলে ইয়াহূদী লোকটি তাঁকে বললো : ‘তোমরা অত্যন্ত ভাল জাতি যদি না তোমরা শির্ক করতে। তোমরা বলে থাকো- আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান’। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ স্বপ্নের কথা বলা হলে তিনি বলেন : “আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের এ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত আছি, তোমরা সে ভাবে কথা না বলে এ ভাবে বলো :

«مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ»

“আল্লাহ তা‘আলা যা চান অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান”।[৭৫] এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, ইসলামের প্রারম্ভিক আমলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[75].ইবনে মাজাহ, সুনান; কিতাবুল : কাফফারাত, বাব নং ১৩; ১/ ৬৮৫। মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, বুখারীর শর্ত অনুযায়ী এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য।

ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মাঝে 'আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান', এ-জাতীয় কথা-বার্তা বলার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এমন কথা বলা থেকে বারণ করেন এবং এ ধরনের কথার বদলে নিম্নোক্ত কথা বলতে শিক্ষা দেন :

«ما شاء الله وحده»

"আল্লাহ তা'আলা এককভাবে যা চান"।[৭৬]

অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস দ্বারাও সাহাবীদের মাঝে এ জাতীয় কথা বলার প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন : "এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কোন বিষয়ে কথা বলা প্রসঙ্গে বললো :

«ما شاء الله وشئت»

'আল্লাহ এবং আপনি যা চান'।

লোকটির এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

«أجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده»

---

[76]. তদেব।

"তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিলে? বরং একমাত্র আল্লাহ যা চেয়েছেন।"[৭৭]

এখন কথা হলো: এ জাতীয় কথা-বার্তা যদি তার কথককে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার মত অপরাধ হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ থেকেই অন্যান্য শির্কী কর্মকাণ্ড নিষেধ করার সাথে সাথে এ ধরনের কথা বলাও নিষেধ করে দিতেন। কিন্তু তা বিলম্বে নিষেধ করাতে প্রমাণিত হয় যে, এ জাতীয় কথা অপরাধের দিক থেকে 'শির্কে আকবার' এর মত বড় অপরাধ নয়। তবে তা যে সাধারণ অপরাধের মত একটি অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।[৭৮] তবে এথেকে বিরত থাকলে এর দ্বারা যে আল্লাহর তাওহীদের হেফাযত ও সংরক্ষণ হয়, তা বলা-ই বাহুল্য।[৭৯] এ অপরাধ থেকে তাওবা করা ছাড়া কেউ মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিজ থেকে তা মাফ করে দিতে পারেন। অথবা এমন অপরাধী ব্যক্তি শাফা'আতের সুবিধা পেয়ে হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আত পেয়ে মুক্তি পেতে পারে। নতুবা অপরাধের

---

77. ইবনে কাছীর, **তাফছীরুল ক্বুর'আনিল 'আযীম**; (বৈরুত : দ্বারুল মা'রিফাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), ১/৬০।

78. ড. ইব্রাহীম বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ.১২৮।

79. ইবনে কাছীর, প্রাগুক্ত; ১/৬০।

মাত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করে পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কোনো মু'মিন ও ফেরেশতাদের শাফা'আত পেয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ পাবে।

তৃতীয় প্রকার : শির্কে খফী বা গোপন শির্ক

গোপন শির্ক হচ্ছে সেই সব শির্ক, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এবং সৃষ্টির মাঝে সমকক্ষতার গন্ধ পাওয়া যায়। তবে তা শির্কে আকবার না শির্কে আসগারের অন্তর্গত, তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় না। এ জন্যে যে, ব্যক্তির মুখের কথা ও তার অন্তরে কী ইচ্ছা রয়েছে তা জানার কোনো উপায় নেই।[৮০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের শির্কের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছেন :

«إِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ»

"এটা পিপীলিকার ধীর পদক্ষেপের চেয়েও গোপন।"[৮১]

কর্তাব্যক্তির মনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রকার শির্কের সাথে উপর্যুক্ত দু'টি শির্কের সম্পর্ক থাকার কারণে কোনো কোনো মনীষী এটাকে শির্কে আসগার এর মধ্যেই গণ্য করেছেন। এ

---

[80]. ড. ইব্রাহীম বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ.১২৭। সংক্ষিপ্ত আকারে।

[81]. আহমদ ইবন হাম্বল, প্রাগুক্ত; ৪/৪০৩।

চিন্তার আলোকেই শেখ ‘আব্দুল ‘আযীয আল-মুহাম্মদ আস-সালমান শির্ককে মোট তিন ভাগে বিভক্ত না করে দু’ভাগে বিভক্ত করে শির্কে খফীকে শির্কে আসগারের মধ্যেই গণ্য করেছেন।[৮২]

আমার মতে শির্কের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে শেখ ‘আব্দুল ‘আযীয যে মত পোষণ করেছেন সেটাই সঠিক। কারণ, যারা শির্ককে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন তারা তৃতীয় প্রকার শির্ককে দ্বিতীয় প্রকার শির্ক থেকে ভিন্নভাবে পরিচয় করার জন্যে পৃথক কোনো উদাহরণ পেশ করেন নি। তাদের আলোচনা পড়লে মনে হয় যেন শির্কে খফী অতি গোপন থাকার কারণে তারা দ্বিতীয় প্রকারের মধ্য থেকেই তৃতীয় প্রকার শির্কের জন্ম দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ বিভক্তির মাঝে তেমন কোনো লাভ নেই কারণ; শর‘য়ী হুকুমের দিক থেকে শির্কে আসগার ও শির্কে খফী যে একই পর্যায়ভুক্ত, এ বিষয়ে কারো দ্বি’মত নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এ দু’টি শির্ককে মূলত যে কোনো একটি নামে নামকরণ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। অথবা শির্কে আকবার নয় এমন যাবতীয় শির্ককে এ দু’টি নামে নামকরণ করা যেতো। শির্কে আসগার এ বিবেচনায় যে, তা শির্কে আকবর এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের, আর শির্কে খফী এ বিবেচনায় যে, এ শির্কটি বক্তার

---

[82]. আশ-শায়খ ‘আব্দুল ‘আযীয আস-সালমান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭০, ১৭১।

মনের গভীরে গোপন থাকায় তা শির্কে আকবার না আসগার এর অন্তর্গত- তা নিরূপণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

শির্কে আকবার ও শির্কে আসগার এর মধ্যে পার্থক্য

শির্কে আকবার ও আসগারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

১. অপরাধের দিক থেকে শির্কে আকবার সবচেয়ে বড় অপরাধের অন্তর্গত। আর শির্কে আসগার সাধারণ কবীরা গুনাহের অন্তর্গত।

২. শির্কে আকবার কর্তাব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে থাকলেও বা ধর্মীয় কাজ-কর্ম করলেও আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে সে মুসলিম থাকতে পারে না। কিন্তু শির্কে আসগার কর্তাব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না।

৩. একটি শির্কে আকবার মু'মিনের অতীতের যাবতীয় নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। শির্কে আসগার শুধু সংশ্লিষ্ট আমলকেই ধ্বংস করে। অন্য আমলকে নয়।

৪. শির্কে আকবার থেকে তওবা করতে না পারলে তা কর্তাব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী করে দেয়। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার অযোগ্য হয়ে যায়।

আর শির্কে আসগার থেকে তাওবা না করলেও তা আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমাযোগ্য অপরাধ।

৫. শির্কে আকবার থেকে তাওবা না করলে এবং নতুন করে ইসলামে প্রবেশ না করলে ইসলামী আদালতের রায় অনুযায়ী কর্তাব্যক্তির জীবন ও সম্পদের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। তবে শির্কে আসগারের কর্তাব্যক্তি ফাসিক মু’মিন হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা থাকবে।

শির্কে আকবার এর প্রকার :

শির্কে আকবার এর প্রকার বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ [৮৩]এটিকে মোট চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

---

[83]. শাহ ইসমাঈল শহীদ, শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী এর নাতী ছিলেন। তিনি ১১৯৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। একজন প্রখ্যাত ‘আলেমে দ্বীন ছিলেন। শির্ক ও বেদ‘আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামী নেতা ছিলেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লেখনীর মধ্যে রয়েছে: ‘তাকবিয়াতুল ঈমান ওয়া তাজকিরাতুল ইখওয়ান’ গ্রন্থ। তৎকালীন সময়ে শিখ ধর্মাবলম্বনকারীরা পাঞ্জাব প্রদেশের মুসলিমদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালালে স্যার সৈয়্যিদ আহমদ ব্রেলভী এর নেতৃত্বে ইসলামের প্রসার ও মুসলিমদের মুক্ত

১. জ্ঞানগত শির্ক (الشرك في العلم)

২. পরিচালনাগত শির্ক (الشرك في التصرف)

৩. উপাসনাগত শির্ক (الشرك في العبادات)

৪. অভ্যাসগত শির্ক (الشرك في العادات) [৮৪]

মুবারক ইবন মুহাম্মদ আল-মীলী এটাকে অন্য আরো চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. শির্কুল এহতিয়ায (شرك الاحتياز), এর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন : আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো কোনো বস্তুর উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিকানা রয়েছে বলে বিশ্বাস করাকে শির্কুল এহতিয়ায বলা হয়।

২. শির্কুশ শিয়া' (شرك الشياع), এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ জগতের কোনো বস্তুতে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো একচ্ছত্র মালিকানা না থাকলেও কোনো কোনো বস্তুতে আল্লাহর সাথে

করার জন্য শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত একাধিক যুদ্ধে অংশ গৃহণ করে ১২৪৬ হিজরীতে বালাকোটের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। 'তাকবিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[84].শাহ ইসমাঈল শহীদ, **তাক্বিয়াতুল ঈমান**; (দেওবন্দ : মাকতাবা থানভী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৯-৫৬।

অন্যের যৌথ মালিকানা রয়েছে। যদিও উভয়ের মাঝে অবস্থান ও মর্যাদার দিক থেকে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

৩. শির্কুল এ'য়ানত (شرك الإعانة), এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, এ জগতের কোন কিছুতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মালিকানা বা শরিকানা না থাকলেও এর কোনো কোনো বিষয়াদি পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্যকারী রয়েছে।

৪. শির্কুশ শাফা'আত (شرك الشفاعة), এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর বান্দাদের মাঝে এমন কতিপয় বান্দাও রয়েছেন যারা তাঁদের মর্যাদার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর পূর্ব অনুমতি ছাড়াই নিজস্ব শাফা'আতের মাধ্যমে নিজ নিজ ভক্ত অনুরক্তদের আল্লাহর পাকড়াও থেকে নাজাত দিতে সক্ষম।[৮৫]

তিনি তাঁর এ চার প্রকার শির্ক প্রমাণের জন্যে কুরআনুল কারীমের নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

[85]. মুবারক ইবন মুহাম্মদ আল-মীলী, **আশশির্ক ওয়া মাজাহিরুহু;** (মদীনা : আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭হি.), পৃ. ৬৫, ৬৬।

﴿ قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣]

"আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য বলে ধারণা করেছ তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ ওজনের কিছুরও মালিক নয়, এতে তাদের কোন শরীকানাও নেই, তাদের মধ্য থেকে কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়, যার জন্য তিনি শাফা'আতের অনুমতি দেবেন কেবল সে ব্যতীত কারো শাফা'আত কারো জন্যে উপকারে আসবে না।"[৮৬]

তিনি এ আয়াতটি উদ্ধৃত করে বলেন : এ আয়াত থেকে শির্কের কোন প্রকারই বাদ পড়ে যায় নি।[৮৭] 'আল-ঈমান ওয়া আ-ছা-রুহু ওয়া আশ শির্কু ওয়া মাজাহিরুহু' কিতাবের লেখকও অনুরূপ দাবী করেছেন।[৮৮] তবে উপর্যুক্ত আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এ আয়াতে মূলত পরিচালনাগত শির্ক সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে, যা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত শির্ক। এতে মহান আল্লাহ চার

---

86. আল-কুরআন, সূরা আস-সাবা : ২২।

87. তদেব।

88. জাকারিয়া আলী ইউসুফ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৮০।

প্রকারের পরিচালনাগত ধারণার শির্কের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি কাফিরদের বলে দিয়েছেন যে, যাদেরকে তোমরা তোমাদের ইহকালীন কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের মালিক বলে ধারণা করেছো, তারাতো আসলে তোমাদের কিছুই করার মালিক নয় কারণ; কোন বস্তুর মালিক তার মালিকানার অবস্থানুযায়ী সে বস্তুটি পরিচালনা বা তাতে হস্তেক্ষেপ করে থাকে। আর কোন বস্তুতে কারো মালিকানা সর্বোচ্চ চার ধরনের হতে পারে :

১. হয়তো কেউ এ জগতের কোন বস্তুর পরিপূর্ণ মালিক হবে, ফলে সে তার মালিকানাধীন বস্তুটি যেমন ইচ্ছা পরিচালনা করবে।

২. কোন কিছুতে কারো পরিপূর্ণ মালিকানা না থাকলে হয়তো এর কোন কিছুতে কারো শরীকানা থাকতে পারে এবং সে অনুযায়ী সে তা পরিচালনার ক্ষেত্রে শরীক হতে পারে।

৩. কোন কিছুতে কারো কোন মালিকানা বা শরীকানা কোনটাই না থাকলে হয়তো কোন কিছু পরিচালনার ক্ষেত্রে কেউ কারো সাহায্যকারী হতে পারে।

৪. তাও যদি না হয়, তবে হয়তো বা কেউ নিজের মর্যাদার বদৌলতে কারো কোন কিছু পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বঘোষিত উপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে এবং তার সুপারিশ ও উপদেশ অনুযায়ী কিছু পরিচালিতও হতে পারে।

উপর্যুক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ কাফিরদের বলে দিলেন : তোমরা যাদেরকে তোমাদের ভাগ্যের কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক বলে ধারণা করে বসেছো, তারাতো উক্ত এ চার ধরনের মালিকানার কোনোটিরই মালিক নয়; সুতরাং তারা কিভাবে তোমাদের কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণে কাজ করবে? এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, উপর্যুক্ত আয়াতে কেবল পরিচালনাগত শির্কের যাবতীয় দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। জ্ঞানগত, উপাসনাগত ও অভ্যাসগত শির্ক সম্পর্কে এ আয়াতে কোন আলোকপাত করা হয় নি। কাজেই মুহাম্মদ ইবন মুবারক আল-মীলী উপরে যে দাবী করেছেন, তা যথার্থ বলে মনে হয় না।

আবুল বাকা আল-হানাফী আবার শির্ককে অন্য আরো ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. শির্কুল ইস্তেকলাল (شرك الاستقلال) : এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন : আল্লাহর পাশাপাশি আরো দু'জন স্বয়ংসম্পূর্ণ শরীক থাকার ধারণা পোষণ করাকে 'শির্কুল ইস্তেকলাল' বলা হয়। যেমন- অগ্নিপূজকদের শির্ক; তারা যাবতীয় কল্যাণের বিষয়াদিকে 'ইয়াজদান' নামক দেবতার কাজ বলে মনে করতো, আর যাবতীয় অকল্যাণমূলক কাজকে 'আহরমন' নামক দেবতার কর্ম বলে মনে করতো।

২. শির্কুত তাবয়ীদ (شرك التبعيض) : একাধিক উপাস্য থেকে এক উপাস্য গঠন করাকে 'শির্কুত তাবয়ীদ' বলা হয়। যেমন- খ্রিষ্টানদের শির্ক। তারা বলে : আল্লাহর তিনটি অংশ রয়েছে, যথা : পিতা, পুত্র ও রুহুল কুদুস অথবা মরয়ম, ঈসা ও রুহুল কুদুস। এই তিনে মিলে হলেন এক আল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ তিন ইলাহের তৃতীয় জন।

৩. শির্কুত তাকলীদ (شرك التقليد) : অন্যের অনুসরণে গায়রুল্লাহের উপাসনা করাকে 'শির্কুত্ তাকলীদ' বলা হয়। যেমন- আরব জনগণের শির্ক, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণে মূর্তি পূজা করতো।

৪. শির্কুত্ তাকরীব (شرك التقريب) : আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহের উপাসনা করাকে 'শির্কুত্ তাকরীব বলা হয়। যেমন- আরবের মুশরিকরা বলতো :

﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣]

"আমরা দেবতাদের উপাসনা কেবল এ-জন্যেই করছি যে, তারা আমাদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।"[৮৯]

---

89. আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার : ৩।

৫. শির্কুল আসবাব (شرك الأسباب) : কোনো বিষয় আল্লাহর কারণে হয়েছে এমনটি না বলে অপর কোনো বস্তুর প্রভাবে তা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা বা বলাকে শির্কুল আসবাব বলা হয়। যেমন- প্রকৃতিবাদীদের শির্ক, যারা এ-জগত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য আল্লাহর পরিকল্পনাকে স্বীকার না করে প্রকৃতিকেই এর পরিচালক বলে মনে করে।

৬. শির্কুল আগরাদ (شرك الأغراض) : গায়রুল্লাহের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজ করাকে 'শির্কুল আগরাদ' বলা হয়।[৯০]

ড. ইব্রাহীম বুরাইকান শির্কে আকবারকে অপর আরো ছয় প্রকারে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

(১) আহ্বানগত শির্ক (২) উদ্দেশ্যগত শির্ক (৩) আনুগত্যগত শির্ক (৪) ভালোবাসাগত শির্ক (৫) ভয়ভীতিগত শির্ক (৬) ভরসাগত শির্ক।[৯১]

---

90. মুবারক ইবন মুহাম্মদ আল-মীলী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৬। তিনি এ প্রকারগুলো আবুল বাকা এর كليات নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। অনুরূপভাবে দেখুন : আহমদ রূমী, **মাজালিসুল আবরার;** (করাচী : দ্বারুল এশা'আত, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ১৫০।

91. ড. ইব্রাহীম বুরাইকান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৮-১৩৮।

বিভিন্ন মণীষীগণ শির্কে আকবার এর প্রকার সম্পর্কে যা বলেছেন সেগুলো নিয়ে একটু ভাবলে দেখা যায় যে, আবুল বাক্কা কর্তৃক বর্ণিত প্রকারসমূহের মধ্যকার প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম প্রকার মূলত পরিচালনাগত শির্কের অন্তর্গত। পঞ্চম প্রকারটি পরিচালনাগত শির্কের অন্তর্গত হওয়ার বিষয়টি নিতান্তই পরিষ্কার। প্রথমটি পরিচালনাগত শির্কের অন্তর্ভুক্ত এভাবে যে, অগ্নিপূজকরা ভাল ও মন্দ সৃষ্টির কর্ম পরিচালনার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ দুই ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর দ্বিতীয়টি এর অন্তর্ভুক্ত এভাবে যে, খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে তিন ইলাহের একজন বলে বিশ্বাস করে এবং এক ইলাহ গঠনের ক্ষেত্রে এ তিন ইলাহের কার্যকর প্রভাব রয়েছে বলে মনে করে। অবশিষ্ট তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার উপাসনাগত শির্কের অন্তর্গত এবং ষষ্ঠ প্রকারটি শির্কে আসগার এর অন্তর্ভুক্ত।

ড. বুরাইকান কর্তৃক বর্ণিত প্রকারগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, একমাত্র দ্বিতীয় প্রকারটি ব্যতীত অবশিষ্ট সকল প্রকারই উপাসনাগত শির্কের অন্তর্গত। আর দ্বিতীয় প্রকারের একক কোনো অস্তিত্ব নেই কারণ; উদ্দেশ্যতো সর্বদাই কোনো কর্ম ও উপাসনার সংগী হয়ে থাকে। মানুষ যে উদ্দেশ্যে যে কর্ম করে তার কর্ম সে উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

আল্লামা ইসমাঈল শহীদ কর্তৃক বর্ণিত প্রকারগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ প্রকারগুলো কুরআন ও হাদীস দ্বারা

সমর্থিত, কেননা; কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়ার যুগে আরব সমাজে যে সব শির্কের প্রচলন ছিল, তা এ-চার প্রকার শির্কের অন্তর্গত ছিল। সে জন্যেই কুরআন ও হাদীসে এ চার প্রকার শির্কেরই সমালোচনা করা হয়েছে। যেহেতু আল্লামা ইসমাঈল শহীদ কর্তৃক বর্ণিত প্রকারগুলো কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত, সেহেতু আমার দৃষ্টিতে শির্কে আকবারকে এ চার প্রকারে বিভক্ত করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আর সে জন্যেই ইনশা আল্লাহ নিম্নে আমরা শির্কে আকবারকে উক্ত চার প্রকারেই বিভক্ত করবো।

শির্কে আকবার এর প্রথম প্রকার : জ্ঞানগত শির্ক (الشرك في العلم)

আমরা যত কিছুই জানি না কেন আমাদের সকলের জ্ঞানের সমষ্টি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় মহা সমুদ্রের একবিন্দু পানিরও সমতুল্য নয় কারণ; মহান আল্লাহর জ্ঞান হচ্ছে তাঁর সত্তাগত ব্যাপার, আর আমাদের জ্ঞান হচ্ছে অর্জনগত ব্যাপার। তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করে পঞ্চেন্দ্রিয়[৯২], ইলমে জরুরী[৯৩] ও

---

[92]. الحواس الخمسة : পঞ্চেন্দ্রিয়কে 'আলহাওয়াসসুল খামসাঃ' বলা হয়। 'হাওয়াছ' শব্দটি 'হাছছাতুন' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ ইন্দ্রিয়। যার দ্বারা কোন বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয় তাকে 'হাওয়াছ' বলা হয়। তা দু'প্রকার: প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় হলো পাঁচটি, যথা : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও স্পর্শ । একইভাবে অপ্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ও পাঁচটি, যথা:

الحواس المشترك। কোন বস্তুর আকৃতি অনুধাবনের শক্তিকে 'আল-হাওয়াচ্ছুল মুশতারাক' বলা হয়। الخيال : অনুধাবনকৃত আকৃতির সংরক্ষণের স্থানকে 'খায়াল' বলা হয়। المتصرفة : সংরক্ষণ স্থানের পরিচালনাকারী শক্তিকে 'আল-মুতাসাররিফাহ' বলা হয়। الواهمة: এমন এক শক্তি যা ব্যক্তিগত বোধসমূহকে অনুধাবন করে। الحافظة : ধারণা শক্তিকে অনুধাবনের খাজানাকে 'হাফেজা' বলা হয়। তর্ক শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় এ পঞ্চেন্দ্রীয়কে 'وجدانيات' বলা হয়। দেখুন : মাওলানা নূর কলীম, **ব্রেলভী মাযহাব আওর ইসলাম**; (ফয়সালাবাদ : মাকতাবা দারুল 'উলূম ফয়যে মুহাম্মদী, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃঃ. ৮৭-৮৯।

[93]. العلم الضروري : কোন বিষয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যে জ্ঞান অর্জিত হয়, সে জ্ঞানকে 'আল-ইলমুদ দরূরী' বলা হয়। তর্কশাস্ত্রবিদগণ এ জ্ঞানকে التصديق البديهي বলে থাকেন। যা সাত প্রকার : ১. بديهيات : প্রথম দৃষ্টিতেই যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তাকে 'বদেহিয়্যাত' বলা হয়। ২. حسيات যে শক্তির সাহায্যে বুদ্ধি অতি দ্রুত কোন বস্তুকে অনুধাবন করতে পারে, তাকে 'হিসসিয়্যাত'বলা হয়। ৩.وجدانيات : হিসসিয়্যাত এর নিকটবর্তী একটি শক্তিকে 'বিজদানিয়্যাত' বলা হয়। ৪. فطريات : যে সকল ব্যপারে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনের জন্যে অন্যান্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, সে-গুলোকে 'ফিতরিয়্যাত' বলা হয়। ৫.حدسيات : যে শক্তির সাহায্যে মানুষ কোন বস্তুকে পরিচয় করতে পারে, তাকে 'হাদাসিয়্যাত' বলা হয়। এ শক্তিকে 'ফারাসত'ও বলা হয়ে থাকে। মুল্লা 'আলী ক্বারী আল-হানাফীর মতে 'ফারাসত' এর মূল হচ্ছে: তা অন্তরে হঠাৎ করে উদিত হয়ে এমনভাবে জেঁকে বসে যেমন সিংহ শিকারের উপর জেঁকে বসে। মুল্লা 'আলী আল-

ইস্তেদলালী[৯৪] এর সাথে জ্ঞান ও বুদ্ধিকে ব্যবহার করে কিছু জ্ঞানার্জনের তৌফিক দিয়েছেন বলেই আমরা কিছু জানতে পারি। আমাদের অসাক্ষাতে ও পিঠের পিছনে যা কিছু ঘটে, সে সম্পর্কে কেউ সংবাদ না দিলে আমরা কিছুতেই তা জানতে পারি না বলে এ সব আমাদের সম্পূর্ণ অজানা ও অদৃশ্য থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে নবী, রাসূল, অলি ও সাধারণ মানুষ সকলেই সমান। মানুষের জন্য যা অজানা ও গায়েব তা দু'ভাগে বিভক্ত :

এক. রেসালত ও এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

দুই. সাধারণ বিষয়াদি

নবী ও রাসূলগণ রেসালত ও এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে সংবাদ পেতেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ বা

ক্বারী আল-হানাফী, শরহু কিতাবিল ফিকহিল আকবার; প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৫। ৬. مجربات : যা অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায়, তাকে ' মুজাররাবাত' বলা হয়। ৭. متواترات : বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য মানুষের ঐকমত্যের ভিত্তিতে যা জানা যায়, তাকে 'মুতাওয়াতিরাত' বলা হয়। এ শর্তে যে, তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া বুদ্ধির কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়।

[94] العلم الاستدلالي. : এটি এমন এক জ্ঞানকে বলা হয় যার মাধ্যমে অপর বস্তু পরিচয়ের ব্যপারে দলীল পেশ করা হয়। যেমন- জ্যোতির্বিজ্ঞান, বালুকণার বিভিন্নতার জ্ঞান, ঔষধের নীতিমালা, গণিতবিদ্যা, টেলিযোগাযোগ ও ডাক্তারী পরীক্ষা নিরীক্ষার যন্ত্রপাতির সংকেতসমূহ জানার জ্ঞান।

ইলহাম অথবা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। আর পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যপারে সংবাদ পেতেন একইভাবে প্রত্যাদেশ বা ইলহাম অথবা সত্য স্বপ্ন বা স্বচক্ষে দেখা কোনো মানুষের সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে। নবী ব্যতীত অন্যান্য সকল মানুষগণ অজানা বিষয়ের সংবাদ আল্লাহর ইচ্ছা হলে কখনও বা ইলহাম কখনও বা সত্য স্বপ্ন, কখনও বা স্বচক্ষে দেখেছে এমন কোনো মানুষের মাধ্যমে পেতে পারেন।

মোটকথা : যা কিছু আমাদের অসাক্ষাতে সংঘটিত হয় তা-ই অদৃশ্য বা গায়েবের অন্তর্গত বিষয়। এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া কোনো মানুষেরই স্বভাব, প্রকৃতি ও তাদের গুণাবলীর মধ্যকার বিষয় নয়; বরং তা আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকারভুক্ত বিষয়। তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা তাঁর নিজের জন্যেই রেখে দিয়েছেন। এটি তাঁর সত্তাগত গুণের অন্তর্গত বিষয়। মহান আল্লাহ এ জাতীয় গুণের একচ্ছত্র অধিকারী হয়েছেন বলেই তিনি আমাদের রব বা প্রতিপালক। তাঁর এ সব গুণ রয়েছে বলেই আমরা প্রকাশ্য ও গোপনে যা কিছুই করি না কেন তিনি তা সম্যকভাবে অবহিত রয়েছেন। তাঁর সৃষ্টির কেউ এ গুণের কম-বেশী অধিকারী হতে পারলে সে তো তাঁর এ বিশেষগুণের সাথে শরীক হয়ে যাবে। সে জন্যে তিনি কস্মিনকালেও তাঁর কোন সৃষ্টিকে এ গুণের নূন্যতম অধিকারীও করেন না।

গায়েবের যাবতীয় চাবিকাঠির একচ্ছত্র মালিক হলেন তিনিই। সে জন্য তিনি কুরআনুল কারীমে বলেন :

﴿ ۞وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩ ﴾ [الانعام: ٥٩]

“আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে গায়েবের সকল চাবিকাঠি, তিনি ব্যতীত তা কেউ জানে না, স্থলে ও জলে যা কিছু রয়েছে তিনি তা অবগত রয়েছেন, গাছের একটি পাতা পড়লেও তিনি তা জানেন, পৃথিবীর অন্ধকার অংশে কোন শষ্যকণা বা কোন আদ্র বা শুষ্ক বস্তু পতিত হলে তাও প্রকাশ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।”[৯৫] আল্লাহ তা‘আলা তাঁর গায়েব সম্পর্কে জানার ব্যাপারে উক্ত আয়াতে উদাহরণস্বরূপ যা কিছুর বর্ণনা দিয়েছেন, কোনো মানুষের পক্ষে- তিনি যত বড় মর্যাদারই অধিকারী হোন না কেন- আল্লাহ বা অপর কোনো মানুষ তা স্বচক্ষে দেখে তাকে তা জানিয়ে না দিলে তার পক্ষে তা নিজ থেকে কোনোভাবেই জানা সম্ভবপর নয়। গায়েবের জ্ঞান বলতে কেবল আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়কেই বুঝায় না; বরং গায়েব বলতে সে সকল বিষয়ও বুঝায়, যা আমাদের অসাক্ষাতে বা পিঠের পিছনে সংঘটিত হয়, যদিও

---

[95]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন‘আম : ৫৯।

অপর কারো সামনে তা সংঘটিত হওয়ার কারণে সে ব্যক্তির নিকট তা গায়েব নয়। কিন্তু আল্লাহর ব্যাপার হলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তিনি হলেন :

﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ﴾ [الحشر: ٢٢]

“সকল গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানী।”[৯৬]

কোন বস্তুর হাযির বা গায়েব হওয়া মূলত আমাদের বিবেচনায়, আল্লাহর বিবেচনায় গায়েব ও হাজির বলতে কিছুই নেই, কেননা; সব কিছুই তাঁর কাছে উপস্থিত বা হাজির। এমন কোনো বস্তু নেই যা তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়েব জ্ঞান:

গায়েব সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অপর কেউ কিছুই জানে না, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ٦٥ ﴾ [النمل: ٦٥]

“আপনি বলুন: আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে আল্লাহ ব্যতীত তাদের কেউই গায়েব জানে না, আর তারা কখন পুনরুত্থিত হবে তাও তারা জানে না।”[৯৭]

---

[96]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর : ২২।

[97]. আল-কুরআন, সূরা আন-নামল : ৬৫।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গায়েব সম্পর্কে অবগত হওয়া কেবল আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। পুনরুত্থানের বিষয়টি গায়েবের অন্তর্গত একটি বিষয়। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে জনগণকে সংবাদ দিয়ে থাকলেও এটি কখন সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কে তিনিও কোনো সুনির্দিষ্ট জ্ঞান রাখেন না। তিনি তাঁর এই অজ্ঞতাকে জনগণের সম্মুখে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়ার জন্যে আল্লাহ বলেন :

﴿ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرۡسَىٰهَاۖ قُلۡ إِنَّمَا عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّيۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقۡتِهَآ إِلَّا هُوَۚ﴾ [الاعراف: ١٨٧]

"আপনাকে তারা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি তাদের বলুন: এর জ্ঞান রয়েছে কেবল আমার প্রতিপালকের নিকট, তিনি ব্যতীত এর সময় কেউই বলতে পারে না।"[৯৮]

এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এমন সব বাস্তব অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা পরিষ্কারভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি গায়েব সম্পর্কে আদৌ কিছুই

---

[98]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : ১৮৭।

জানতেন না। তাঁর জীবনের বিবিধ ঘটনাপঞ্জীর মধ্য থেকে নিম্নে চারটি উদাহরণ পাঠকগণের বুঝার সুবিধার্থে তুলে ধরা হলো :

অপবাদের ঘটনা قصة الإفك:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার উপর 'বনু মুসতালিক' যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে মুনাফিকরা একজন নিরপরাধ সাহাবীর সাথে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। সাধারণ জনগণের মাঝে এ নিয়ে অনেক তোলপাড় শুরু হয়েছিল। এমনকি এ নিয়ে কিছু সাধারণ মুসলিমরাও কথা বলাবলি শুরু করেছিল। ঘটনার সত্য-মিথ্যা না জানার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যাপারে অনেকটা সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি শেষ অবধি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এবং যায়দ ইবনে হারিছাহ্ এর সাথে এ নিয়ে পরামর্শও করেছিলেন। প্রায় তিন সপ্তাহেরও বেশী সময় এ ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর অবশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ মর্মে আয়াত নাযিল হয় :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلۡإِفۡكِ عُصۡبَةٞ مِّنكُمۡۚ ﴾ [النور: ١١]

“যারা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটি দল...।”[৯৯]

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ঘটনার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যদি বাস্তবে গায়েব সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখতেন, তা হলে জনগণের মধ্যে এ বিষয়টি ছড়া-ছড়ি হওয়ার পূর্বেই তিনি এর ভিত্তিহীনতার কথা ঘোষণা করে দিতেন। ঘটনার সত্য-মিথ্যা জানার জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন যাবৎ অহীর জন্য অপেক্ষা করতে হতো না।

দ্বিতীয় উদাহরণ :

উম্মুল মু'মিনীন আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিনতে জাহাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহ থেকে আমাদের দু'জনের মধ্যে যার গৃহেই প্রথমে প্রবেশ করবেন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলবে- ‘আমি আপনার মুখে মাগাফীর[১০০]

---

[99]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর : ১১।

[100]. ‘উরফুত’ নামক এক জাতীয় গাছ থেকে নির্গত মিঠা রস বিশেষকে ‘মাগাফীর’ বলা হয়। যা (খেজুরের রসের ন্যায়) পান করা হয়। ইব্রাহীম

এর দুর্গন্ধ পাচ্ছি'। তাঁদের এ ঐকমত্যে পৌঁছার মূল উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বলার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে অধিকহারে যাওয়া থেকে বিরত রাখা। যথারীতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহ থেকে বের হয়ে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করলে তিনি বললেন-'আমি আপনার মুখে মাগাফিরের দুর্গন্ধ পাচ্ছি'। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্যে মধু পান করা হারাম করে দিলেন। তিনি আদৌ বুঝতেও পারেন নি যে, এটি ছিল যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে অধিকহারে যাওয়া থেকে তাঁকে বারণ করার জন্য তাঁদের দু'জনের একটি ফন্দি বিশেষ। সূরা তাহরীমের মধ্যে এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আসার পরই তিনি তাঁদের ফন্দির ব্যাপারে অবহিত হন।[১০১]

মুস্তফা ও গং, **আল-মু'জামুল ওয়াসীত**; (তেহরান : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), ১/৬৬৩।

[101]. হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুার উক্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উপর মধু পান করা হারাম করেছিলেন, না তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করার ব্যাপারে শপথ করেছিলেন, এ নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা থাকলেও বিশেষজ্ঞদের মতে মধু পান হারাম করার বিষয়টিই সঠিক। দেখুন:ইবনে কাছীর, **তাফছীরুল কুরআনিল 'আযীম**; (বৈরুত : দ্বারুল মা'রিফাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.) ৪/৪১৩।

তৃতীয় উদাহরণ :

কাফের ও মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রূহের প্রকৃতি, গুহাবাসী (أصحاب الكهف) ও জুলকারনাইন বাদশার ইতিহাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। এ তিন বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ কোনো জ্ঞান না থাকায় তিনি তাদেরকে এ-সবের তাৎক্ষণিক কোনো জবাব দিতে না পেরে ইন-শাআল্লাহ না বলে পরবর্তী দিনে এর জবাব দেয়ার ব্যপারে প্রতিশ্রুতি দান করেন। তাঁর এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাঁকে এ তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব সম্পর্কে অবহিত করবেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেয়ার সময় ইন-শাআল্লাহ না বলার ফলে প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে এর জবাবে তাঁর নিকট কোনো অহী আসে নি। পরবর্তীতে পনের দিন পর এ সব প্রশ্নের জবাবে অহী অবতীর্ণ হয় এবং প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময় ইন-শাআল্লাহ না বলার কারণে তাঁকে হালকা ভাষায় কিছুটা ভৎর্সনা করা হয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا ۝٢٣ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]

“যে কাজ তুমি আগামীকাল করবে সে ক্ষেত্রে ইন-শাআল্লাহ না বলে কোনো কথা বলো না।”[১০২]

চতুর্থ উদাহরণ :

মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন আরবের ‘নজদ’ এলাকায় তাঁর কতিপয় সাহাবীকে দ্বীনের তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু; পথিমধ্যে তাঁরা শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন, তাঁদের মধ্যকার কেবল একজন সাহাবী ব্যতীত বাকী সকলেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যদি এ অকল্পনীয় দুঃখের কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন, তবে তাঁর এতোগুলো সাহাবীকে এ ভাবে প্রেরণ করতেন না।[১০৩]

উপরে যে চারটি উদাহরণ পেশ করা হলো তাতে জ্ঞানীদের জন্যে এ-কথার প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মগতভাবে বা নবুওত লাভের পরে আল্লাহর

---

[102]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহাফ : ২৩। কাফেরদের আগমন ও এ তিনটি প্রশ্ন সম্পর্কে বিষদভাবে জানার জন্য দেখুন : ইবনে হিশাম, আস্ সীরাতুন নববিয়্যাহ; সম্পাদনা :মুস্তফা আস-সাক্কা ও গং, (মিশর : তুরাছুল ইসলাম, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), ১/৩০১-৩০৩।

[103]. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : আল-মুবারকপূরী, সফিয়্যুর রহমান, **আর-রাহীক্বুল মাখতূম**; (রিয়াদ : দারুস সালাম, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯৪ খ্রি.,), পৃ. ২৩৯।

পক্ষ থেকে তাঁকে দেয়া তাঁর এমন কোনো যোগ্যতা ছিল না, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর অসাক্ষাতে সংঘটিত বিষয়াদি জানতে সক্ষম হতেন। যদি জানতেন তা হলে উক্ত এ চারটি বিষয়ের বাস্তব অবস্থা তিনি যথা সময়ে অবগত হতে পারতেন। এ ভাবে অহী অথবা অন্য কোনো উপায়ে তা জানার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হতো না।

কথা এখানেই শেষ নয়, মহান আল্লাহ যে গায়েব বা অদৃশ্যের একক জ্ঞানী, সে-কথা শুধু তাঁর নবীকে জানিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়ে যান নি, বরং তাঁর নবীর মান ও মর্যাদার দিক বিবেচনা করে কেউ যাতে তাঁর ব্যাপারে গায়েব জানার ধারণা করে না বসে, সে জন্য তিনি তাঁর নবীর প্রতি এ নির্দেশও প্রদান করেছেন যে, তিনি যেন গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার বিষয়টি জনসাধারণের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে দেন। সে জন্যে তাঁকে জনগণের মাঝে এ ঘোষণা দিতে বলেন :

﴿ قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨ ﴾ [الاعراف: ١٨٨]

আপনি বলুন : কেবল আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণের

অধিকার রাখি না। আমি যদি গাযেব জানতাম, তা হলে আমি অনেক কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হতাম, আর আমাকে কোনো অকল্যাণই স্পর্শ করতে পারতো না। আমিতো কেবল একজন সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী মাত্র, সেই সকল মানুষের জন্যে যারা বিশ্বাসী।"[১০৪]

এ ঘোষণার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, গায়েব সম্পর্কে অবগত হওয়া আমার কাজ নয়। আমার কাজ হচ্ছে বিশ্বাসীদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করা আর জাহান্নাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা। আমি আসলে গায়েব সম্পর্কে যদি কিছু অবগত হতে পারতাম, তা হলে আমার জীবনে শুধু কল্যাণেরই ফল্গুধারা বয়ে যেতো, কখনও আমার কোনো অকল্যাণ হতো না; অথচ আমার জীবন এ-কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমি বহু অকল্যাণের শিকার হয়েছি। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমি গায়েব সম্পর্কে আদৌ কোনো জ্ঞান রাখি না। আখেরাত, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি গায়েব সম্পর্কিত বিষয়ে আমি যা কিছু বলছি তা আমার নিজ থেকে তৈরী কোনো উদ্ভট কথা নয়, আল্লাহ আমাকে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন বলেই আমি তা বলছি।

[104]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : ১৮৮।

গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত না থাকার ফলেই তো তাঁকে জাদু স্পর্শ করেছিল; এ কারণেই তো ত্বায়েফের মুশরিকদের লেলিয়ে দেয়া শিশু ও দাসদের প্রস্তরের আঘাতে তাঁর গোটা শরীর জর্জরিত হয়েছিল; উহুদের যুদ্ধে তাঁর দাঁত মুবারক পড়ে গিয়েছিল, সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়েছিল ও অসংখ্য সাহাবী আহত হয়েছিল; খয়বরের যুদ্ধের সময় জনৈকা ইয়াহূদী মহিলা কর্তৃক বিষ মাখা খাদ্য খেয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে এর ব্যথা অনুভব করতে হয়েছিল। বাস্তবেই তিনি যদি গায়েব সম্পর্কে কিছু জানতেন, তবে তাঁর জীবনে তিনি এ সব বিড়ম্বনার শিকার হতেন না। যদি বলা হয় যে, তিনি এ সব বিপদের কথা জেনেও ত্বায়েফ ও উহুদের ময়দানে গেছেন, তা হলে বলতে হবে যে, বিপদের কথা জেনেও তিনি নিজেকে ও তাঁর সাথীদেরকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন!! অথচ এ জাতীয় চিন্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কোনোভাবে করা যায় না; কেননা তিনি কোনো ভাবেই নিম্নোক্ত আয়াতের বিপরীত কাজ করতে পারেন না :

﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা"[১০৫] এ-আয়াতের নির্দেশের বিপরীত কাজ করতে পারেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যায় অপর কেউই গায়েব সম্পর্কে অবগত নয় :

গায়েব সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল, তাঁর খলীল ও হাবীবের অবস্থা যদি এই হয়, তিনি যদি আল্লাহর জানানোর বাইরে তাঁর চোখের আড়ালে ও পিঠের পিছনে সংঘটিত বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকেন, তা হলে তাঁর উম্মতের মধ্যকার অলি, দরবেশ ও অন্যান্যদের অবস্থা যে কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। তিনি যেমন তাঁর জীবদ্দশায় নিজ থেকে কোনো অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেন নি, তেমনি তাঁর তিরোধানের পরেও তাঁর পক্ষে তা অবগত হওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই তাঁর তিরোধানের পর যখন খেলাফতের বিষয় নিয়ে সাহাবীদের মাঝে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তাঁর পক্ষে যেমন তা নিজ থেকে অবগত হওয়া সম্ভব হয় নি, তেমনি অপর কোনোভাবে জেনে তাঁদেরকে সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা প্রদান করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি নিজ থেকে পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে আগাম কিছু অবহিত হতে পারেন না বলেই তাঁর

---

[105]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৯৫।

আদরের নাতি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কারবালার প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে রূহানী শক্তি বলে তাঁকে সেখানে যাওয়া থেকে বারণ করতে পারেন নি। তিনি আল্লাহর রাসূল হয়েও যদি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রূহানী শক্তি বলে নিজ আত্মীয় ও উম্মতদের বিপদের কথা জানতে না পারেন এবং তাদের কোনো উপকার করতে না পারেন, তবে তাঁর উম্মতের মধ্যে এমন রূহানী শক্তিসম্পন্ন কে থাকতে পারে, যিনি মৃত্যুর পর এমন যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব হয় নি ? যদি কেউ এমন দাবী করে তবে সে হবে একজন মস্ত বড় মিথ্যুক ও প্রতারক।

ইলমে গায়েব সম্পর্কিত সংশয় নিরসন :

কারো অন্তরে এমন সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব সম্পর্কে কেমন করে জ্ঞাত হবেন না, অথচ তিনি আমাদেরকে পার্থিব ও পরকালীন অসংখ্য গায়েব সম্পর্কিত বিষয়ের সংবাদ দান করেছেন? এ জাতীয় সংশয় নিরসনের জবাব রয়েছে কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ۝٢٦ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]

“তিনি গায়েবের জ্ঞানী, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত অপর কারো কাছে তাঁর গায়েবকে প্রকাশ করেন না।”[১০৬]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলাই হলেন অদৃশ্যের একক জ্ঞানী। তিনি শুধুমাত্র তাঁর মনোনীত রাসূলদেরকে তাঁদের প্রতি অর্পিত রেসালতের দায়িত্ব আদায়ের প্রয়োজনে যতটুকু অদৃশ্য সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করা প্রয়োজনবোধ করেন, ঠিক ততটুকুই তাঁদেরকে অবহিত করেন। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মনোনীত রাসূল ছিলেন বিধায়, তাঁকেও রিসালতের প্রয়োজনে কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়েছিলেন। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছাধীন কোনো বিষয় ছিল না যে, যখন ইচ্ছা তিনি তখনই তা জানতে পারতেন এবং জনগণকে তা বলে বেড়াতে পারতেন।

প্রকৃতকথা হলো, রিসালত আদায়ের স্বার্থে এবং জনগণের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর প্রয়োজনে তাঁকে গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু জানানো আল্লাহ তা‘আলা জরুরী মনে করেছিলেন, তাঁকে ঠিক সেটুকুই জানিয়েছিলেন। এর বাইরে গায়েবের সাথে সম্পর্কিত

---

[106]. আল-কুরআন, সূরা আল-জিন : ২৬, ২৭।

অন্যান্য বিষয়াদি জানার তাঁর নিজস্ব বা আল্লাহ প্রদত্ত স্থায়ী কোনো যোগ্যতা ছিল না।

সাধারণ জনগণের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসাক্ষাতে সংঘটিত হওয়া কিছু বিষয়াদির সংবাদ দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে এমনি ধরনের দু'টি গায়েবের উদ্ধৃতি প্রদান করা হলো :

এক. বদর যুদ্ধের পর 'উমায়ের ইবন ওয়াহাব ও সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ এ মর্মে একমত পোষণ করেছিলেন যে, 'উমায়ের তার ছেলেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মদীনায় যেয়ে সুযোগমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করবে, এতে 'উমায়েরের জীবন নাশ হলে সাফওয়ান তার যাবতীয় দেনা শোধ এবং আজীবন তার পরিবারের সদস্যদের ব্যয়ভার গ্রহণ করবে। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যখন 'উমায়ের মদীনায় গমন করে এবং কোষবদ্ধ তরবারী নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাকে তাদের সে ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেন।[১০৭]

---

[107]. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত; ১/৬৬২।

ঘটনার বিবরণে যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কিভাবে তা জানলেন এর কোনো বর্ণনা নেই, তথাপি এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মহান আল্লাহই তাঁকে তা জানিয়েছিলেন। ঘটনার সাক্ষী 'উমায়ের এর মুখেও আমরা এ কথারই স্বীকৃতি দেখতে পাই। 'উমায়ের নিজেই তাদের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়া দেখে সাথে সাথে বলে উঠে যে, এটি এমন একটি ঘটনা যা আমি এবং সাফওয়ান ব্যতীত অপর কেউ জানে না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমি নিশ্চিত করে বলছি, এ সংবাদ আপনাকে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ দেয় নি। এ কথা বলেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১০৮]

দুই. আত্তাব ইবন উসায়েদ, আবু সুফিয়ান ও হারিছ ইবন হিশাম এ তিন ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিনে কা'বা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে মক্কার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে পরস্পর মত বিনিময় করছিল। এ সময় আত্তাব বলেছিল : 'আল্লাহ উসায়েদকে বড় সম্মান দিয়েছেন যে, মক্কার উপর মুহাম্মদ এর বিজয়ী হওয়ার সংবাদ তাকে শ্রবণ করান নি। বেঁচে থাকলে হয়তো মুহাম্মদ - থেকে এমন কোনো কথা তাকে শুনতে হতো, যা তাকে রাগান্বিত করতো'। আত্তাবের এ কথা শুনার পর এবার হারিছ বললো :

---

[108]. তদেব।

‘আল্লাহর শপথ! আমি কোনো প্রকার মন্তব্য করবো না, কারণ; আমি যদি কোনো কথা বলি তাহলে আমার পক্ষ থেকে এ পাথরকণাও মুহাম্মদকে আমার কথার সংবাদ প্রদান করবে’। তাদের এ কথোপকথনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা‘বা শরীফের ভিতর থেকে বের হয়ে তাদের তিন জনকে লক্ষ্য করে বললেন :

«قَدْ عَلِمْتُ الَّذِيْ قُلْتُم»

“তোমরা পরস্পর যা বলাবলি করেছিলে আমি তা অবগত হতে পেরেছি।” এই বলে তিনি তাদের এ আলোচনার কথা বলে দিলে সাথে সাথেই আত্তাব ও হারিছ এই বলে ইসলাম গ্রহণ করেন:

نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ وَاللهِ مَا اطَّلَعَ عَلَى هٰذَا أَحَدٌ كَانَ مَعَنَا فَنَقُوْل : أَخْبَرَكَ

“আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর শপথ! আমাদের সাথের কেউই তো এ কথাগুলো শ্রবণ করতে পারে নি, যার ফলে আমরা এ কথা বলতে পারতাম যে, হয়তোবা কেউ আপনাকে এ সবের সংবাদ দিয়েছে।”[১০৯]

---

[109] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : আল-মুবারকপুরী, সফিউর রহমান, প্রাগুক্ত ; পৃ. ৪০৫।

এ দু'টি ঘটনার ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের যত ঘটনাই আমাদের সম্মুখে আসবে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, এ সব গায়েবী বিষয়াদি তিনি নিজের যোগ্যতা বলে জানতে পারেন নি, মহান আল্লাহ তাঁকে তা জানিয়েছিলেন। পরকালীন গায়েবী বিষয়াদি সম্পর্কে আল্লাহই তাঁকে যা অবগত করিয়েছিলেন, তা-ই তিনি বলেছেন, আবার তাও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাঁকে জানান নি। আখেরাতে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থার কথা তিনি আমাদের বলে থাকলেও তাঁর মর্যাদার সঠিক ধরন ও প্রকৃতি কেমন হবে, সে সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিতভাবে কিছুই জানতেন না। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেন :

﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ﴾ [الاحقاف: ٩]

"বলুন : আমি নতুন কোন রাসূল নয়, আমার ও তোমাদের সাথে (আখেরাতে) কেমন আচরণ করা হবে তা আমি (বিস্তারিতভাবে) জানি না, আমিতো কেবল তা-ই অনুসরণ করে থাকি যা আমার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়।"[১১০]

---

110. আল-কুরআন, সূরা আল-আহক্বাফ : ৯।

উম্মুল 'আলা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেন :

«وَاللَّهِ مَا أَدْرِي، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ»

"আল্লাহ শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল হয়েও আমার ও তোমাদের সাথে আখেরাতে কেমন আচরণ করা হবে তা আমি জানি না।"[১১১]

উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত গায়েব সম্পর্কে তিনি জনগণকে যা কিছু বলেছেন, তা কোন নতুন কথা নয়, বরং এ জাতীয় কথা অতীতের বহু নবী ও রাসূলগণ বলে গেছেন। তা ছাড়া আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত গায়েব সম্পর্কে অবগত হওয়া তাঁর নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নয়, বরং এ সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলেছেন, তা অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েই বলেছেন। আবার আল্লাহ তাঁকে যে বিষয়ে যতটুকু জানিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁর পক্ষে এর বাইরে

---

[111]. বুখারী, হাদীস নং ৭০১৮; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ২/২৩৫; আত-তাবরিযী, ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব, **মিশকাতুল মাসাবীহ**; (মাকতাবা রশীদিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন, পৃ. ৪৫৬)

বিস্তারিত করে আরো কিছু বলারও তাঁর নিজস্ব কোন সূত্র ছিল না।[১১২]

আল্লাহর অলিগণ গায়েব সম্পর্কে কিছুই জানেন না :

গায়েবের জ্ঞান সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে যখন আমরা এ কথা অবগত হতে পারলাম যে, গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বিষয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার কাউকে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেন না। অনুগ্রহপূর্বক যদি তিনি কাউকে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করতেন, তবে তাঁর প্রিয়ভাজন শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এর অধিকারী করতেন। কিন্তু আমরা উপরের আলোচনায় দেখতে পেলাম যে, তাঁকেও তিনি এ গুণের অধিকারী করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-নিজ থেকেও এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দুনিয়া-আখেরাতের গায়েব সম্পর্কিত যা কিছু অবহিত করেছিলেন তাও কেবল তাঁর রেসালত ও এর সাথে

---

[112]. ইমাম ত্বীবী বলেন : আখেরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর উম্মতের সাথে কেমন আচরণ করা হবে তা তাঁর না জানা বলতে তা বিস্তারিতভাবে না জানার কথাই বুঝানো হয়েছে। তিনি যে এ-সব বিষয় মোটামুটিভাবে জানতেন সে জানাটুকুকে এর দ্বারা অস্বীকার করা হয় নি। দেখুন: মিশকাত; টীকা নং - ৬, পৃ. ৪৫৬ ।

সম্পর্কিত বিষয় এবং জনগণের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে তিনি যদি অদৃশ্য সম্পর্কে নিজ থেকে কিছুই জানতে না পারেন, তবে তাঁর উম্মতের মধ্যে এমন কোন্ অলি, গউছ ও কুতুব[113] থাকতে পারেন, যারা নিজ থেকে গায়েব সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন। মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে যদি গায়েব সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে, তবে আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যকার কেউ যে নিজ থেকে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞানের বিষয়টি যখন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের আওতাভুক্ত বিষয়, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে কস্মিনকালেও এ ধারণা পোষণ করা যাবে না যে, তাঁর সত্তার মধ্যে জন্মগতভাবে এমন কোনো যোগ্যতা ছিল যার দ্বারা তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতেন, অথবা জন্মগত না হোক নবুওত পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মধ্যে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যার ফলে তিনি যখন ইচ্ছা গায়েব সম্পর্কে অবহিত হতে পারতেন[114]! একইভাবে

---

[113] যদিও সঠিক কথা হচ্ছে যে, গাউস ও কুতুব বলে কেউ নেই। এসবই মিথ্যা ও মনগড়া কথা [সম্পাদক]

[114] বস্তুত এ ধরণের ধারনা পোষণ করা সরাসরি শির্ক। [সম্পাদক]

আল্লাহর অলিদের ব্যপারেও এমন ধারণা কোনো অবস্থাতেই পোষণ করা যাবে না। আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির বেলায় তো তা কল্পনাই করা যায় না। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কোনো অলি, দরবেশ ও ফকীর অথবা কোনো পশু ও পাখির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়ে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সে মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে গেছে। এমন ধারণা পোষণকারীর জানা আবশ্যক যে, এ জাতীয় শির্কী ধারণা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবী হয়ে প্রেরিত হওয়ার প্রাক্কালে সমগ্র আরব জাহানব্যাপী প্রচলিত ছিল।[১১৫] মুশরিকরা তাদের দেবতাদের ব্যাপারে অনুরূপ ধারণা পোষণ করতো। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা তাদের 'হুবল' দেবতার নিকটে গিয়ে তীর দ্বারা ভাগ্য যাচাই করতো।[১১৬] কুরআনুল কারীমে তাদের এ জাতীয় কর্মকে শয়তানের অপবিত্র কর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১১৭] এ ছাড়াও তাদের মাঝে এ

---

[115].মাওলানা মুহাম্মদ 'আরিফ সম্বহলী, **ব্রেলভী ফিৎনা কী নয়া রূপ**; (উর্দূ ভাষায়), (লাহুর : আশ্রাফ ব্রাদার্স , ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৮৬।

[116]. ইবনু কাইয়্যিম আল-জাউযিয়্যাহ, **এগাছাতুল লাহফান**; (কায়রো : দারুত তুরাছিল 'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ.১৬৯।

[117]. বলা হয়েছে :

বিশ্বাসও ছিল যে, কাহিন ও গণকরা গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, সে জন্যেই তারা তাদের বিবিধ রকমের বিষয়াদির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ জানার জন্য গণকদের কাছে যেতো। আরব সমাজের প্রচলিত শির্ক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ইন-শাআল্লাহ আমরা কুরআন ও হাদীস দ্বারা তা প্রমাণের প্রয়াস পাব।

উপর্যুক্ত ধারণা পোষণকারীর আরো জানা আবশ্যক যে, তার এ জাতীয় চিন্তা 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' এর ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত মূলনীতি বহির্ভূত চিন্তা।[১১৮] এ কারণেই ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ মর্মে ফতোয়া প্রদান করেছেন যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আহ্বান করবে যে, তিনি

﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٩٠﴾ [المائدة: ٩٠]

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কর্ম বৈ আর কিছুই নয়, সুতরাং তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"। আল-কুরআন, সূরা আল-মায়েদাহ : ৯০।

[118]. আবু বকর জাবির আল-জাযাইরী, **ওয়া জাউ ইয়ারকুদুন!!! মাহলান ইয়া দু'আতাত দালালাঃ; (وجاءوا يركضون !!! مهلا يا دعاة الضلالة)** (স্থান বিহীন: মিন ওয়াছাইলিদ দাওয়াঃ, ১৪০৬হিজরী), পৃ. ৪৫; ক্বাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী, ইরশাদুত ত্বালিবীন; ৩/১৯; মুল্লা 'আলী আল- ক্বারী আল-হানাফী, শরহু কিতাবিল ফিকহিল আকবার; পৃ. ২২৫।

অদৃশ্য বা গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার ফলে দূর থেকে তার আহ্বানকে শ্রবণ করে থাকবেন, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।[১১৯] অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো অলিকে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আহ্বান করবে সেও কাফির হয়ে যাবে।[১২০]

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়েবী বা অদৃশ্য জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, আল্লাহ তা'আলার গায়েবী বা অদৃশ্য জ্ঞান হলো তাঁর সত্তাগত (ذاتي) জ্ঞান, আর রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়েবী বা অদৃশ্য জ্ঞান হলো আল্লাহ তা'আলার দান, অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা তাঁকে গায়েবী অদৃশ্য জ্ঞানের যোগ্যতা দান করেছেন, তাই তিনি সে যোগ্যতা বলে গায়েবী বা অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত হতেন, তা হলে সে ব্যক্তিও নিঃসন্দেহে কাফের ও মুশরিক হয়ে যাবে[১২১] কারণ; গায়েব সম্পর্কে অবগত হওয়ার একচ্ছত্র অধিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার। তাঁর অহী অথবা ইলহাম ছাড়া জাগ্রত অবস্থায় তাঁর

---

119. ক্বাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি, প্রাগুক্ত; ৩/৬-৮।

120. মাওলানা মুহাম্মদ নূর কেলীম, **ব্রেলভী মাযহাব আওর ইসলাম**; (ফয়সল আবাদ : মাকতাবাতু দ্বারুল 'উলূম ফয়দে মুহাম্মদী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), পৃ. ৭৬।

121. তদেব।

বান্দাদের পক্ষে তা অবগত হওয়ার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই।[১২২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বত্র (জ্ঞানে ও সাহায্য সহযোগিতায়)[123] হাজির ও নাজির (বা সবকিছু সরাসরি দেখছেন) মনে করা শির্ক :

অনুরূপভাবে কেউ যদি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বত্র (জ্ঞানে ও সাহায্য সহযোগিতায়) হাজির ও নাজির হওয়ার (বা সবকিছু সরাসরি দেখতে পাওয়ার) বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কোথাও মিলাদ অনুষ্ঠান হলে তিনি তা জানতে ও দেখতে পান এবং সেখানে তাঁর রূহ মুবারক

---

[122]. আল-হানাফী, মুল্লা 'আলী আল-কারী, **শরহু কিতাবিল ফেকহিল আকবার**;প্রাগুক্ত; পৃ.২২৫।

[123] যদি কেউ মনে করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বত্র আগমন করেন, তবে তার এ বিশ্বাস করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, যদি বলে যে, তাঁর এ ধরণের বিচরণ করার ক্ষমতা রয়েছে, অথবা বলে যে, আল্লাহ তাকে সেখানে যেখানে সেখানে হাজির হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন, তবে সেটা হবে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতায় শির্ক। এর মাধ্যমে সে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। আর যদি বলে যে, তাঁকে আল্লাহ কখনও কখনও কোনো কোনো মজলিসে হাজির হওয়ার তাওফীক দেন, তবে সেটা হবে বড় ধরণের মিথ্যাচার ও গর্হিত বিশ্বাস, তথা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরণের বিশ্বাস থেকে হেফাযত রাখুন। [সম্পাদক]

সেখানে উপস্থিত হয়, তা হলে সে ব্যক্তিও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে, কেননা; (জ্ঞানে ও সাহায্য সহযোগিতায়)[124] সর্বত্র হাজির হওয়া আর ও নাজির হওয়া (বা সবকিছু সরাসরি দেখতে পাওয়া) আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাঁর কোন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তিনি তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের মাধ্যমেই এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন। এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলেই তিনি আমাদের যাবতীয় কার্য্যকলাপ দূর থেকে অবলোকন করছেন। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কেউ দরূদ পাঠ করলে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দেওয়া হয় বলে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে[১২৫] সেখানে তাঁর ব্যাপারে এমন

---

[124] এ অংশটুকু আমি এ জন্যই যোগ করলাম, কারণ; সর্বত্র সত্তাগত হাজির থাকা, আল্লাহর গুণ নয়। আর তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদাও নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হচ্ছে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন, সেখান থেকে তার সকল সৃষ্টিকে দেখছেন ও প্রয়োজনে ঈমানদারদের সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। তিনি কখনও তার সৃষ্টির ভিতরে হাজির হন না। সুতরাং সৃষ্টির সর্বত্র আল্লাহর সত্তাগত উপস্থিতির বিশ্বাস পোষণ করা শির্ক ও কুফরী। এটি হুলুল তথা অবতারবাদী ও ওয়াহদাতুল ওজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদী হিন্দু আকীদা-বিশ্বাস। মুসলিমদের নয়। [সম্পাদক]

[125] যেমন আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُم»

"(গৃহে নফল নামায ও কুরআন তেলাওয়াত না করে) তোমাদের গৃহগুলোকে কবরে রূপান্তরিত করো না, (আমার উপর দরূদ পাঠ করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে আমার জন্ম বা মৃত্যু অথবা অন্য কোনো দিবসে আমার কবর যিয়ারতে এসে) আমার কবরকে ঈদ বা উৎসবে পরিণত করো না, (তোমরা নিজ অবস্থানে থেকেই) আমার উপর দরূদ পাঠ কর; কেননা তোমরা যেখান থেকেই তা পাঠ করে থাক না কেন, তা আমার কাছে পৌঁছে।" দেখুন : আস-সিজিস্তানী, সুলায়মান ইবনে আস'আস, **সুনানে আবী দাউদ;** (...দ্বারুলফিকর : সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ২/২১৮; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাগুক্ত; ২/৩৬৭; আবুত ত্বাইয়্যিব মুহাম্মদ শামসুল হক 'আযীমাবাদী, **'আউনুল মা'বূদ শরহে সুনানি আবী দাউদ**; (বৈরুত : দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫হি:), ৬/২২।

অপর হাদীসে 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ»

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু ফেরেশতা রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ান, আমার উম্মতের মধ্যে কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করলে তারা তা আমার নিকট পৌঁছে দেন।" দেখুন : আল-বুসতী, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান, **সহীহ ইবনে হিব্বান**; সম্পাদনা : শু'আইব আরনাউত, (বৈরুত : মুআস সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), ৩/১৯৫; আন-নাসাঈ, আহমদ ইবনে শু'আইব আবু 'আব্দির রহমান, **আস-সুনান**; সম্পাদনা : ড. 'আব্দুল গাফফার সুলাইমান, (বৈরুত: দ্বারুল কুতুবিল

উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা করার কোনো বৈধতা থাকতে পারে না। কেননা, বাস্তবে তিনি যদি সর্বত্র হাজির ও নাজির হয়েই থাকবেন, তা হলে তাঁর উপর সালাত ও সালাম প্রেরণকারীর সালাত ও সালাম তাঁর নিকট ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার কোনো অর্থ থাকতে পারে না। কাজেই এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে এ জাতীয় ধারণা করার কোন বৈধতা শরী'আতে স্বীকৃত নয়। যারা কারো ব্যাপারে এ জাতীয় শির্কী ধ্যান-ধারণা পোষণ করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ ١١٦﴾ [الانعام: ١١٦]

"তারা কেবল অলীক কল্পনারই অনুসরণ করে থাকে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।"[১২৬] বস্তুত এ সব

ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১খ্রি..), ১/৩৮০; আদ-দারিমী, 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্দুর রহমান, **সুনানিদ দারিমী**; সম্পাদনা : ফাওয়ায আহমদ, (বৈরুত : দ্বারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭হি:), ৩/৪০৯; আবী শায়বাহ, আবু বকর 'আব্দুল্লাহ ইবনে, **আল-মুসান্নাফ** ; সম্পাদনা : কামাল ইউসুফ, (রিয়াদ : মাকতবাতুর রুশ্দ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯হি:), ২/২৫৩।

[126]. আল-কুরআন, সূরা আন'আম : ১১৬।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতের মিথ্যা দাবিদারদের তৈরী করা কল্পনা প্রসূত কথা বৈ আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় প্রকার : পরিচালনা বা ব্যবহারগত শির্ক

আমরা সকলেই এ কথা স্বীকার করি যে, আল্লাহ আমাদের রব, কিন্তু কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমাদের রব, সে সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা নেই। আল্লাহ তা'আলা যে সব বৈশিষ্ট্যগুণে আমাদের রব, সে সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যকার কতিপয়ের বিবরণ আমরা ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে দিয়ে এসেছি। সুতরাং এখানে পুনরায় সে সবের বর্ণনা প্রদানের প্রয়োজন নেই। এখানে যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হলো : একজন মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাঁকে তার রব বলে স্বীকার করে, তাহলে তাকে বুঝতে হবে যে, এ স্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে- আমি মহান আল্লাহকে এ জগতের সব কিছুর রব তথা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করার পাশাপাশি এ স্বীকৃতিও প্রদান করছি যে, এ জগত ও তন্মধ্যকার সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক ও পরিচালনাকারী এককভাবে তিনিই; কেননা, তিনি তাঁর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

﴿ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ﴾ [السجدة: ٥]

“তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সব বিষয় পরিচালনা করেন।”[১২৭] মানুষেরা যে সব মূর্তির নিকটে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আবেদন করে, এদের কেউই তাঁর এ জগতের অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক বা শরীক বা তা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্যকারী, এমনকি সুপারিশকারীও নয় বলে তিনি কুরআনুল কারীমের সূরা ‘সাবা’ এর ২২ ও ২৩ আয়াতে ঘোষণা দিয়েছেন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য যত সৃষ্টি রয়েছে, তিনি তাদেরকে যেমন সুষ্ঠু ও নিখুঁত বিধানের দ্বারা পরিচালনা করে থাকেন, তেমনি মানব জাতিকেও তিনি তাঁর সুষ্ঠু বিধানের দ্বারা এ পৃথিবীতে পরিচালনা করে থাকেন। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তিনি তাদেরকে একদিকে পালনের জন্য দিয়েছেন সর্বশেষ অহীর বিধান আল-কুরআন ও তাঁর রাসূলের হাদীস, অপর দিকে তাদের ভাগ্যের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবিকাঠি রেখেছেন তাঁর নিজের হাতে। আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের বিশ্বাস যথার্থ হওয়া এবং রুবূবিয়্যাতের পরিচালনাগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে শির্ক থেকে বাঁচতে হলে তাদেরকে অবশ্যই জীবনের সকল ক্ষেত্রে অহীর বিধান মানতে হবে। এর পাশাপাশি তাদের ভাগ্যের যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে উপকারী বা অপকারী ধারণা না

[127]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাজদাহ : ৫।

করে একমাত্র আল্লাহকেই তাদের যাবতীয় উপকার ও অপকারের মালিক ও পরিচালক বলে বিশ্বাস করতে হবে। অহীর বিধানের ব্যাপারে তাদের করণীয় হবে :

১ তাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত বিধানের অনুসরণ ও অনুকরণ করা। এ সব ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিধান থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের বা অন্য কারো রচিত কোনো বিধান মেনে চলা থেকে বিরত থাকবে।

২. তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পরিচালনা করবে।

৩. পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির রাজনীতির সংস্কার সাধন করে ইসলামের শূরাভিত্তিক রাজনীতির দ্বারা দেশ পরিচালনা করবে।

৪. পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে ইসলামী অর্থনীতির প্রচলন করবে।

৫. কোনো বিষয়ে আইন রচনার প্রয়োজন হলে সংসদে বসে প্রারম্ভে সে বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসে কী রয়েছে, তা খতিয়ে দেখবে। তাতে সরাসরি কোনো বিধান পাওয়া না গেলে নিজেরা সে বিষয়ে ইজতেহাদ করবে। কোনো দেশে

প্রচলিত কোনো বিধান গ্রহণ করলে তা শরী'আতের উদ্দেশ্যের (مقاصد الشريعة) সাথে সাংঘর্ষিক কি না, তা খতিয়ে দেখবে।

৬. কোনো বিষয়ে ধর্মীয় বিষেশজ্ঞদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে সে বিষয়ের ফয়সালার জন্য কারো ব্যক্তিগত মত বা কোনো মাযহাবকে প্রাধান্য না দিয়ে যার বক্তব্য কুরআন ও সহীহ হাদীসের অধিকতর নিকটে হবে, তার মতকেই অনুসরণ করবে।

৭. আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আদেশ বা নিষেধ পালন করা থেকে বিরত থাকবে।

মানুষেরা যদি উপর্যুক্ত এ কর্তব্যসমূহ পালন করে, তাহলে এতে তাদের উপর আল্লাহর রুবূবিয়্যাত প্রতিষ্ঠিত হবে; অন্যথায় যে সব ক্ষেত্রে তারা শরী'আতের বিধান লঙ্ঘন করে নিজের রচিত বা অন্যের রচিত বিধান পালন করবে, সে সব ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর পরিচালনাগত বৈশিষ্ট্যের সাথে নিজেদেরকে শরীক করে নেবে এবং পরস্পরকে রবের আসনে বসিয়ে দেবে। ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা এ জাতীয় কর্ম করেছিল বলেই কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তাদের সামালোচনা করে বলেন :

﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]

"ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের অসংখ্য ধর্মযাজকদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছিল।"[১২৮]

এ ছাড়াও অহীর বিধান বাদ দিয়ে ধর্মযাজকদের রচিত বিধান অন্ধ ভাবে পালন করে পরস্পরকে রব না বানানো প্রসঙ্গে আহলে কিতাবদের উপদেশ প্রদান করতে যেয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ﴾ [ال عمران: ٦٤]

"আর আমরা পরস্পরকে আল্লাহর পরিবর্তে অসংখ্য রব বানিয়ে না নেই।"[১২৯] মুসলিমরা যদি অনুসরণ ও অনুকরণের ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তা হলে তাদের অবস্থাও ওদের মতই হবে।

আল্লাহ তা'আলা এককভাবে মানুষের ভাগ্যের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের[130] মালিক ও পরিচালক :

---

[128]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ : ৩১।

[129]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ৬৪।

[130] অকল্যাণের বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা যায় না। অকল্যাণ মানুষের নিজের কৃতকর্মের ফলেই সংঘটিত হয়ে থাকে। যদিও তাও তাকদীরে আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখা; কিন্তু সেটাকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা নিষেধ। রাসূলের হাদীসে এসেছে,

«وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»

মহান আল্লাহ মানব জাতির জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিরও পঞ্চাশ হাজার বছর[১৩১] পূর্বে তাদের তাকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সে জন্য প্রত্যেকের তাকদীর লেখার পূর্বে তিনি দু'টি বিষয় নিশ্চিত করেছেন :

"অকল্যাণের বিষয়টি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত নয়"। মুসলিম, হাদীস নং ৭৭১। সুতরাং মুমিনের উচিত হবে, কল্যাণ হলে সেটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলে সেটার শুকরিয়া আদায় করবে, আর যদি তার কাছে কোনো অকল্যাণ এসে যায়, তবে সেটাকে নিজের কৃতকর্মের ফল, অথবা শয়তানের কারণে, অথবা পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করবে। [সম্পাদক]

131. 'আমর ইবন আল-'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«إِنَّ اللهَ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ»

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্য লিপিদ্ধ করে রেখেছেন।" **মুসলিম, প্রাগুক্ত**; কিতাবুল কদর , বাব নং ৩, ৪/২০৪৪; সুনানে আবী দাউদে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। দেখুন : আস্ সিজিস্তানী, সুলায়মান ইবন আশ্'আছ, **আস্ সুনান**; (হিমস : সিরিয়া, সংস্করণ বিতীন, তাং বিহীন), ৫/৭৬; আত-তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, **আল-জামে'উস সুনান**; (মিশর: শরিকাতু মুস্তফা আল-বাবী..., ১ম সংস্করণ, ১৯৬২খ্রি.), ৪/৪১।

এক. তাদের প্রত্যেকেই যাতে এখানে পরস্পরের মুখাপেক্ষী, সহায়ক ও পরিপূরক হয়, সে জন্য তিনি তাদের জীবিকা বন্টনের ক্ষেত্রে তারতম্য করেছেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা‘আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

﴿نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ ﴾ [الزخرف: ٣٢]

“আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি, পার্থিব জীবনে যাতে তারা একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করতে পারে, সে জন্যে তাদের একের মর্যাদাকে অন্যের উপর উন্নীত করেছি।”[১৩২]

দুই. তাদের ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাদের জীবন ও জীবিকায় নানা ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥ ﴾ [البقرة: ١٥٥]

---

[132]. আল-কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ :৩২।

“আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন ও ফসল নষ্ট করে পরীক্ষা করবো, আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দান করো।”[১৩৩]

এ দু’টি বিষয় নিশ্চিত করে তিনি মানুষের তাকদীর পরিচালনার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সে পরিকল্পনাই এখন সকলের ভাগ্যে ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। শরী‘আতের নির্দেশ হচ্ছে- জীবন চলার পথে প্রত্যেকের নসীবে ভাল বা মন্দ যা-ই হাজির হবে, সেটিকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে; কেননা তা মেনে নেয়া ব্যতীত কেউই সঠিক মু’মিন হতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ : يَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ بَعَثَنِيْ بِالْحَقّ، وَ يُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ»

“চারটি বিষয়ে ঈমান না আনা পর্যন্ত কোনো বান্দাই মু’মিন হতে পারবে না: এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সঠিক ইলাহ নেই, আরো সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল, আমাকে তিনি সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী

---

133. সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৫৫।

পুনরুজ্জীবনের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করবে।”[১৩৪]

তাকদীরের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে মু'মিনদের কর্তব্য হচ্ছে :

1. যার কাছে ভাল-মন্দ যা-ই আসে তাকে তা হাসি মুখে বরণ করে নিতে হবে। জীবন চলার পথে কখনও কোনো অমঙ্গলের শিকার হলে কোনো প্রকার বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
2. অসুস্থ জীবন আর মন্দ জীবিকা পেয়ে থাকলে আপাতত ধৈর্যের সাথে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থেকে বৈধ উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পরবর্তী সুস্থ জীবন ও উত্তম জীবিকা লাভের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে।
3. কোনো পীর, ফকীর বা কোনো অলি অলৌকিকভাবে কোনো ভাল চাকুরী, ব্যবসায়ে উন্নতি, অসুখ থেকে মুক্তি, সন্তান দান ও নির্বাচনে জয়ী ...ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম মনে করে তাদের মাযারে না গিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত করণীয় নিজেই বা অপর কোনো জীবিত মানুষের স্বাভাবিক সহযোগিতার মাধ্যমে করে নিয়ে কর্মের

---

[134]. ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ১/৯৭।

ফলাফল প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করতে হবে এবং তাঁরই উপর পূর্ণ ভরসা করতে হবে।

4. একমাত্র আল্লাহকেই সুস্থতা ও অসুস্থতা দানের মালিক মনে করে, সুস্থতা লাভের জন্য কোনো পীর, ফকীর বা মাযারের অলির নিকট আবেদন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কোনো মাযারের মাটি ও পুড়ানো মোম, মাযারস্থ পুকুর কিংবা কূপের পানি, মাছ, কুমির ও কচ্ছপ এবং মাযার সংলগ্ন গাছের শিকড়, পাতা ও ফল বা মাযারে রক্ষিত পাথর ইত্যাদিকে যে কোনো রোগের জন্য উপকারী মহৌষধ মনে না করে জনসমাজে পরিচিত সাধারণ কোনো ঔষধি গাছ অথবা কোনো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সাধ্যমত ঔষধ সেবন করে রোগ নিরাময়ের জন্য কেবল আল্লাহর কাছেই তাঁর রহমত কামনা করতে হবে। রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধের উপর ভরসা না করে কেবল আল্লাহর উপরেই ভরসা করতে হবে।

5. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সন্তান প্রজনন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কারো সন্তান না হলে কোনো পীর, ফকীর কিংবা কোনো অলিকে অলৌকিকভাবে সন্তানের ব্যবস্থা করে দিতে সক্ষম মনে করে তাদের দরবারে না গিয়ে ধৈর্যের সাথে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই সন্তান লাভের জন্য কেবল আল্লাহর

নিকটেই চাইতে হবে; কেননা সন্তান দানের একচ্ছত্র মালিক হলেন তিনিই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

﴿ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۝٤٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًاۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝٥٠ ﴾ [الشورا: ٤٩، ٥٠]

"সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর, তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন, অথবা তাদেরকে পুত্র কন্যা উভয়ই দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধা করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।"[১৩৫] সন্তান দানের মালিক যখন তিনিই, তখন তিনি যাকে তা বিলম্বে দানের ইচ্ছা করেছেন তাকে কেউ তা আগে এনে দিতে পারবে না। আর যাকে তিনি না দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তাকে কেউ তা দেয়ারও ব্যবস্থা করতে পারবে না।

ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষায় মু'মিনের করণীয় :

মানুষের তাকদীর সম্পর্কে আল্লাহ যখন তাদের পরস্পরকে পরস্পরের পরিপূরক হওয়া এবং তাদের ঈমানী শক্তি ও ধৈর্যের পরীক্ষা করার এ দু'টি বিষয়কে নিশ্চিত করেছেন, তখন প্রতিটি মু'মিনের করণীয় হবে- ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষায় মহান আল্লাহর

---

[135]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শুরা : ৪৯-৫০।

উপর অবিচল আস্থা নিয়ে ঈমানের উপর মজবুতভাবে টিকে থেকে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করা। অন্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহর কাছে তাদের অবস্থার পরিবর্তন মঞ্জুর হয়ে থাকলে বিলম্বে হলেও তাদের অবস্থা সুপ্রসন্ন হবেই। হলে তো আলহামদুলিল্লাহ, আর না হলে তারা মনে করবে যে, তাদের এ অবস্থার মধ্যেই হয়তোবা আল্লাহর দীর্ঘ মেয়াদী কোনো পরীক্ষা রয়েছে, নতুবা এ বাহ্যিক অমঙ্গলের মধ্যেই তাদের জন্য কোনো মঙ্গল নিহিত রয়েছে; কেননা সম্পূর্ণ অমঙ্গল হবে এমন কোনো কাজ করা থেকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই অবস্থার উন্নতি না হলেও তাদেরকে আলহামদু লিল্লাহই বলতে হবে।

যারা ধৈর্য ধারণ না করে অবৈধ পন্থায় তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে যাবে, মনে করতে হবে যে, **তারা ধৈর্যের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। তাদের তাকদীরে আল্লাহ তা'আলার যে ফয়সালা ছিল, তাতে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তারা অবৈধ পন্থায় তাদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করে আল্লাহর পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়ে অসময়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে চেয়েছে। কারো অবস্থা পরিবর্তন করার যাদের আদৌ কোনো যোগ্যতা নেই, যারা কারো মঙ্গল ও অমঙ্গলের মালিক নয় তাদেরকে তারা সব কিছুর যোগ্য ও মালিক বানিয়ে নিয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর পরিচালনা কর্মে তাঁর পূর্ব অনুমতি ছাড়াই**

শাফা'আত ও হস্তক্ষেপ করার যোগ্য বলে মনে করেছে। আরবের মুশরিকরা তাদের দেবতাদের ব্যাপারে এ ধরনের ধারণা পোষণ করেই তাদের কাছে সাহায্যের জন্য আবদার করতো।[১৩৬] তবে যেহেতু আল্লাহর পরিচালনা কর্মে এ ধরনের কোনো সাহায্যকারী ও শাফা'আত বা মধ্যস্থতাকারীদের কোনো অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়, সে-জন্য মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে এ-মর্মে ঘোষণা দিতে বলেন :

﴿ قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ﴾ [سبا: ٢٢، ٢٣]

"আপনি বলুন, মহান আল্লাহকে ব্যতীত যাদেরকে তোমরা তোমাদের ধারণায় রব বানিয়ে নিয়েছ তাদেরকে আহ্বান কর, তারাতো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, তাতে তাদের কোন শরীকানাও নেই, তাদের মধ্যকার কেউ আল্লাহর পরিচালনা কর্মে সাহায্যকারীও নয়, তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট কারো জন্যে কারো শাফা'আতও উপকারী হয় না।"[১৩৭]

---

136. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, **আল-ফাউযুল কাবীর**; (দেওবন্দ : এমদাদিয়া কুতুবখানা, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃ.৫।

137. আল-কুরআন, সূরা সাবা : ২২, ২৩।

মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুশরিকদের ইলাহদের যাবতীয় ক্ষমতাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে এ ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তিনি যে পরিকল্পনানুযায়ী এ জগতের সব কিছু পরিচালনা করছেন, তাতে অনধিকার চর্চা করার মত এ জগতে কেউ নেই। এ অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরম্ভ করে তাঁর উম্মতের মধ্যকার সকল আউলিয়া ও দরবেশগণের উপর্যুক্ত ধরনের শাফা'আতকেও অস্বীকার করা হয়েছে; কেননা, আরবের মুশরিকদের দেবতাদের শাফা'আত আর আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও অলিগণের উপর্যুক্ত ধরনের শাফা'আতের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, মুশরিকরা উপর্যুক্ত ধারণার পাশাপাশি অলি ও ফেরেশ্তাদের নামে তৈরী করা মূর্তি ও প্রতিমার নিকট তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য শাফা'আত কামনা করতো। আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা আউলিয়াদের ব্যাপারে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে, তারা তাঁদের মূর্তি না বানিয়ে এমনিতেই তাঁদের নিকট তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য শাফা'আত কামনা করছেন। মুশরিকরা যে অতীতের কোনো কোনো সৎ মানুষদের ব্যাপারে উক্ত ধারণা করে তাঁদের নামে মূর্তি তৈরী করেছিল এর প্রমাণে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٩٤ ﴾ [الاعراف: ١٩٤]

"আল্লাহকে ব্যতীত তোমরা যাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে থাকো তারাতো তোমাদের মতই বান্দা (তথা ফেরেশ্তা, জিন ও মানুষ)। অতএব তাঁরা তোমাদের আহ্বান শ্রবণ করেন বলে তোমরা তাঁদের ব্যপারে যে ধারণা পোষণ করে থাকো সে অনুযায়ী তাদেরকে আহ্বান কর, তারাও যেন তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেয়, যদি তোমরা (তোমাদের ধারণায়) সত্যবাদী হও।"[১৩৮]

এ আয়াত দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয় :

এক. মুশরিকরা যে সকল মূর্তির কাছে শাফা'আত কামনা করতো সেগুলোর কোনো কোনোটি অতীতের কোনো না কোনো সৎমানুষের নামে নির্মিত মূর্তি ছিল। যেমন- কুরআনে বর্ণিত ওয়াদ্দ, সুআ', ইয়াগূছ, য়া'উক ও নছর নামের সৎ মানুষদের মূর্তিসমূহ আরবের বিভিন্ন গোত্রে দেবতা হিসেবে গৃহীত ছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ সহ ইন-শাআল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আরো আলোচনা করবো।

দুই. মুশরিকরা মনে করতো এ সব সৎমানুষদেরকে আহ্বান করলে তাঁরা শুনতে পারেন এবং আহ্বানে সাড়াও দিতে পারেন।

---

[138]. সূরা আল-আ'রাফ : ১৯৪।

তাদের এ ধারণার অবাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য আখেরাতে আল্লাহ উপাস্য ও উপাসক উভয়কেই হাজির করে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে প্রমাণ করিয়ে দেবেন।

কোনো মানুষ বা কোনো বস্তুকে সরাসরি উপকারী বা অপকারী বলা শির্কঃ

মানুষের তাকদীরে যাবতীয় কল্যাণ আর অকল্যাণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত, তখন কোনো মানুষ বা অপর কোনো বস্তুর সহযোগিতায় তা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে সে মানুষ বা সে বস্তুকে সরাসরি উপকারী বা অপকারী বলা শর'য়ী দৃষ্টিতে স্বীকৃত নয়। কেননা, কোনো মানুষ বা কোনো বস্তু নিজ থেকে কারো কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না। মানুষ বা কোনো বস্তুর মাধ্যমে মানুষের সে কল্যাণই অর্জিত হতে পারে যা আল্লাহই সে বস্তু বা সে মানুষের মাধ্যমে কাউকে দেয়ার ইচ্ছা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بَشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوْاجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَه اللهُ عَلَيْكَ رُفِعتِ الْأَقْلاَمُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ»

“জেনে রাখো! সমগ্র জাতির লোকেরা যদি তোমার কোনো কল্যাণ করার জন্য সমবেত হয়, তবে তারা তোমার সে কল্যাণই করতে পারবে যার কথা আল্লাহ তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন, তারা যদি তোমার কোনো অকল্যাণ করার জন্য সমবেত হয়, তবে তারা তোমার সে অকল্যাণই করতে পারবে যা আল্লাহ তোমার উপর লিখে রেখেছেন। তাকদীর লিখার পর কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, আর কাগজ শুকিয়ে গেছে।”[১৩৯]

এ হাদীসটি আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলাই এককভাবে আমাদের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ দানের মালিক। তিনি প্রজ্ঞা ও ইনসাফের ভিত্তিতে আমাদের তাকদীর পরিচালনা করে থাকেন। আমরা কর্ম ও দু‘আ করে কেবল সে কল্যাণই অর্জন করতে পারবো যা তিনি বিজ্ঞতার সাথে আমাদের জন্যে মঞ্জুর করে রেখেছেন। তাঁর মঞ্জুরীর বাইরে আমরা কোনো কল্যাণই অর্জন কিংবা কোনো অকল্যাণই দূর করতে পারবো না। অতএব, আল্লাহর পরিচালনাগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে শির্ক করা থেকে বাঁচতে হলে আমাদের করণীয় হবে :

1. কেবলমাত্র আল্লাহকেই যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক বলে মনে করতে হবে।

---

[139]. তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, বাব : নং ৫৯, ৪/৬৬৭।

2. যাবতীয় কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য সাধ্যানুযায়ী কর্ম করে তাঁরই নিকট তা প্রাপ্তির জন্য চাইতে হবে এবং তাঁরই উপর ভরসা করতে হবে।

3. সকল কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের কৃতিত্ব নিজের কর্মকে বা অপর কাউকে বা অপর কোনো বস্তুকে না দিয়ে কেবল আল্লাহকেই দান করতে হবে।

4. যে সব ক্ষেত্রে কারো পক্ষে কারো কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণে কোনো প্রকার সাহায্য করার সাধ্য নেই, সে সব ক্ষেত্রে তিনি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য কামনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

5. বিপদে পড়লে তিনি ব্যতীত কোনো অলি ও দরবেশকে স্মরণ না করে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য কেবল তাঁকেই স্মরণ করে কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করতে হবে।

6. বিপদ মুক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অলিগণের নাম ও তাঁদের মর্যাদার ওসীলা না ধরে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর উত্তম নামাবলী, নিজের অপরাধের স্বীকৃতি, বিপদের প্রাক্কালে নিজের অপারগতা ও অসহায়তার কথা বলে, নিজের সৎকর্ম, বিশেষ করে সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে অথবা কোনো সৎ জীবিত মানুষের দু'আর ওসীলা গ্রহণ করে দু'আ করতে হবে।

এখানে স্মর্তব্য যে, যারাই উপর্যুক্ত করণীয় বিষয়ে ব্যতিক্রম করবে নিঃসন্দেহে তারা পরিচালনাগত শির্কের শিকারে পরিণত হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, কারো ভাগ্যে বিপদ লিখা থাকলে আল্লাহর ইচ্ছা না হলে হাজারো চেষ্টা করেও সে তা দূর করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁর সাহাবীদের জীবনে নানাবিধ বিপদ এসেছে, তাঁর পক্ষেও সে সব দূর করা সম্ভব হয় নি, আল্লাহ তা'আলা নিজেও রাসূলের মর্যাদার দিক বিবেচনা করে তাঁর বিপদ দূর করে দেন নি। তাই যার উপর যে বিপদ আসার চুড়ান্ত ফয়সালা হয়ে রয়েছে, তার উপর তা আসবেই, তা কোনোভাবেই দূর করা যাবে না। আল্লাহর ইচ্ছার সামনে আমাদের সকল ইচ্ছা ম্লান হয়ে যেতে বাধ্য। আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যথেষ্ট মান ও মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তিনি যখন তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের বিপদ দূর করতে পারেন নি; তখন এ জগতে আর কে এ ধরনের যোগ্যতার অধিকারী থাকতে পারে? তিনি যেমন তাঁর মর্যাদার ওসীলায় তাঁর সাহাবীদের পার্থিব বিপদ দূর করতে পারেন নি, তেমনি তিনি আখেরাতেও তাঁর মর্যাদার ওসীলায় কারো পরকালীন বিপদ দূর করতে পারবেন না। তাঁর আত্মীয় স্বজনরা যাতে এ ধরনের কোনো সুযোগের আশায় থেকে আখেরাতে বিপদে না পড়ে, সে-জন্য তিনি তাঁর আদরের মেয়ে

ফাতিমাসহ অন্যান্য সকল নিকটাত্মীয়দের ডেকে ডেকে সুস্পষ্ট ভাষায় তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

«لَمَّا نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ) دَعَا النَّبِيُّ قُرْبَتَهً فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ : يَا بَنِيْ كَعْبَ بْنَ لُؤَيْ ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا أَوْ قَالَ : فَإِنِّيْ لاَ أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَ يَا بَنِيْ هَاشِمْ ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّار فَإِنِّيْ لاَ أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّار فَإِنِّيْ لاَ أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَ يَا فَاطِمَةُ ! انْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ فَإِنِّيْ لاَ أُغْنِي مِنَ اللهِ شَيْئًا»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যখন (তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে সাধারণ ও বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করেন। বনী কা'ব ইবন লুআইদের ডেকে বলেন : ওহে বনী কা'ব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর; কারণ, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবো না। ওহে বনী হাশিম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও; কেননা আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবো না। ওহে বনী মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও; কেননা

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবো না। হে ফাতিমা! তুমি তোমার নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে উদ্ধার কর, আমার অর্থ সম্পদ থেকে যা খুশী চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোনো উপকার করতে পারবো না।”[১৪০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের দুনিয়া-আখেরাতের বিপদ দূরীকরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে তাঁর উম্মতের মাঝে তাঁর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান এমন কে থাকতে পারে, যিনি তাঁর মর্যাদা ব্যবহার করে এমন সব কাজ করতে পারবেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে সম্ভব নয়?

আল্লাহ ব্যতীত মানুষের অপর কোনো আশ্রয়স্থল নেই :

যখন কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, এমনকি সে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যখন স্বয়ং আল্লাহর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও হতে পারেন না, তখন সবাইকে বুঝতে হবে যে,

---

[140]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল-ওয়াসা-য়া, বাব : ১১, হাদীস নং ২৬০৬; ৩/১০১২; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুর ঈমান, বাব নং ৮৯, হাদীস নং ২০৪, ১/১৯২ ; আবু ঈসা= আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুত তাফসীর, বাব : ২৭, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জাতির জনগণকে সতর্ক করা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে), ৫/৩৩৮।

আল্লাহ ব্যতীত মানুষের কল্যাণ লাভের এবং অকল্যাণ দূরীকরণের অপর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

﴿ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝٢١ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ۝٢٢ ﴾ [الجن: ٢١، ٢٢]

"বলুন: আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করার এবং তোমাদেরকে সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আমার অবস্থা এমন যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে আমাকে রক্ষা করার মত কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত আমি অপর কোনো আশ্রয় স্থলও পাব না।"[১৪১]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে এ ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে এ কথা বুঝাতে চাইলেন যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হলেন সকল লাভ-ক্ষতি, কল্যাণ ও অকল্যাণের একচ্ছত্র মালিক। কোনো কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য প্রার্থনা ও আবেদন করার স্থান একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কোথাও নেই। সুতরাং অবস্থার যে কোনো পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে কেবল তাঁরই শরণাপন্ন হতে হবে। কারো কোনো অলৌকিক মাধ্যমের চিন্তা ভাবনা পরিহার করে সরাসরি কেবল তাঁর নিকটেই তা চাইতে হবে; কেননা, তিনি

---

[141]. আল-কুরআন, সূরা আল-জিন : ২১।

একাই বান্দাদের যাবতীয় অভাব ও অভিযোগ শ্রবণ করার এবং তা পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মানুষেরা এরপরও তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্যের কাছে তাদের অভাব ও অভিযোগের কথা তুলে ধরে, তাঁর কাছে তাদের অভাবের কথা সরাসরি না জানিয়ে অন্যের মাধ্যম গ্রহণ করে। বান্দাদের এ হেন কর্মে তিনি প্রশ্ন করে বলেন :

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥۖ ﴾ [الزمر: ٣٦]

"আল্লাহ কি তা হলে তাঁর বান্দার (যাবতীয় অভাব ও অভিযোগ শ্রবণ করার) জন্য যথেষ্ট নন?"[১৪২]

হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যাবতীয় অভাব ও অভিযোগ শুনার ও তা পূরণের জন্য যথেষ্ট। তাই তাদের উচিত কেবল তাঁরই নিকট সরাসরি তাদের যাবতীয় অভাবের কথা তুলে ধরা, তাঁরই নিকট যাবতীয় সাহায্য কামনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়ার জন্যই ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেন :

«إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ»

"যখন কোনো সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।"[১৪৩]

---

[142].আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৩৬।

তৃতীয় প্রকার : উপাসনাগত শির্ক (الشرك في العبادات)

মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক। মানুষের জীবনের প্রতি অপর মানুষ এবং চন্দ্র, সূর্য, আগুন, পানি, পাথর, বৃক্ষ, পশু ও পাখি ইত্যাদির যতবড় অবদানই থাকুক না কেন- এরা সবাই মানুষের মতই আল্লাহর সৃষ্টি। কোন সৃষ্টি যখন মানুষের স্রষ্টা নয় তখন মানুষের প্রতি সৃষ্টির অবদান বা উপকার যা-ই থাকুক না কেন, কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সমান হতে পারে না। কেননা, মানুষের জীবনের প্রতি আল্লাহ তা'আলার যে অবদান রয়েছে এর সাথে অপর কারো অবদানের কোনো তুলনা হতে পারে না। মানুষের প্রতি আল্লাহর অবদানের দাবী হচ্ছে, তারা কারো উপাসনা করলে কেবল তাঁরই উপাসনা করবে। অন্য কারো নয়। তিনি তাদের সৃষ্টি করার ফলে তাদের উপর তাঁর যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো: তারা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«حَقُّ اللهِ عَلَى الْعبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلاَيُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا»

---

143. আবু ঈসা আত্ তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল কিয়ামাহ, বাব : নং ৫৯, ৪/৬৬৭; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ১/২৯৩।

“বান্দাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার অধিকার হলো তারা যেন কেবল আল্লাহরই উপাসনা করে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক না করে।”[১৪৪] যারা আল্লাহর এ অধিকারে অপর কাউকে শরীক করে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা সৃষ্টি আর স্রষ্টাকে এক করে নিল। সে জন্য তিনি তাদের এ হীনতম কর্মের সমালোচনা করে বলেছেন,

﴿ أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٧ ﴾ [النحل: ١٧]

“তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তাদের মতই হয়ে গেলেন যারা সৃষ্টি করে না, এর পরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?”[১৪৫]

আল্লাহ যখন মানুষের উপাসনা প্রাপ্তিকেই তাঁর কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যম হিসেবে সাব্যস্ত করে নিয়েছেন, তখন উপাসনার মাধ্যমে অপর কোন সৃষ্টির কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। আল্লাহ মানুষের উপর তাদের উপাসনা পাবার অধিকার সংরক্ষণ করেন বলেই তিনি তাদের প্রতি তাঁর

---

[144].এ হাদীসটি মা‘আজ ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। দেখুন : মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৯।

[145]. আল-কুরআন, সূরা নাহাল : ২১।

অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এককভাবে তাঁরই উপাসনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١ ﴾ [البقرة: ٢١]

"হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের সেই রবের উপাসনা কর যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, আশা করা যায় এতে তোমরা পরহেজগার হতে পারবে।"[১৪৬] আবার তাঁর উপাসনার ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করে বলেছেন,

﴿ ۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ ﴾ [النساء: ٣٦]

"তোমরা এককভাবে আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।"[১৪৭]

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করার অর্থ হচ্ছে- তাঁর রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যসমূহে কাউকে শরীক না করা এবং কোনো মানুষ বা অন্য কোন বস্তুর অবদান ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তাকে মর্যাদা ও সম্মান দিতে গিয়ে এমন কোন কাজ না করা, যা সে মানুষ বা সে বস্তুকে উপাস্যে পরিণত করে।

---

[146]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ২১।

[147]. আল-কুরআন, সূরা নিসা : ৩৬।

আল্লাহর উপাসনার মাধ্যম :

মানুষ যাতে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতে কাউকে শরীক না করে, সে জন্য তিনি মানুষের তাঁর উপাসনাদিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন,

এক. বাহ্যিক উপাসনাদি যা তাঁর উলূহিয়্যাতের ক্ষেত্রে শির্ক না করার জন্য মানুষের শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ফরয করে দিয়েছেন।

দুই. গোপন উপাসনাদি, যা তাঁর রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শির্ক না করার জন্য মানুষের শরীরের গোপন অঙ্গ অন্তরের উপর ফরয করেছেন।

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ফরযকৃত উপাসনাদি :

শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ফরযকৃত উপাসনাদির মধ্যে এমন কিছু উপাসনা রয়েছে যা বিশেষ করে মুখ ও জিহবার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন- আনন্দ বা খুশীর সংবাদ শ্রবণ করলে মুখ দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা। বিপদের কথা শুনলে... 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করা। সর্বদা মুখে আল্লাহর যিকর ও তাঁর নিকট ইস্তেগফার করা, বিপদে ও ভাল অবস্থায় তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করা, মানব ও জিনের

যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মুখ দিয়ে তাঁরই নিকট আশ্রয় কামনা করা ইত্যাদি।

এ সকল উপাসনাসমূহ মুখের উপর নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে। মানুষের মুখে তাদের সুখ ও দুঃখে, আনন্দ ও বিষাদে এবং ভাল ও মন্দ সর্বাবস্থায় যেন কেবল আল্লাহ তা'আলার স্মরণই চলতে থাকে। তাঁর কাছেই যেন তারা তাদের অপরাধের জন্য মার্জনা চায়, বিপদে পতিত হলে যেন কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চায়, তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করতে যেন তাঁর উত্তম নামাবলীর মাধ্যমেই তাঁকে আহ্বান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অপর কোনো অলির নামের মাধ্যমে যেন তাঁকে আহ্বান না করে। কেউ যদি তা না করে বিপদের সময় বা স্বাভাবিক অবস্থায় মুখে, ইয়া গাউছ অথবা ইয়া খাজা বলে 'আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.) বা মঈনুদ্দিন চিশ্তী (রহ.)-কে স্মরণ করে, তাঁদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে, তা হলে সে ব্যক্তি তার মুখের উপাসনায় তাঁদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নেবে।

দু'আর প্রকার (أنواع الدعاء)

দু'আ বা আহ্বান দু'প্রকার :

এক. কিছু চাওয়ার দু'আ (دعاء مسألة) **:** যে সব বস্তু জীবিত মানুষদের স্বাভাবিক শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে, ইচ্ছা করলে

তারা তা অপরকে দিতে পারে, বা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, এমন বস্তু কোনো মানুষের কাছে চাওয়া যেতে পারে। তবে যা দান করা বা দানের ক্ষেত্রে সাহায্য করা মানুষের সাধ্যের বাইরে, তা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। এ জাতীয় বস্তু আল্লাহর কাছে চাওয়াকেই 'দু'আ-উ মাসআলা' বা 'যাচঞা জাতীয় প্রার্থনা' বলা হয়।

দুই. দু'আ-উ ইবাদাত : অপারগতা, দুর্বলতা ও বিনয় প্রকাশের জন্য যে দু'আ করা হয়, তাকে দু'আয়ে ইবাদাত বলা হয়।

দু'আ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত :

উপর্যুক্ত উভয় প্রকার দু'আ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মানুষের নিকট চাওয়া যায় না। কেননা, তা আল্লাহর ইবাদাত-উপাসনার অন্তর্গত বিষয়। সে জন্য তিনি তা কেবল তাঁর কাছেই চাওয়ার নির্দেশ করে বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ﴾ [غافر: ٦٠]

"আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন: তোমরা আমাকে আহ্বান কর, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব।"[১৪৮]

---

148. আল-কুরআন, সূরা মু'মিন : ৬০।

আবার দু‘আ যে বিনয়ের সাথে করতে হবে, সে সম্পর্কে বলেছেন,

﴿ ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ۝٥٥ ﴾ [الاعراف: ٥٥]

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয় ও চুপিসারে আহ্বান কর, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না"।[১৪৯]

উক্ত আয়াত দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের জীবনের যে সব কল্যাণ দান বা অকল্যাণ দূরীকরণ কোনো মানুষ করতে পারে না তা বিনয়ের সাথে কেবল আল্লাহ তা‘আলার নিকটেই চাইতে হবে। এ জন্য কর্মের প্রয়োজন হলে কর্মের তৌফিকও তাঁর নিকটেই কামনা করতে হবে। তা না করে আমরা যদি জীবিত বা মৃত কোনো পীর বা অলির নিকটে তা কামনা করি, অথবা মৃত কোনো অলিকে এ জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে বলি, তা হলে এতে আল্লাহর রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতে শির্ক হবে। রুবূবিয়্যাতে শির্ক হবে এ জন্যে যে, আমরা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের আওতাধীন বিষয়কে তাঁদের নিকটে আছে বলে বিশ্বাস করছি। আর উলূহিয়্যাতে শির্ক হবে এ জন্যে যে, আমরা

---

[149].আল-কুরআন, সূরা আ‘রাফ : ৫৫।

শুধু আল্লাহ তা'আলাকে আহ্বান করার স্থানে অন্যকে আহ্বান করছি।

যারা আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত অপর কাউকে আহ্বান করে, অপরের নিকট অনুশোচনা ও বিনয় প্রকাশ করে, তারা আল্লাহকে ব্যতীত অপরকেই তাদের ইলাহ বানিয়ে নেয়। এমন লোকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ١١٧ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]

"যে আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহকে আহ্বান করে যে আহ্বানের বৈধতার পিছনে তার নিকট কোন দলীল প্রমাণ নেই, তার এ-আহ্বানের হিসাব রয়েছে তার প্রতিপালকের নিকট, বস্তুত কাফিরগণ কোন অবস্থাতেই কৃতকার্য হতে পারে না।"[১৫০]

শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপাসনা

মুখের উপাসনা ছাড়াও আরো এমন কিছু উপাসনা রয়েছে যার সম্পর্ক রয়েছে পূর্ণ শরীরের সাথে। যেমন :

দাঁড়িয়ে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করা :

আল্লাহর সম্মুখে বিনয় ও তাঁর আনুগত্য প্রকাশের জন্য তিনি মানুষের শরীরের উপর যে সব উপাসনা ধার্য করে দিয়েছেন

---

[150]. আল-কুরআন, সূরা গাফির : ৪০।

তন্মধ্যে অন্যমত একটি উপাসনা হচ্ছে- দাঁড়িয়ে বা প্রয়োজনে বসে সালাত কায়েম করা। এ সালাত সঠিক এবং আল্লাহর নিকট তা গৃহীত হওয়ার জন্য রয়েছে তিনটি পূর্বশর্ত :

এক. আল্লাহর একান্ত ভালোবাসার আকর্ষণেই তা কায়েম করতে হবে।

দুই. অত্যন্ত আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে তা সম্পাদিত হতে হবে।

তিন. আল্লাহর আনুগত্য তাঁর সম্মুখে বিনয় প্রকাশ ও তাঁর উলূহিয়্যাতের স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যেই তা কায়েম করতে হবে।

যার সালাতে এ তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে না, তার সালাত বাহ্যিক দৃষ্টিতে সালাত হিসেবে গণ্য হলেও তা আল্লাহর নিকটে গ্রাহ্য হবে না।

কেউ কাউকে অন্তর দ্বারা ভালবাসতে পারে, মনের মানুষের আগমনের সংবাদ শুনলে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্যে ব্যতিব্যস্তও হতে পারে, কিন্তু তাকে ভালোবাসার আতিশয্যে তার সামনে দাঁড়িয়ে এমন কোনো বিনয়ভাব প্রকাশ বা এমন কোনো কর্ম করা যাবে না, যা বাহ্যত তার উপাসনার শামিল হয়। কেননা, এ ধরনের বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ আল্লাহ্ তা'আলার জন্যেই

নির্ধারিত। সেজন্য মহান আল্লাহ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ করে বলেছেন,

﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

"তোমরা আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও।"[১৫১]

আল্লাহর সামনে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশকে শির্ক মুক্ত রাখার জন্য তিনি তা এমন স্থানে প্রদর্শন করতে নির্দেশ করেছেন যেখানে শির্ক সংঘটিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে কোনো কবরমুখী হয়ে বা কবরের সন্নিকটে সালাত আদায় করতেও নিষেধ করেছেন; কেননা, এতে আল্লাহর প্রতি বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশের পাশাপাশি কবরবাসী নবী বা অলিরও বিনয় এবং আনুগত্য প্রকাশিত হতে পারে। যেহেতু দাঁড়িয়ে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ আল্লাহর উপাসনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারিত, সেহেতু কোনো পীর-মাশায়েখ, বা কোনো অলি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সামনে বা তাদের ছবি, প্রতিকৃতি, কবর, ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধের পার্শ্বে তাঁদের সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নীরবে দাঁড়ানো যাবে না; কেননা, এতে আল্লাহ তা'আলার সামনে

---

[151]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ২৩৮।

বিনয় প্রকাশের পদ্ধতিতে তাঁদের সামনে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশিত হয়।

সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রুকূ‘ ও সেজদা করা :

আল্লাহর মহববত তাঁর সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশার্থে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত কায়েম করা যেমন আল্লাহর উপাসনা, তেমনি একই উদ্দেশ্যে আল্লাহর সামনে নত হয়ে রুকু‘ ও সেজদা করাও তাঁর উপাসনা। সে জন্য তিনি এর নির্দেশ করে বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ﴾ [الحج: ٧٧]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে রুকু‘, সেজদা ও ইবাদত কর।"[১৫২]

আল্লাহর সামনে রুকু‘ ও সেজদা করা তাঁর উপাসনা হওয়ার কারণে কোনো পীর, মাশায়েখ ও অলির সম্মানার্থে তাদের সামনে বা কবরে রুকু‘ ও সেজদা করা তাদের উপাসনার শামিল।

কারো সম্মানার্থে মাথা নত ও কদমবুসী করা :

কাউকে অভিবাদন জ্ঞাপন করার জন্য মাথা নত করা এবং মাতা-পিতা, অলি ও দরবেশদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য কদমবুসী করা যদিও শির্কের পর্যায়ভুক্ত নয়, তথাপি তা করা ইসলামের

---

[152]. আল-কুরআন, সূরা হজ্জ : ৭৭।

অনুসৃত রীতিরও অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা মুসলিম সমাজে প্রচলিত পশ্চিমা ও হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কাজেই তা বর্জনীয়।[১৫৩]

সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেজদা করা (السجدة للتعظيم) **:**

সেজদার মাধ্যমে কাউকে সম্মান প্রদর্শন করা অতীতের শরী'আতে বৈধ ছিল[154]। ফেরেশতাদের কর্তৃক আদম আলাইহিস

---

[153].রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্বা-ইফ থেকে ফেরার পথে তাঁর শত্রু উতবাহ ও শায়বাহ এর একটি আংগুরের বাগানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সে সময় তাদের দাস আদ্দাস নামের জনৈক খ্রির্র্র্র্ষ্টান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ে চুম্বন করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখুন : আল-মুবারক পূরী, পৃ. ১২৬।

অনুরূপভাবে অপর একজন গ্রাম্য সাহাবী দ্বারাও এ ধরনের কদমবুসী করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অভিবাদন, সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য তাঁর কোন অনুমোদিত পন্থা ছিল না। এ জন্য তাঁর অন্যান্য সাহাবীগণ এভাবে কোন দিন তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন করেন নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কদমবুসীর বৈধতার ব্যাপারে যে দু'একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় তা একেকটি ঘটনা বিশেষ, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথেই সীমাবদ্ধ, এর দ্বারা কোন অবস্থাতেই কদমবুসী বা পা চুম্বনের অনুমোদন প্রমাণিত হয়না।- লেখক

[154] কিন্তু সেই সেজদার আকার–আকৃতি, ধরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আসলেই কি তা মাথা মাটিতে রেখে করা হতো কি না তা জানার কোনো উপায় নেই। কারণ; সেজদা শব্দটি সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশের

সালাম-কে এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইদের কর্তৃক তাঁকে সেজদা করা এ সম্মান প্রদর্শনেরই অন্তর্গত। তবে কোনো সৃষ্টিকে এ ধরনের সম্মান প্রদর্শনের রীতি সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তিত শরী'আত দ্বারা সম্পূর্ণভাবে রহিত হয়ে গেছে এবং সর্বশেষ শরী'আতে তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। শর'য়ী নিয়ম মতে জ্ঞানী, গুণী ও সৎ মানুষদের সম্মান প্রদর্শনের পথ হচ্ছে- তাঁদের আগমনের সংবাদ শুনলে আমরা আনন্দের সাথে এগিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাবো, অতিথি হিসেবে তাঁদের একরাম করবো, তাঁদের সাথে সালাম, মুসাফাহা ও আলিঙ্গন করবো, তাঁদেরকে আদর ও আপ্যায়ন করবো, তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেব, তাঁদের উপদেশ গ্রহণ করবো, বিদায়ের সময় তাঁদেরকে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে সম্মানের সাথে বিদায় করে দেব।

সম্মানের জন্য কাউকে সেজদা করা যদি বৈধ হতো তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের সাহাবীদেরকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করতেন যে, তোমরা নবীকে সেজদা করার মাধ্যমে তাঁর

অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং সেটা অনেকটা অস্পষ্ট বা মুতাশাবিহ। সেটার উপর ভিত্তি করে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বাণী বা মুহকামের আমল বাদ দেয়া যাবে না। সুতরাং কোনোভাবেই আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও জন্য সেজদা করাকে অনুমতিপ্রাপ্ত মনে করতে পারি না। [সম্পাদক]

সম্মান প্রদর্শন করো; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের সাহাবীদেরকে এমন কোনো নির্দেশ না দিয়ে মানুষকে সম্মান প্রদর্শনের যে পদ্ধতির কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তাঁকে সেভাবেই সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ۝٨ لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ۝٩﴾ [الفتح: ٨، ٩]

"আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী স্বরূপ প্রেরণ করেছি; যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে (রাসূলকে) সম্মান ও মর্যাদা দান কর, আর সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর।"[১৫৫]

একটি উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সেজদা করলে উপস্থিত সাহাবীগণ তা দেখে তাঁকে সম্মানের উদ্দেশ্যে সেজদা করতে চাইলে তিনি তাঁদেরকে তা করতে নিষেধ করে বলেন,

«اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ»

---

155. আল-কুরআন, সূরা ফাতহ : ৯।

“তোমরা তোমাদের রবের দাসত্ব কর এবং তোমাদের ভাইকে একরাম তথা সম্মান কর।”[১৫৬]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাউকে সেজদা করা তার উপাসনারই শামিল। আর উপাসনা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো করা যায়না বিধায়, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা যাবে না। এমন কি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেও তা করার কোনো বৈধতা নেই। অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

“আমি যদি কাউকে সেজদা করার নির্দেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীকে সেজদা করার নির্দেশ করতাম।”[১৫৭]

---

156 উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল কতিপয় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ছিলেন, এমন সময় একটি উট এসে তাঁকে সেজদা করলো। সাহাবীগণ তা দেখে বললেন : হে রাসুল! চতুষ্পদ জন্তু আপনাকে সেজদা করে, অথচ আমরা এর অধিক হকদার, তখন তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং তোমাদের ভাই অর্থাৎ আমাকে সম্মান কর।” **আহমদ**, প্রাগুক্ত; ৩/৩২। [(তবে এর সনদ দুর্বল), সম্পাদক]

157 মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মা-জাঃ, প্রাগুক্ত; কিতাবুন নিকাহ, বাব: হক্কুয যাওজি ‘আলাল মারআতি (স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার); ১/৫৯৫।

এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শরী'আতে সেজদা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও উপাসনা প্রকাশের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি মাধ্যম। কেউ কারো জন্যে- তিনি যেই হোন না কেন- সেজদা করা হারাম। যে আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করলো, প্রকৃতপক্ষে সে গায়রুল্লাহকেই তার উপাস্য বানিয়ে নিল। আল্লাহর উপাসনার ক্ষেত্রে সে অপরকে শরীক করে নিল।

লোক দেখানো সালাত :

সালাত হচ্ছে এমন একটি উপাসনা যা আল্লাহর সম্মুখে বিনয় প্রকাশ, তাঁর সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি বিশেষ উপায়। সালাতকে শির্কমুক্ত করে এটাকে যথার্থ উপাসনায় পরিণত করতে হলে তা যে কোনো ধরনের লোক দেখানো ভাব থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যক। যদি কেউ তাতে কোনো লোক দেখানোর ভাব করে, তা হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে সে তার এ উপাসনায় অপরকে শরীক করে নিল। এ জাতীয় উপাসনা প্রসঙ্গে হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيْ فِيْهِ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وشِرْكَه»

“আমি সকল শরীকানদের শরীকানা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে

ব্যক্তি কোনো কাজে আমার সাথে কাউকে শরীক করে নিল, আমি তাকে ও তার শির্কযুক্ত কাজকে ছেড়ে দেই।"[১৫৮]

এ জাতীয় সালাত আদায়কারীদের জন্য যে ধ্বংস অপেক্ষা করছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝٤ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۝٦ ﴾ [الماعون: ٤، ٦]

"অতএব, ধ্বংস সেই সব সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের সালাত সম্পর্কে বে খবর, যারা তা লোক দেখানোর জন্যে করে।"[১৫৯]

যাকাত আদায় করা :

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন এবং তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করা একটি আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। সালাতের ন্যায় কেউ যদি তা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে আদায় করে, তবে তাও উপর্যুক্ত হাদীস অনুযায়ী শির্কী কর্মের অন্তর্গত হবে।

কা'বা গৃহের হজ্জ (الحج):

---

[158].মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুয যুহদ, বাব নং ৮৯, হাদীস নং ২৯৮৫;৪/২২৮৯; আহমদ, প্রাগুক্ত; ২/২০১।

[159]. আল-কুরআন,সূরা মাউন :৫,৬।

কা‘বা গৃহ আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনাদির মধ্যকার একটি অন্যতম নিদর্শন। এ গৃহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করা মুসলিমদের মধ্যকার সুস্থ ও সম্পদশালীদের জন্য একটি ফরয ইবাদত; তারা জগতের যেখানেই বসবাস করুক না কেন- জীবনে অন্তত একবার এ ইবাদত পালনের উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করা অপরিহার্য।

কা‘বা শরীফ নির্মাণ ও এর হজ্জ করার নির্দেশের উদ্দেশ্য:

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন দ্বীন। এ দ্বীনের অনুসারীরা সকলেই এক আল্লাহর বান্দা ও পরস্পরের ভাই ভাই। সে কারণে তিনি চান তাঁর বান্দারা এক ও অভিন্ন নিয়মে এবং একই কিবলা বা দিকে তাদের মুখ ফিরিয়ে তাঁর উপাসনা করুক। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে[১৬০] তাদের জন্য কা‘বা

[160]. কা‘বা গৃহটি পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ার প্রমাণে ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি মাওকূফ হাদীস উপস্থাপন করা যায়। তাতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেন: আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবী সৃষ্টির দু’হাজার বছর পূর্বে পানিতে চারটি স্তম্ভের উপর কা‘বা গৃহ স্থাপন করেন। অতঃপর এ-গৃহের নিচ থেকেই পৃথিবীর সম্প্রসারণ শুরু হয়”। দেখুন: **তাফছীরুল কুরআনিল ‘আযীম;** ১/১৮৪। পৃথিবীর মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে বাস্তবেই প্রমাণিত হয় যে, আরব উপ-দ্বীপটি পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। লেখক

গৃহ তথা কিবলা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তারা যে পরস্পরের ভাই ভাই তা বাস্তবে প্রমাণ করে দেখানোর লক্ষ্যে তাদের মধ্যকার সুস্থ ও সম্পদশালীদের উপর সারা জীবনে অন্তত একবার সে গৃহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করার বিধান জারী করেন। তাঁর বান্দারা যাতে সে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পৃথিবীর সর্বত্র থেকে তা যিয়ারতে আগমন করে, সে-জন্য তিনি ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন:

﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ ٢٧﴾ [الحج: ٢٧]

"আর তুমি মানুষের মধ্যে (এ গৃহের হজ্জের) ঘোষণা প্রচার কর, তারা যেন পায়ে হেটে এবং কৃষ্ণকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দুর-দুরান্ত থেকে তোমার কাছে (মক্কায়) আসে।"[১৬১]

এ-গৃহের চার পার্শে ত্বাওয়াফ করার প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]

"আর তারা যেন প্রাচীন পবিত্র গৃহের ত্বওয়াফ করে।"[১৬২]

---

[161]. আল-কুরআন,সূরা হজ্জ :২৭।

[162]. আল-কুরআন,সূরা হজ্জ :২৯।

এ গৃহ বরকতময় হওয়ার কারণে সম্ভব হলে ত্বওয়াফ করার সময় বরকত হাসিলের জন্য এ-গৃহের ডান পার্শ্ব হাত দিয়ে স্পর্শ করে অন্যথায় সে দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে সম্মান প্রদর্শণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[১৬৩]

এর বাম কোণে যে কৃষ্ণকায় পাথর (الحجر الأسـود) রয়েছে, এর সাথে মানুষের লাভ ও ক্ষতি কোনো সম্পর্ক না থাকলেও[১৬৪]

---

[163]. ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে দিন রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে এ দু'পার্শ্ব (অর্থাৎ- কা'বা গৃহের ডান পার্শ্ব ও বাম পার্শ্ব যেখানে হাজারে আসওয়াদ অবস্থিত) স্পর্শ করতে দেখেছি সে দিন থেকেই আমি এ দু'পার্শ্ব কষ্টে হোক আর বিনা কষ্টে হোক কোনো অবস্থাতেই তা স্পর্শ করা পরিত্যাগ করি নি''। দেখুন: **বুখারী, প্রাগুক্ত**; কিতাবুল মানাসিক, বাব নং: ৫৬, তাকবীলুল হাজার, হাদীস নং ১৫২৯; ২/৫৮২; নাসাই, প্রাগুক্ত; ৪/৫/১৮৫।

[164]. 'উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কৃষ্ণ পাথরকে চুম্বন করার সময় বলেছিলেন,

«عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَـرٌ لَا تَضُـرُّ وَلَا تَنْـفَعُ، وَلَوْ لَا رَأَيْتُ رَسُـوْلَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ»

''আমি জানি যে তুমি একটি পাথর, তুমি কোন লাভ ও ক্ষতি করতে পার না, রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- তোমাকে চুম্বন করতে না দেখলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না''। দেখুন:**বুখারী,প্রাগুক্ত,** কিতাবুল মানাসিক, বাব নং: ৫৬, হাদীস নং: ১৫২৮, ২/৫৮২; সুলাইমান ইবন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত হিসেবে সে পাথরকেও যথাসম্ভব চুম্বন বা স্পর্শ করার অনুমতি রয়েছে। কা'বা গৃহের দরজা ও মুলতাযামকে (দরজার চৌকাঠের নিচের পাকা স্থান) হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে তাঁর নিকট আকুতি ও মিনতি করে প্রার্থনা করারও অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।[১৬৫]

এ গৃহের নিকটে ও দুরে অবস্থিত মাকামে ইব্রাহীম, সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়দ্বয়, মিনা, মুযদালিফাহ ও আরাফাতের ময়দানকে তাঁর নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿۞إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨]

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াঃ পর্বতদ্বয় আল্লাহর নিদর্শনাদির অন্তর্গত।"[১৬৬]

আশআছ,**সুনানে আবী দাউদ**; কিতাবুল মানাকিব, বাব: ফী তাক্ববীলিল হাজারি; (সিরিয়া: দারুল হিমস, ১ম সংস্করণ, ১৯৭০ খ্রি.), ২/৪৩৯।

165. 'আব্দুর রহমান ইবন সাফওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (মক্কা বিজয়ের বছর) আমি রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে তাঁর সাথীদের সহ কা'বা গৃহ থেকে বের হতে দেখলাম, তখন তাঁরা কা'বা গৃহের দরজা থেকে হাতীম পর্যন্ত হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে ছিলেন এবং তাদের গণ্ডদেশ দেয়ালের সাথে লাগিয়ে রেখেছিলেন, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তখন তাঁদের মাঝে ছিলেন"। দেখুন: **আবু দাউদ**, প্রাগুক্ত; ২/৪৫১। [তবে এর সনদ দুর্বল। সম্পাদক]

166. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাঃ :১৫৮।

এ-সব স্থানের সম্মান করাকে অন্তরে তাকওয়ার পরিচায়ক হিসেবে গণ্য করে বলেছেন:

﴿ ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٣٢ ﴾ [الحج: ٣٢]

"এটা, আর যে কেউ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের সম্মান করে, তা তো তার অন্তরের তাকওয়ারই পরিচায়ক হয়ে থাকে।"[১৬৭]

এ-সব নিদর্শনাদির যথাযথ মর্যাদা দান বিশেষ করে আরাফাতে অবস্থান করাকে 'হজ্জ' এর পরিপূর্ণতার অন্তর্গত বলে গণ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الحَجُّ عَرَفَةُ»

"আরাফার ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করাই হচ্ছে হজ্জ।"[১৬৮]

তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মিনা ও মুযদালিফায় অবস্থান করে রাত্রি যাপন করাকেও হজ্জের পূর্ণতার অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। হজ্জ আদায়কারীদের সাথে নিজ নিজ বাড়ী বা এলাকা থেকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করার জন্য সাথে পশু নিয়ে যাওয়াকেও তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

---

[167]. আল-কুরআন, সূরা হজ্জ : ৩২।

[168]. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; ২/৪৮৬; ইবনে মা-জাহ, প্রাগুক্ত; ১/১০০৩।

﴿ وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ ﴾ [الحج: ٣٦]

"কা'বা গৃহের উদ্দেশ্যে সাথে উট নিয়ে যাওয়াকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে গণ্য করলাম, এতে রয়েছে তোমাদের জন্য কল্যাণ।"[১৬৯]

কা'বা গৃহ, মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাতে যা করা ইবাদাত তা অন্যত্র করা শির্ক:

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কা'বা গৃহ, সাফা ও মারওয়াহ, মিনা, মুযদালিফাহ ও আরাফার ময়দানকে কেন্দ্র করে উপর্যুক্ত ধরনের উপাসনাদির অনুমতি দিলেও এ-জাতীয় উপাসনাদি তাঁর ভালোবাসা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অন্যত্র কোথাও করার কোনো বৈধতা দান করেন নি। বিষয়টি এমন যে, উপর্যুক্ত উপাসনাদি শুধুমাত্র বর্ণিত স্থানসমূহে করলেই তা তাঁর উপাসনা হিসেবে গণ্য হবে। আর অন্য কোথাও করলে তা তাঁর উপাসনা না হয়ে বেদ'আতী ও শির্কী কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই কা'বা শরীফ ব্যতীত অপর কোনো মাযার বা পবিত্র স্থানকে তৃওয়াফ করা যাবে না। বরকত ও পূণ্য লাভের আশায় কা'বা গৃহ ব্যতীত অন্য কোনো গৃহ, মাযার, কবর, কবরের বেষ্টনী, পাথর ও গিলাফ ইত্যাদি স্পর্শ ও চুম্বন করা যাবে না। দু'আ কবুল হওয়া ও বরকত হাসিলের

---

[169]. আল-কুরআন,সূরা হজ্জ : ৩২।

জন্য কা‘বা গৃহ ব্যতীত অপর কোনো গৃহের বা কবর ও মাযারের দরজা বা অন্য কিছু হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে না। উপর্যুক্ত স্থানসমূহ এবং মসজিদ[১৭০] ও যে সকল স্থান বরকতময় বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে[১৭১], কেবল সে সব স্থান ব্যতীত অন্য

---

[170]. মসজিদ নির্মাণ এবং মসজিদে অবস্থান গ্রহণ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ ﴾ [النور: ٣٦]

“আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দাদের সে সব গৃহেই পাওয়া যায় যেগুলোকে তিনি উন্নত করার ও সেখানে তাঁর নাম নেয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধায় তারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে”। আল-কুরআন, সূরা নূর : ৩৬।

[171]. ইয়ামন ও সিরিয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকতের দু‘আ করায় মক্কা ও মদীনার পর অন্যান্য দেশের চেয়ে ইয়ামন ও সিরিয়ায় বসবাস করাকে উত্তম বিবেচনা করে সেখানে বসবাস করা যেতে পারে। ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا»

ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ। দেখুন : তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল মানাক্বিব, বাব : নং ৭৫, সিরিয়া ও ইয়ামনের ফযীলতের বর্ণনা; ৪/৭৩৩। তাছাড়া যায়েদ ইবন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে রয়েছে,

কোনো কবর ও মাযারে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে না। সাফা ও মারওয়াহ ব্যতীত অপর কোনো স্থানে পুণ্যের উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করা যাবে না। কা'বা গৃহ ব্যতীত অপর কোনো পবিত্র স্থান বা কোনো মাযারের উদ্দেশ্যে কুরবাণী ও মানত এর পশু নিয়ে যাওয়া যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল স্থানকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন, সে সব স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানকে পবিত্র গণ্য করা যাবে না। যমযমের পানি আর হরম শরীফের গাছ-পালা, মাটি, পাথর, ঘাস ও জীব-জন্তু ব্যতীত অপর কোনো কূপের পানি, মাযারের গাছ, মাটি, ঘাস, পুড়ানো মোম ও জীব-জন্তুকে পবিত্র গণ্য করা যাবে না। কা'বা গৃহের সম্মানার্থে কেবল তা ব্যতীত অন্য কোনো কবর বা মাযার বা গৃহকে কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা যাবে না। কা'বা গৃহ, মসজিদে নববী ও বায়তুল

«طُوْبَى لِلشَّام، فَقُلْنَا لأَيِّ ذلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ:لأَنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمٰنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا»

"সিরিয়ার খুশ নসীব। যায়েদ ইবন ছাবিত বলেন: আমরা বললাম : ইহা কি কারণে হে রাসূল? তিনি বললেন : কারণ রাহমানের ফেরেশতা সিরিয়ার উপর তাঁদের ডানা প্রসারিত করে রয়েছেন। তদেব। [তিরমিযী, ৩৯৫৪]

মাকদিস ব্যতীত অন্য কোনো দূরবর্তী মাসজিদ বা মাযার পুণ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে যিয়ারতে যাওয়া যাবে না।

এ জাতীয় যিয়ারত নিষেধ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»

“মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ ও বায়তুল মাকদিস ব্যতীত অন্য কোথাও পুণ্যার্জন ও আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সফর করা যাবে না।”[১৭২]

তবে যারা মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সেখানে যাবে, তারা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারত করতে পারবে। এতে শর‘য়ী কোনো বিধি নিষেধ নেই। থাকতেও পারে না কারণ; তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারত সাধারণ নিয়মের আওতায় পড়ে। এমতাবস্থায় কেউ তাঁর কবর যিয়ারত না করে সেখান থেকে চলে আসতে পারে না। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারতের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে শুধুমাত্র

[172].**মুসলিম**, প্রাগুক্ত; কিতাবুল হজ্জ, বাব : হজ্জ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে মুহরিমসহ মহিলাদের সফর করা; ২/৯৬৭; **ইমাম আহমদ**, প্রাগুক্ত; ২/১৩৪।

তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বৈধতা প্রমাণিত হয় নি।

পশু যবাই ও উৎসর্গ করা :

পশু যবাই করা মূলত দু'প্রকার :

এক. স্বাভাবিক অবস্থায় যবাই, যার দ্বারা আল্লাহ বা অপর কারো সন্তুষ্টি উদ্দেশ করা হয় না। মাংস বিক্রি করা বা তা ভাগাভাগি করে নেয়ার উদ্দেশ্যে যে সব পশু যবাই করা হয়, তা এ প্রকারের আওতায় পড়ে।

দুই. অস্বাভাবিক অবস্থায় যবাই, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও বিপদাপদ দূরীকরণার্থে মানত পূর্ণ করাস্বরূপ হয়ে থাকে।

যবাই সঠিক হওয়ার শর্ত :

পশু যবাই যে প্রকারেরই হোক, তা সঠিক হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে :

এক, যবাই করার সময় আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশের জন্য 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহর নাম নিয়ে তা যবাই করতে হবে।

দুই. যবাই করার স্থানটি মুশরিকদের যে কোনো ধরনের প্রতিমা, মূর্তি ও মেলা (ওরস) বসানোর স্থান হওয়া থেকে পবিত্র হতে হবে; কারণ, যে স্থানে কোনো প্রতিমা বা মূর্তির সম্মান করা

হয় অথবা যেখানে মুশরিকদের মেলা (ওরস) বসে, সে স্থানটি আল্লাহ তা'আলার নামে যবাই করার জন্য উপযুক্ত স্থান নয়। সেখানে যবাই করার সময় আল্লাহর নাম হাজার বার নিলেও তা আল্লাহর জন্য না হয়ে গায়রুল্লাহর জন্যেই হবে এবং যবাইকারী ও সেখানে যবাই এর জন্য পশু উৎসর্গকারী উভয়েই মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, এ স্থানে যবাইকারী ও পশুদানকারী প্রকৃতপক্ষে এ স্থানে অবস্থিত প্রতিমার সম্মানের জন্যই অথবা সেখানে অনুষ্ঠিত বার্ষিক মেলার কারণেই এখানে যবাই বা দান করেছে। দ্বিতীয় শর্তটির প্রমাণে সাবিত ইবন দাহহাক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন :

نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ (وَهِيَ مَوْضِعٌ فِيْ أَسْفَلِ مَكَّةَ دُوْنَ يَلَمْلَمْ) فَسأل النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

"এক ব্যক্তি (ইয়ালামলাম পাহাড়ের পাদদেশে মক্কার নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত) 'বাওয়ানা' নামক স্থানে একটি উট উৎসর্গ করার জন্য মানত করেছিল। সে তার মানত পূর্ণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলো। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে স্থানের উদ্দেশ্যে মানত করেছো সেখানে জাহেলী যুগে কোন প্রতিমা ছিল কি না? তারা বললেন : না, তা ছিল না। তিনি আবার বললেন : সেখানে মুশরিকদের বার্ষিক কোন মেলা (ওরস) বসতো কি না? তারা বললেন : না, তাও হত না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার মানত (সেখানে) পূর্ণ করতে পার, তবে জেনে রেখো! আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মানত পূর্ণ করতে নাই।"[১৭৩] এখানে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তিকে উক্ত স্থানে তার মানত পূর্ণ করার জন্য ঠিক তখনই অনুমতি দিলেন যখন সে স্থানটি জাহেলী যুগে মুশরিকদের কোনো প্রতিমা বা ঈদ থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। সাথে সাথে সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা আরো বলে দিলেন যে, যে স্থানে কোনো প্রতিমা থাকে বা যেখানে মুশরিকদের বার্ষিক মেলা তথা ওরস বসে, সে স্থান কোন প্রকার মানত পূর্ণ করার জন্য উপযোগী নয়। কেউ করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। তার কর্মের সাথে মুশরিকদের কর্মের সাদৃশ্য হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم»

---

[173].**আবু দাউদ**, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আইমানি ওয়ান নুযূর , বাব : মা ইউমারু বিহী মিনাল ওয়াফা-ই বিন নাযরি; ৩/৬০৭; হাদীস নং ৩৩১৩।

“যে ব্যক্তি তার কাজে ও কর্মে অপর কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য প্রকাশ করবে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে।”[১৭৪]

কোন মাযারে মানত পূর্ণ করা শির্ক :

উপরে বর্ণিত দাহহাক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো অলির মাযার অথবা যে সব স্থানে শির্কী কর্মকাণ্ড হয় অথবা যে মাযার বা কবরকে কেন্দ্র করে ইসালে সওয়াবের নামে বার্ষিক কোনো অনুষ্ঠান বা ওরস পালিত হয়, সে সব স্থানের উদ্দেশ্যে কোনো মানত করা বৈধ নয়। কেউ করে থাকলেও সেখানে তা পূর্ণ করা জায়েয নয়। যারা তা করবে তারা দ্বিতীয় হাদীসের মর্মানুযায়ী মুশরিকদের মধ্যেই গণ্য হবে। কোনো মাযারকে কেন্দ্র করে এর পার্শ্বে ইসালে সওয়াবের নামে কোনো অনুষ্ঠান হলে তাও জাহেলী যুগের মেলারই ধারাবাহিকতা হিসেবে গণ্য হবে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবরকে এ জাতীয় ইসালে সওয়াবের অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

«لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْداً»

174. প্রাগুক্ত; কিতাবুল লেবাছ , বাব নং- (৫), ৪/৩১৪ ।

“তোমরা আমার কবরকে ঈদ তথা উৎসবের স্থানে পরিণত করো না।”[১৭৫]

কবর কিভাবে মেলার স্থান ও প্রতিমায় পরিণত হয় :

একটি কবর বা একটি স্থানের ব্যাপারে যদি জনমনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এখানে গেলে বরকত বা ফয়েয হাসিল হয় এবং সেখানে গেলে লোকজনের বিভিন্ন রকমের মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং লোকজন সুযোগমত সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে বরকত ও ফয়েয হাসিল এবং মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য প্রতি দিন, সপ্তাহে, মাসে, ছয়মাসে বা বছরের নির্দিষ্ট কোন দিনে সমবেত হয় এবং সে কবর বা স্থানের উদ্দেশ্যে টাকা-পয়সা মানত করে, গরু, ছাগল ও মুরগী ইত্যাদি নিয়ে এসে সেখানে উৎসর্গ করে, তা হলে এতে সে কবর বা সে স্থান মেলার স্থান ও প্রতিমায় পরিণত হবে কেননা; এ জাতীয় কর্মসমূহ জাহেলী যুগের মানুষেরা বিভিন্ন অলিদের নামে নির্মিত দেবতা ও প্রতিমাদের উদ্দেশ্যেকৃত কর্মেরই ধারাবাহিকতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবরকে যাতে কেউ এ রকম মেলার স্থান ও প্রতিমায় পরিণত না

---

[175]. প্রাগুক্ত; কিতাবুল মানাসিক, বাব নং ৯৮ (যিয়ারাতুল কুবূর), হাদীস নং ২০৪২; ২/৫৩৪; ‘আযীমআবাদী, শামসুল হক, প্রাগুক্ত; ৬/২২; ইবনে কাছীর, **তাফছীরুল কুরআনিল ‘আযীম**; ৩/৫১৬; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ২/৩৬৭; ইবনে আবী শায়বাঃ, প্রাগুক্ত; ২/১৫০।

করে সে জন্য তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। যা আমরা একটু আগেই অবগত হয়েছি।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (৬৬১-৭২৮হিঃ) ঈদ (عيد) শব্দের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: “ঈদ হলো সে সব সাধারণ সমাবেশের নাম যা প্রথা ও রেওয়াযানুযায়ী বছর, সপ্তাহ বা মাস ইত্যাদি ঘুরে আসলে ঘুরে আসে। ঈদ কয়েকটি বিষয়ের সমষ্টির নাম :

এক. তা এমন এক দিনে হয় যা ঘুরে আসে। যেমন- ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও জুমু‘আর দিন।

দুই. সে দিনে সমবেত হওয়া।

তিন. সে দিনে সমবেত হয়ে উপাসনা ও প্রথাগত কিছু কর্ম করা।

ঈদ কখনও নির্দিষ্ট কোনো স্থানে হয়, কখনও তা অনির্দিষ্ট থাকে। উপরে বর্ণিত এ তিনটি বিষয়ের প্রতিটি বিষয়কেও ঈদ নামকরণ করা যেতে পারে। সে অনুযায়ী একটি সময়কেও ঈদ বলা যেতে পারে। যেমন- জুমু‘আর দিনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ قَدْ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ عِيْداً»

"জুমু'আর দিনটি এমন একটি দিন যাকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য ঈদ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।"[১৭৬]

অনুরূপভাবে কোন স্থানকেও ঈদ বলা যেতে পারে। যেমন- রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেছেন :

«لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْداً»

"তোমরা আমার কবরকে ঈদগাহে পরিণত করোনা।"[১৭৭]

কখনও একটি দিন এবং সে দিনে যে অনুষ্ঠান করা হয়, এ দু'য়ের সমষ্টির নামও ঈদ হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঈদ শব্দ দ্বারা এটাই বুঝানোর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ঈদের দিনে ঢোল বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা প্রসঙ্গে বলেন:

«إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْداً وَهَذَا عِيْدُنَا»

"হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির জন্য ঈদ রয়েছে, আর এটি হলো আমাদের ঈদ।"[১৭৮]

---

[176]. **ইবন মা-জাঃ**, প্রাগুক্ত; কিতাবুল একামাহ, বাব: মা জা-আ ফী ইয়াওমিল জুমু'আহ; ১/৩৪৯।

[177]. টীকা নং ১৬৪ দ্রষ্টাব্য।

[178]. ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত; কিতাবুন নিকাহ, বাব : আল-গেনা-ই ওয়াদ দফফি; ১/৬১২; ইবন তাইমিয়্যাহ, আহমদ, **একতিদাউস সিরাতিল মুস্তাক্বীম**,

মেলা প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু কাইয়্যিম (৬৯১-৭৫১হি:) বলেন : “যা প্রথাগতভাবে ঘুরে আসে এবং যে সময় আগমনের অপেক্ষা করা হয় এবং যে স্থানে গমনের ইচছা করা হয়, তাকে ঈদ বলা হয়। ঈদ (عيد) শব্দটিকে معاودة ফিরে আসা ও (اعتياد) ‘প্রথা স্বরূপ গ্রহণ করা’ শব্দমূল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ঈদ যখন কোনো স্থান কেন্দ্রিক হবে তখন এর দ্বারা সে স্থানই বুঝতে হবে যে স্থানকে সমবেত হওয়া ও উপাসনার জন্য উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা মসজিদুল হারাম (কা‘বা শরীফ), মিনা, মুযদালিফাঃ, আরাফাঃ ও নিদর্শনের স্থানসমূহকে তাওহীদপন্থীদের জন্য ঈদ ও পুণ্যার্জনের স্থান হিসেবে গণ্য করেছেন। অতীতে মুশরিকদের সময় ও স্থান কেন্দ্রিক অনেক ঈদ ছিল। ইসলাম আগমন করে তাদের সময় কেন্দ্রিক ঈদসমূহ বাতিল ঘোষণা করে এর পরিবর্তে মুসলিমদের জন্য ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এবং মিনা এর দিনসমূহকে ঈদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অনুরূপভাবে মুশরিকদের ঈদের স্থানসমূহের পরিবর্তে কা‘বা শরীফ, মিনা,

---

তাহকীক : হামিদ আল-ফকী, (বৈরুত : দারুল মা‘রিফাহ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃ. ১৮৯-১৯০।

মুযদালিফা, আরাফা ও নিদর্শনের স্থানসমূহকে ঈদ পালনের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছে।”[১৭৯]

উপর্যুক্ত এ আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, ইসলাম সাধারণ মুসলিমদের জন্য সময় কেন্দ্রিক যে সব ঈদ নির্ধারণ করেছে তা হলো: জুমু‘আর দিন, ঈদুলফিতর ও ঈদুলআযহা এবং আইয়্যামে তাশরীকের চার দিন। এ-দিনসমূহ ব্যতীত সপ্তাহান্তে ও বছরান্তে সমবেত হওয়ার জন্য মুসলিমদের সময় কেন্দ্রিক আর কোনো ঈদ নেই। এ সব দিনসমূহ হচ্ছে তাদের জন্য ঈদ পালনের দ্বীন নির্দেশিত দিবস। এ সকল দিবস ব্যতীত অপর কোনো দিবসকে কারো জন্ম দিবস হিসেবে আনন্দ প্রকাশের জন্য বা কারো মৃত্যু দিবস হিসেবে দুঃখ প্রকাশের জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঈদ নামকরণ করা যাবে না এবং এটাকে কোনো ধর্মীয় কাজ মনে করে তাতে সমবেত হওয়াও যাবে না। যদিও সে দিবসটি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম দিবসও হয়ে থাকতে পারে।

অনুরূপভাবে আমরা আরো অবগত হলাম যে, মুসলিমদের জন্য কা‘বা শরীফ, মিনা, মুযদালিফাঃ ও এর আশেপাশের

---

179. শেখ আব্দুর রহমান ইবন হাসান আ-লুশ শায়খ, **ফাতহুল মাজীদ বি শারহি কিতাবিত তাওহীদ**; (লাহুর : আনসারুস সুন্নাতিল মুহাম্মদিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃ. ২৫৭।

নিদর্শনের (مشاعر) স্থানসমূহ ও ঈদের মাঠ ব্যতীত দ্বীন নির্দেশিত স্থান কেন্দ্রিক অপর কোনো ঈদ পালনের স্থান নেই। এ সকল স্থানের মধ্যে কা'বা শরীফে আমরা সকলেই সব সময় পুণ্যার্জনের জন্য সমবেত হতে পারবো। অবশিষ্ট স্থানসমূহে হাজীগণ কেবল হজ্জের সময়ে পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে দূর ও নিকট থেকে সমবেত হতে পারবেন। কা'বা শরীফের পাদদেশে আমরা বছরের প্রত্যেক দিনে এবং হাজীগণ আরাফার ময়দানে জিলহজ্জ মাসের নবম দিনে, মুযদালিফায় জিলহজ্জ মাসের নবম দিনের দিবাগত রাতে, মিনায় জিলহজ্জ মাসের অষ্টম, দশম, এগারো, বারো ও তেরো তারিখসমূহে এবং মাশায়ের (مشاعر) অর্থাৎ যে সকল নিদর্শনের স্থানসমূহে হাজীগণ হজ্জের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালনার্থে অবস্থান গ্রহণ করেন, সেখানেও হজ্জের সময় তারা ধর্মীয় কাজ হিসেবে পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে সমবেত হতে পারবেন। হজ্জের সময় ব্যতীত একমাত্র কা'বা শরীফ ছাড়া উপর্যুক্ত এ সব স্থানসমূহে পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে আগমনের ধর্মীয় কোনো গুরুত্ব নেই। অবশ্য আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, কা'বা শরীফসহ মসজিদে নববী এবং বায়তুল মাকদিস এ তিনটি মসজিদে পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে আগমন করার ব্যাপারে শরী'আতের অনুমোদন রয়েছে। সুতরাং এ তিন মসজিদেই কেবল আমরা দূর-দূরান্ত থেকে পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে সফর করে এসে সমবেত হতে

পারবো। অন্য কোনো মসজিদ বা স্থানে নয়। এবার যদি আমরা উপর্যুক্ত সময় ও স্থানসমূহের সাথে অপর কোনো সময় ও স্থানকে সংযোজন করি, তবে তা যেমন দ্বীনীভাবে কোনো ছাড়পত্র পাবে না, তেমনি তা কোন পুণ্যার্জনের কাজ বলেও বিবেচ্য হবে না। বরং দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে তা একেকটি বেদ‘আতী কর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পাবে কেননা; উপর্যুক্ত সময় ও স্থান ব্যতীত মুসলিমদের জন্য দ্বীন নির্দেশিত অপর কোনো ঈদ পালন ও সফর করার স্থান নেই। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অপর কোনো অলি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মাযারে তাঁদের জন্ম বা মৃত্যু দিবসে সমবেত হয়ে সেখানে আনন্দ প্রকাশ করে, বা ওরস পালন করে, তা হলে এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁদের জন্ম দিবসকে ঈদের দিন এবং তাঁর ও তাঁদের কবরকে ঈদ পালনের স্থানে পরিণত করার শামিল হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁদের জন্ম দিবস আমাদের জন্য আনন্দের দিবস হয়ে থাকলেও তাঁদের জন্ম দিনকে ঈদের দিন বলে নামকরণ করে সেদিনে তাঁদের কবরে বা অন্যত্র কোথাও ঈদ পালন করার কোনো বৈধতা শরী‘আতে স্বীকৃত নয় কেননা; এমনটি করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে জাহেলী যুগের মুশরিকদের সে সব ঈদ পালনেরই

ধারাবাহিকতা যা তারা তাদের দেব-দেবীদেরকে কেন্দ্র করে পালন করতো।

দান ও সদক্বা :

দান ও সদকা মানুষের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের ক্ষেত্রে একটি উপকারী মাধ্যম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন :

«اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

"তোমরা খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ।"[১৮০]

তিনি আরো বলেছেন :

«عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ»

"প্রত্যেক মুসলিমের উপর সদকা করা একান্ত জরুরী।"[১৮১]

---

[180]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুয যাকাত, বাব : খেজুরের অর্ধেকাংশ দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ, ১/২/২৩৪; মুসলিম, প্রাগুক্ত; ২/৭০৩, ৭০৪।

[181]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুজ যাকাত, বাব নং ১৬, হাদীস নং ১০০৮; ২/৬৯৯; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ৪/৩৯৫।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : তা বিপদ দূরীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন তিনি বলেছেন :

«لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الجِبَالَ، فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجِبَتِ المَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الجِبَالِ. قَالُوا: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمُ الحَدِيدُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمُ النَّارُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمُ المَاءُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ المَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ الرِّيحُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ ابْنُ آدَمَ، تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ»

“আল্লাহ তা‘আলা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন তা দুলতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাতে পর্বত সৃষ্টি করলে তা স্থির হয়ে যায়। তা দেখে ফেরেশতাগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন : প্রভু হে! পর্বতের চেয়ে শক্তিশালী তোমার অপর কোন সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন: ‘হ্যাঁ, এর চেয়ে শাক্তশালী হলো লোহা।’ তারা বললেন : প্রভু হে! লোহার চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন : “হ্যাঁ, তা হলো আগুন।” তারা বললো : প্রভু হে! আগুনের চেয়ে শাক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন : ‘হ্যাঁ, আগুনের চেয়ে শক্তিশালী হলো বাতাস। তারা আবার বললো : প্রভু হে! বাতাসের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন

: 'হ্যাঁ, আদম সন্তান উদার চিত্তে যে দান করে তা (বিপদ দূরীকরণের ক্ষেত্রে) বাতাসের চেয়েও অধিক শক্তিশালী।''[১৮২]

সদকা সঠিক হওয়ার শর্ত :

সদকা করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম, এতে কারো দ্বি-মত নেই। কিন্তু এ সদকা সঠিক হওয়া ও এটিকে উপাসনায় পরিণত করার জন্য যে দু'টি পূর্ব শর্ত রয়েছে, সে সম্পর্কে অনেকেরই জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

সদকা সঠিক হওয়ার **প্রথম শর্ত** : সদকা স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক যে অবস্থায়ই করা হোক না কেন তা কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হতে হবে। কোনো প্রকার লোক দেখানো ভাব থেকে তা মুক্ত হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত :

উপরে বর্ণিত দাহহাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের মর্মানুযায়ী যে স্থানের নামে সদকা করা হয়েছে সে স্থানটি শির্ক সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য স্থান হওয়া থেকে মুক্ত হতে হবে।

---

[182].ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ৩/১২৪; ইবনু কাইয়্যিম আল-জাউযিয়্যাহ, **মিফতাহু দারিস সা'আদাঃ**, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃ. ২১৮। [হাদীসটি তিরমিযীতেও এসেছে, নং ৩৩৬৯; তবে হাদীসটি দুর্বল। সম্পাদক]

এ দু'টি শর্তের আলোকে বলা যায়, কেউ যদি সদকা করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির পাশাপাশি সামান্যতম লোক দেখানোরও উদ্দেশ্য করে, তবে এতে সে ব্যক্তি শির্কে আসগরে নিমজ্জিত হবে। আর কবর ও মাযার যেহেতু শির্ক সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য স্থান, সেহেতু সেখানে সদকা করার কোনো বৈধতা নেই। যেহেতু শরী'আতে মাযার নির্মাণ অবৈধ এবং মাযারে দান করাও অবৈধ, তাই মাযারের অবৈধ টাকায় সেখানে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলাও অবৈধ। মাযারে টাকা দান করা যেহেতু হারাম, সুতরাং সেখানে কোনো ফকীর, মিসকীন ও ভবঘুরে লোকদেরও ভিড় জমাবার কোনো আবশ্যকতা নেই। সাধারণত মাযারে যারা দান করে তারা এ দানের মাধ্যমে মাযারস্থ অলির সন্তুষ্টি লাভ করে তাঁর নিকট থেকে বা তাঁর মাধ্যম্যে আল্লাহর নিকট থেকে তাদের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ সাধনের জন্যেই তা দান করে। এ জাতীয় দান ও কামনা শির্কে আকবারের অন্তর্গত। কাজেই সাদকা দানের ক্ষেত্রে শির্ক থেকে বাঁচতে হলে যে সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অলিদের মাযার কেন্দ্রিক নয়, কেবল সেখানেই সাদকা করতে হবে।

মানত :

বিপদ দেখলে মানুষ মানত করে। ধারণা করে হয়তো বা এতে তার বিপদ কেটে যাবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানত মানুষের

কর্মের কোনো পরিবর্তন এনে দিতে পারে না। সে জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى القَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ»

"মানত বনী আদমের জন্য এমন কিছু বয়ে আনতে পারে না যা আমি তার তাকদীরে রাখি নি, বরং মানত তাকে তার জন্য তাকদীরে যা নির্ধারণ করা আছে সেটার উপর নিয়ে রাখে। ফলে এর দ্বারা আল্লাহ কেবল কৃপণের কিছু সম্পদ তার হাত ছাড়া করেন। তখন তার কাছে এমন কিছু আসে যা পূর্বে আসত না" [১৮৩]

ইমাম তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে : "তোমরা মানত করো না কেননা; তা তাকদীরের কোনো পরিবর্তন করতে পারে না...।"[১৮৪]

---

[183]. **বুখারী**, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আইমান ওয়ান নুজুর, বাব : মানত পূর্ণ করা; ৪/৮/২৫৩; **মুসলিম**, প্রাগুক্ত; ভাগ্য অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং- (২), ৩/১২৬১।

[184]. ইমাম **তিরমিযী,** প্রাগুক্ত; ৪/১১২; নাসাই, প্রাগুক্ত; শপথ ও মানত অধ্যায় পরিচ্ছেদ: মানতের দ্বারা কৃপনের সম্পদ বের করে নেওয়া হয়; ৪/৭/১৬।

এ জন্যেই মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে মানত করার জন্য কোনো নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করেন নি। তবে যেহেতু মানতের মাধ্যমে সম্মানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তা এমন কারো নামে করতে হয় যিনি মানুষের বিপদাপদ দূরীকরণের মালিক। এ দু'টি বিষয় বিবেচনায় আনলে মানতকে আল্লাহর উপাসনায় পরিণত করার জন্য তাতে মোট দু'টি শর্ত পূর্ণ হতে হবেঃ

এক. তা কেবল আল্লাহ তা'আলার সম্মানার্থে কেবল তাঁরই নামে এবং কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে হবে।

দুই. পূর্বে বর্ণিত যাহহাক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের মর্মানুযায়ী তা জাহেল লোকদের ওরস ও শির্ক সংঘটিত হওয়ার সম্ভাব্য স্থান মাযার ও মুকাম থেকে মুক্ত হতে হবে।

যারা মানত সঠিক হওয়ার জন্য এ দু'টি শর্তের কথা বিবেচনায় না এনে বিভিন্ন মাযার ও কবরে মানত করে, তারা মানতটি পূর্ণ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে থাকলেও মূলত তাদের মানতের দ্বারা মাযার ও কবরস্থ সে অলি ও দরবেশের সম্মানই প্রদর্শিত হয়ে থাকে এবং মাযার ও কবরস্থ অলির নিকটেই তারা বিপদ দূরীকরণের জন্য তাদের আবদার করে থাকে। তারা যদি প্রকৃতপক্ষে তাদের বিপদ দূরীকরণের কথা আল্লাহর নিকটেই চেয়ে থাকতো, তা হলে কোনো অবস্থাতেই তারা কোনো মাযার বা কবরে মানত করতো না।

মানত আল্লাহর পছন্দনীয় কোনো উপাসনার মাধ্যম না হয়ে থাকলেও যেহেতু এর দ্বারা আল্লাহর সম্মান প্রদর্শিত হয়, সে জন্য মানতের শর্তানুযায়ী কেউ তা করলে সে মানত পূর্ণ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায় এবং এ জাতীয় মানত পূর্ণ করা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মু'মিনদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হয়ে থাকে। সে জন্য আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ﴾ [الانسان: ٧]

"তারা (মু'মিনগণ) মানত পূর্ণ করে।"[১৮৫]

অন্তরের উপর ফরযকৃত গোপন উপাসনাসমূহ :

আমরা যদি আল্লাহর উপাসনাদি নিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করি তা হলে দেখতে পাব যে, শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপাসনার ক্ষেত্রে সমাজের মানুষেরা যতটুকু শির্ক করছে, তার চেয়েও অধিক শির্ক করছে অন্তরের উপর ফরযকৃত গোপন উপাসনাসমূহে। নিম্নে অন্তরের গোপন উপাসনাসমূহ এবং কিভাবে তাতে শির্ক হয়, তা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের প্রতি ঈমান

---

[185]. আল-কুরআন, সূরা দহর : ৭।

প্রতিটি মানুষের অন্তরের প্রাথমিক গোপন কাজ হচ্ছে সে অন্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলার বর্তমান থাকা এবং তাঁকে এককভাবে সকল সৃষ্টির প্রতিপালক ও উপাস্য হিসেবে দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করবে। অন্তরের এ ধরনের বিশ্বাস হচ্ছে অন্তরের উপাসনা। কোনো মানুষই এ বিশ্বাস ব্যতীত মু'মিন হতে পারে না বিধায়, এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না। এবার যদি কেউ আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করে অথবা নিজ বিশ্বাস, কর্ম বা কথার দ্বারা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের আওতাধীন কোনো বিষয়ে বা তাঁর কোনো উপাসনায় অপর কোনো সৃষ্টিকে জেনে বা না জেনে শরীক রয়েছে বলে বিশ্বাস করে, তা হলে সে ব্যক্তি তার অজান্তেই মুশরিক হয়ে যাবে।

আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মহব্বত :

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মানুষের ভালোবাসারস্বরূপ হচ্ছে সে ভালোবাসা তাদের নিজেদের সত্তা, নিজ সন্তানাদি, পিতা-মাতা ও অন্যান্য সব কিছুর চেয়ে অধিক হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ»

“আমি যতক্ষণ তোমাদের কারো নিকট তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক ভালোবাসার পাত্র না হবো, ততক্ষণ সে প্রকৃত মু’মিন হতে পারবে না।”[১৮৬]

একদা ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন : “হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমার নিকট আমার নিজ সত্তা ব্যতীত অন্য সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়। তাঁর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ»

“শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার আত্মা! যতক্ষণ আমি তোমার নিকট তোমার নিজ সত্তার চেয়েও অধিক প্রিয় না হবো, ততক্ষণ তুমি পূর্ণাঙ্গ মু’মিন হতে পারবে না।”[১৮৭]

কেউ যদি বলে : আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসি, তা হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে

---

[186]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ঈমান, বাব : রাসূলের ভালবাসা ঈমানের অন্তর্গত; ১/১/১৭; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ঈমান, বাব : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালবাসা অপরিহার্য; ১/৬৭। হাদীসটি আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত।

[187]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আইমান ওয়ান নুজুর, বাব : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শপথ কেমন ছিল?; ৪/৬/২৩১-২৩২।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই তাকে তার এ দাবীর সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ﴾ [ال عمران: ٣١]

"আপনি তাদেরকে বলুন! তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে ভালবেসে থাক, তা হলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, এতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা করবেন।"[১৮৮]

একজন রাসূল মহব্বতকারীর পরিচয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ যদি তার প্রাণ, তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও সম্পদ ইত্যাদিকে বিসর্জন দেয়ার দাবী করে, তা হলে সে নির্দ্বিধায় তা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। কেননা; তা একটি বিশেষ ধরনের ভালোবাসা, যাকে আল্লাহর দাসত্ব প্রকাশের ভালোবাসা বলা হয়। এ জন্য প্রয়োজন আল্লাহর বিধানের সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আল্লাহর অবাধ্যতায় অন্য কারো ভালোবাসা প্রকাশের জন্য এ ধরনের কোনো বিসর্জন দেয়া যেতে পারে না। এখন যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[188]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ৩১।

ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ বা নিষেধ পালনের পরিবর্তে অপর কোনো ধর্মীয় গুরু বা রাজনৈতিক নেতার আদেশ বা নিষেধ পালনের জন্য নিজের সব কিছু বিসর্জন দেয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার উপর তাদের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং এভাবে সে গায়রুল্লাহর ভালোবাসাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিশেষ ভালোবাসার সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। এ জাতীয় ভালোবাসার লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

"মানুষের মাঝে এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর একাধিক সমকক্ষ নির্ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসার ন্যায় ভালবাসে। বস্তুত যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ তা'আলাকেই সব চেয়ে অধিক ভালবাসে।"[১৮৯]

আরবের মুশরিকরা তাদের দেবতাদের এ ধরনের ভালবাসতো বিধায়, আল্লাহ এ আয়াতে তাদের এ জাতীয় ভালোবাসার সমালোচনা করেছেন। মুসলিমদের মাঝে যারা আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের নেতৃবৃন্দের আদেশ ও নিষেধকে

---

[189]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ১৬৫।

ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করবে, তাদের অবস্থাও আরবের মুশরিকদের মতই হবে।

ভালোবাসার প্রকারভেদ (أنواع المحبة) :

এখানে উল্লেখ্য যে, ভালোবাসা মূলত দু'প্রকার :

এক. বিশেষ ধরনের ভালোবাসা, যাকে আমরা 'আল্লাহর সত্তাগত ভালোবাসা' বলতে পারি। যে ভালোবাসা নিয়ে আমরা উপরে আলোচনা করেছি। এ জাতীয় ভালোবাসা কেবল আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্যে হতে পারে না। রাসূল- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসাও আল্লাহর ভালোবাসার কারণে হতে হবে, রাসূলের সত্তাগত কোনো ভালোবাসা নয়। রাসূল আমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের বাণী পৌঁছিয়েছেন, আমাদেরকে দ্বীনের দিশা দিয়েছেন, আমাদেরকে তিনি পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচাতে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন সেজন্যই তাঁকে ভালোবাসতে হবে। কেবল রাসূলের ব্যক্তিসত্ত্বার জন্য এ জাতীয় ভালোবাসা হতে পারবে না। হ্যাঁ, রাসূলের জন্য অন্যান্য ভালোবাসা যোগ হতে পারে, যার আলোচনা সামনে আসছে।

দুই. সাধারণ ভালোবাসা। এটি আবার তিন প্রকার:

1. প্রকৃতিগত ভালোবাসা, যেমন- কোনো বিশেষ প্রকারের মাছ, মাংস বা মিষ্টি খাওয়ার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ। অনুরূপভাবে ক্ষুধার্ত মানুষের আহার ও তৃষ্ণার্ত মানুষের পানির প্রতি আকর্ষণ, এ সব একই পর্যায়ের ভালোবাসা। এ সব বস্তুর প্রতি অন্তরের ভালোবাসা যেমন সম্মান মিশ্রিত নয়, তেমনি এ ভালোবাসার সাথে সম্মান প্রদর্শনেরও কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এ জাতীয় ভালোবাসার সাথে শির্কেরও কোন সম্পর্ক নেই।

2. একত্রে বসবাস ও সহাবস্থানগত ভালোবাসা। যেমন- কোন শিল্প কারখানার কর্মচারীদের পারস্পরিক ভালোবাসা। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক ভালোবাসা। ভ্রমণ বা ব্যবসার সঙ্গীদের পারস্পরিক ভালোবাসা। ভিন্ন দেশে অবস্থানকারী একদেশী মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা। একইভাবে স্বামী-স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবদের পারস্পরিক ভালোবাসা ইত্যাদি। এ জাতীয় ভালোবাসাতেও উপাসনাগত সম্মান প্রদর্শনের কোনো সম্পর্ক না থাকায় এর সাথেও শির্কের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

3. দয়া ও অনুগ্রহপ্রসূত ভালোবাসা। যেমন- সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এবং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা। এ

জাতীয় ভালোবাসার সাথেও উপাসনাগত সম্মান প্রদর্শনের কোনো যোগসূত্র নেই বলে এতেও আপত্তির কিছু নেই[190]।

উপর্যুক্ত এ তিন প্রকারের ভালোবাসা দ্বারা পরস্পরের প্রতি অস্বাভাবিক ধরনের কোনো বিনয় ও সম্মান প্রদর্শিত বা প্রমাণিত হয় না বিধায়[191], এ সবের সাথে শির্কের কোনো সম্পর্ক নেই।[১৯২]

---

[190] মনে রাখতে হবে যে, রাসূলের প্রতি আমাদের ভালোবাসাও এ পর্যায়ের। তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসার কারণ হচ্ছে,

- তাঁকে ভালোবাসতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশকে আমরা বাস্তবায়ণ করি।
- তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, সুতরাং তাঁর অনুগ্রহ আমাদের উপর অনেক। তাই তাঁকে ভালোবাসতে হবে।
- তিনি আমাদেরকে ভালোবাসতেন, তাই তাঁর ভালোবাসার প্রতিদানস্বরূপ আমরাও তাঁকে ভালোবাসব।
- তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। সে নির্দেশ বাস্তবায়ণ করতে হলে ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই।

রাসূলের প্রতি আমাদের ভালোবাসা কখনই সত্তাগত নয়, বরং গুণগত। এ বিশ্বাস প্রতিটি মুমিনের রাখা উচিত। [সম্পাদক]

[191] এটাই হচ্ছে অনুমোদিত ভালোবাসা ও নিষিদ্ধ ভালোবাসার সীমারেখা। কোনোক্রমেই এ সব ভালোবাসায় অস্বাভাবিক ধরনের কোনো বিনয় ও সম্মান প্রদর্শিত বা প্রমাণিত হতে পারবে না। যদি কোনোভাবে এগুলোতে এ জাতীয় কিছু পরিলক্ষিত হয়, তবে সেটাও শির্কী ভালোবাসায় পরিণত হবে। যদি কেউ রাসূল, স্ত্রী, পণ্য, সন্তান-সন্তানাদি, অথবা দুনিয়ার যে

গোপন ভয়ের উপাসনা (عبادة خوف السر) :

একজন মু'মিন আল্লাহর ব্যাপারে তার অন্তর দিয়ে গোপনে এ-ভয় পোষণ করবে যে, আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য আর অপ্রকাশ্য বলতে কিছুই নেই। মানুষ প্রকাশ্যে বা গোপনে যা-ই করে না কেন, তিনি তা সবিশেষ অবহিত আছেন। আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য অথবা আমাদের অন্যায় ও অপরাধজনিত কারণে তিনি ইচ্ছা করলে হঠাৎ করে যে কোনো সময় আমাদের যে কোনো অনিষ্ট হতে দিতে পারেন। আমাদের অন্যায় ও অপরাধের শাস্তি তিনি আমাদেরকে এ দুনিয়াতে না দিলেও আখেরাতে দিতে পারেন। সে জন্য তিনি আমাদেরকে সর্বদা তাঁর শাস্তির ভয় ও রহমতের আশায়[১৯৩] থেকেই তাঁকে আহ্বান করতে নির্দেশ করে বলেছেন :

কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ণ বিনয় ও অস্বাভাবিক ভালোবাসা দেখায় তবে সেটাও মা'বুদে পরিণত হবে এবং যে এ ধরনের ভালোবাসবে সে মুশরিক হয়ে যাবে। [সম্পাদক]

[192] শেখ সুলাইমান ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৬৮। (সংক্ষিপ্ত) তবে এটাও উপরোক্ত শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত। [সম্পাদক]

[193]. ইবনে কাছীর, প্রাগুক্ত; ২/২৩১। ইমাম ইবন কাছীর সূরা আ'রাফের (وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً) এ আয়াতে ব্যাখ্যায় বলেন :

«أي: خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب»

﴿وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ﴾ [الاعراف: ٥٦]

“আর তোমরা তাঁকে (আল্লাহ তা‘আলাকে) ভয় ও আশার মধ্যে থেকেই আহ্বান করো।”[১৯৪]

ভয় ও আশার মধ্যে থেকে আল্লাহ তা‘আলাকে আহ্বান করার প্রতি আমাদেরকে আদেশ করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্তরে এ ধরনের ভয় ও আশা নিয়ে তাঁকে আহ্বান করা হচ্ছে অন্তরের একটি বিশেষ ধরনের ইবাদাত বা উপাসনা। কোনো মানুষের ব্যাপারে কারো অন্তরে এ ধরনের ভয় ও আশার সৃষ্টি হতে পারে না, কেননা; আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কোনো মানুষ ও জিন নেই, যারা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত স্রেফ তাদের নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী কারো কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারে। কারো দ্বারা কারো ইষ্ট বা অনিষ্ট হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বিধায়, আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে কেবল তাঁকেই ভয় করতে আদেশ করে বলেছেন:

﴿فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ﴾ [المائدة: ٤٤]

“সুতরাং তোমরা মানুষের কোনো অনিষ্টের ভয় করো না, ভয় কেবল আমাকেই কর।”[১৯৫] কাফিররা তাদের দেবতাদের

---

[194]. আল-কুরআন, সূরা আ‘রাফ : ৫৬।

[195]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ : ৪৮।

ব্যাপারে অনুরূপ গোপন ভয় পোষণ করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেবতাদের সমালোচনা করেন বলে তাঁকেও তারা তাদের দেবতাদের দ্বারা হঠাৎকরে যে কোনো অনিষ্টের শিকার হওয়ার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ﴾ [الزمر: ٣٦]

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? অথচ তারা (মুশরিকরা) তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় প্রদর্শন করে।"[১৯৬]

যেহেতু মহান আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত কেউ কারো কোনো ক্ষতি বা অনিষ্ট করতে পারে না, সেহেতু কোনো জিন-পরী, বা জীবিত বা মৃত কোনো অলি বা দরবেশ, অথবা মাযারস্থ কোনো বৃক্ষ বা অন্য কিছুর দ্বারা কোনো কারণবশত কারো কোনো অনিষ্ট হতে পারে- এমন ধারণা ও ভয় করাও আল্লাহর গোপন ভয়ের উপাসনায় শির্ক করার শামিল।

ভয়ের প্রকারভেদ (أنواع الخوف) :

ভয় মূলত চার প্রকার :

---

196. আল-কুরআন, সুরা যুমার : ৩৬।

প্রথম প্রকার : গোপন ভয়। যা নিয়ে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এমন ভয় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কারো জন্যে করা শির্ক।

দ্বিতীয় প্রকার: কোনো মানুষ বা ফিৎনার ভয়ে কোনো সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্ম হতে বারণ করা থেকে বিরত থাকা। এ ধরনের ভয় শির্ক না হলেও তা হারাম। কারণ, কুরআনুল কারীমে এ ধরনের ভয় করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মু'মিনদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

﴿يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٖۚ﴾ [المائدة: ٥٤]

"তারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।"[১৯৭]

হাদীস শরীফে এ ধরনের ভয়কারীদের ব্যাপারে আখেরাতে ভৎর্সনা ও জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে :

«إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ أَنْ لاَ تُغَيِّرَهُ ؟ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ ! خَشِيْتُ النَّاسَ. فَيَقُوْلُ : إِيَّايَ كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى»

"কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বান্দাকে বলবেন: অন্যায় কর্ম দেখার পর কোন বস্তু তোমাকে তা পরিবর্তন করতে বাধা দিল?

---

[197]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ : ৪৫।

তখন বান্দা বলবে : হে প্রভু! পাছে লোকে কী বলে, এ ভয়ে আমি তা নিষেধ করতে পারি নি। আল্লাহ বলবেন: মানুষের চেয়ে আমিইতো ভয়ের অধিকতর হকদার ছিলাম।”[১৯৮]

তৃতীয় প্রকার : আল্লাহর শাস্তির ভয়, যে শাস্তির ব্যাপারে তিনি তাঁর অবাধ্য ও অপরাধী বান্দাদের ভয় প্রদর্শন করেছেন। এ জাতীয় ভয় মু'মিনদের অন্তরে থাকা প্রশংসনীয়। যারা এ গুণে গুণান্বিত হবে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট আকর্ষণীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [ابراهيم: ١٤]

“এ-পুরস্কার তাদের জন্যেই যারা হিসেবের জন্য আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।”[১৯৯]

চতুর্থ প্রকার : প্রকৃতিগত ভয়, যেমন- ওৎ পেতে থাকা শত্রু বা হিংস্র জীব-জন্তু, বিষধর সাপ, পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মরে যাওয়া ইত্যাদির ভয়। এ জাতীয় ভয় কোনো নিন্দনীয় বা দূষণীয় নয় কারণ; এ জাতীয় ভয় সম্মান মিশ্রিত হয় না। মূসা আলাইহিস সালাম-এর অন্তরে ফের‘আউন ও তার সৈন্যদের

---

[198]. ইবন মাজাহ, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ফিতন, বাব নং (২০); ২/১৩২৮। (তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল [সম্পাদক])

[199]. আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম : ১৫।

ব্যাপারে এ জাতীয় ভয় ছিল। এ কারণেই তিনি মিসর ছেড়ে পালিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

﴿ فَخَرَجَ مِنۡهَا خَآئِفٗا يَتَرَقَّبُۖ ﴾ [القصص: ٢١]

"অতঃপর তিনি (মূসা) শত্রু আগমনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়েন।"[২০০]

কামনার উপাসনা (عبادة الرجاء) :

'রাজা-উন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : মনের কামনা পূর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। মানুষের মনের কামনা মূলত দু'প্রকারের হয়ে থাকে :

এক. এমন সব চাহিদা যা পূর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যে কর্ম করতে হয়, তা ব্যক্তির নিজের বা অপর যে কোনো মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে। এ জাতীয় চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অন্য জীবিত উপস্থিত মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। তবে কোনো মৃত বা অনুপস্থিত কোনো মানুষের কাছে এ জন্য সাহায্যের আহ্বান করলে তা শির্কে আকবার এর অন্তর্গত হবে।

দুই. এমন সব কামনা যা পূর্ণ করে দেয়া আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কারো সামর্থ্যের মধ্যে নেই। যেমন: সন্তান দান

---

[200]. আল-কুরআন, সূরা ক্বাসাস : ২১।

করা, ব্যবসায় উন্নতি প্রদান করা, রোগ-ব্যাধি নিরাময় করা, সমুদ্র বা নদীতে ঝড় ও তুফানের হাত থেকে রক্ষা করা, জঙ্গলের হিংস্র জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করা... ইত্যাদি। মানুষের এ জাতীয় চাহিদা পূরণ করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কারো সামর্থ্যের মধ্যে নেই। তাই এ জাতীয় কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য কোনো অলি বা দরবেশের নিকট সাহায্য কামনা করা শির্কে আকবারের পর্যায়ভুক্ত; কেননা, এতে করে তাঁদেরকে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তাঁদের কাছে কামনা-বাসনা করা হয়[201]।

ভরসার উপাসনা (عبادة التوكل) :

---

[201] মনে রাখা জরূরী যে, কামনা-বাসনার মাধ্যমে শির্ক হওয়ার জন্য এটা জরূরী নয় যে, কেউ মনে করবে যে যাদের কাছে সে কামনা-বাসনা করছে, তাদের নিকট রুবুবিয়্যাতের কোনো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কারণ, যদি এরকম কোনো বিশ্বাস থাকে, তবে তা হবে, দু'দিক থেকে শির্ক। প্রথমত, রুবুবিয়্যাতে শির্ক, তারপর তার কাছে কামনা-বাসনার কারণে সে আল্লাহর উলুহিয়্যাতেও শির্ক করল। সুতরাং কেউ যদি কারও ব্যাপারে রুবুবিয়্যাতের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই মনে করেও তার কাছে এমন কোনো কিছু পাওয়ার কামনা-বাসনা করে, যা একমাত্র আল্লাহর কাছেই থাকতে পারে, তাতেও সে আল্লাহর উলুহিয়্যাত তথা ইবাদাতে শির্ক করেছে বলে গণ্য হবে। [সম্পাদক]

একজন মু'মিনের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে তার করণীয় হচ্ছে, উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে কর্ম করা প্রয়োজন, তা নিজের সাধ্যের মধ্যে থাকলে তা নিজে করা বা অপর জীবিত ও উপস্থিত কারো সাধ্যের মধ্যে থাকলে প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতায় তা সম্পাদন করা এবং কর্মের ফলাফল প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা করা। কর্ম যদি কারো সাধ্যের মধ্যে না থাকে, তবে নিজে বা অপর জীবিত উপস্থিত মানুষের দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তা কামনা করা এবং তা অর্জিত হওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর উপরেই ভরসা করা। কোনো অবস্থাতেই নিজের বা অপর কারো উপর ভরসা না কর। কেননা, প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সকল ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করা। সে-জন্য আল্লাহ বলেন,

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]

“তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে মু'মিন হয়ে থাকো, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরেই ভরসা কর।”[২০২] এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত মু'মিন হতে হলে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরেই ভরসা করতে হবে। তা না করে যারা আল্লাহর পাশাপাশি নিজের বা অন্যের

---

[202]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ্ : ২৩।

কর্মের উপর ভরসা করবে, তারা শির্কে আসগারে পতিত হবে। আর যা কারো সাধ্যের মধ্যে নেই, তা প্রাপ্তির জন্য যারা কোনো অলি বা দরবেশের উপরে ভরসা করবে, তারা শির্কে আকবারে পতিত হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মানুষের সামর্থ্যের মধ্যকার কর্মের ক্ষেত্রেও কর্ম আরম্ভ করে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর উপরেই ভরসা করতে হবে, এ কারণে যে, কর্ম করার জন্য যে শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, সে সবের মালিক হলেন আল্লাহ। তিনি তৌফিক দিলেই কেবল আমরা কোনো কর্ম শুরু ও তা শেষ করতে পারি। অন্যথায় হাজারো ইচ্ছা ও চেষ্টা করেও আমরা তা করতে পারবো না।

কর্ম না করে আল্লাহর উপর ভরসা করা অবৈধ :

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম না করে তা হাসিলের জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করাকে শর‘য়ী দৃষ্টিতে ‘তাওয়াককুল’ বলা হয় না। এ ধরনের ভরসা শর‘য়ী দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেউ যদি খাওয়া-দাওয়া না করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং এভাবে থেকে শেষ পর্যন্ত মারা যায়, তবে শর‘য়ী দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি আত্মহত্যাকারী হিসেবে গণ্য হবে।

আনুগত্য ও অনুসরণের উপাসনা (عبادة الطاعة والاتباع) :

একজন মু’মিনের যাবতীয় আনুগত্য ও অনুসরণ নিঃশর্তভাবে নিবেদিত হবে কেবলমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে। রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতাদের যে আদেশ বা নিষেধ পালন করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ হবে, কেবল সে ক্ষেত্রেই একজন মুসলিম তাঁদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। আর যে ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা হবে, সে ক্ষেত্রে কোনো কারণবশত বাহ্যত তাঁদের আনুগত্য ও অনুসরণ করলেও খুশী মনে অন্তর দিয়ে তাঁদের আনুগত্য করবে না। আনুগত্যের এ বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ ﴾ [النساء: ٥٩]

তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বপ্রাপ্তদের আনুগত্য কর। অতঃপর কোনো বিষয়ে সে দায়িত্বশীলদের সাথে তোমরা মতবিরোধ করলে সত্যিকারার্থে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনে থাকলে বিরোধপূর্ণ সে বিষয়টিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে

দাও, এটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং পরিণতির দিক থেকে তা খুবই ভাল।”[২০৩]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হলে বিনা দলীলে কেউ কারো কোনো কথা মানতে পারবে না; বরং সে ক্ষেত্রে সাধারণ ও ক্ষমতাশীন নির্বিশেষে সকলকেই আল্লাহ্ তা‘আলার কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহীহ সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে হবে; কেননা, এ দু’টিই হচ্ছে যে কোনো বিবাদ মীমাংসার ফয়সালাদায়ক ও যে কোনো বিধান রচনা করার মূল উৎস। ধর্মীয় বা পার্থিব কোনো ক্ষেত্রেই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা জাতীয় সংসদের দ্বারা গৃহীত কোনো আইন বা সিদ্ধান্তই- তা বাহ্যত যতই কল্যাণকর হোক না কেন- কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত বিধান বা তাতে বর্ণিত মৌলিক নীতিমালার আওতাধীন হওয়ার ছাড়পত্র ব্যতীত বৈধ হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে-মানুষ একমাত্র আল্লাহরই সৃষ্টি, তাই তাদের সার্বিক জীবন পরিচালিত হবে তাঁরই দেওয়া হেদায়াত ও বিধানানুযায়ী। এ হেদায়াত ও বিধানই যে তাদের দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় সুখ, শান্তি ও কল্যাণের নিয়ামক, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

---

[203]. আল-কুরআন, সূরা নিসা : ৫৯।

﴿فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ۝٣٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝٣٩﴾ [البقرة: ٣٨، ٣٩]

"অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত আসে, তাহলে যারা আমার সে হেদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের উপর না কোন ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে। আর যারা তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।"[২০৪]

আল্লাহ যে মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার একক বিধান দাতা, সে সম্পর্কে তিনি বলেন :

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ﴾ [يوسف: ٤٠]

"হুকুম হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই, তিনি তোমাদেরকে একমাত্র তাঁরই উপাসনা করতে নির্দেশ করেছেন।"[২০৫]

এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে- তিনি মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহীহ

---

[204]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ৩৮, ৩৯।

[205]. আল-কুরআন, সূরা আন'আম : ৫৭।

হাদীসে প্রকাশ্যভাবে বা ইশারা ও ইঙ্গিতে যে সব বিস্তারিত বিধান ও মৌলিক নীতিমালা দিয়েছেন, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করার মধ্য দিয়েই জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্যের উপাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে তিনি আমাদের নির্দেশ করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের জীবনকে শাসন করার জন্য কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে নিজ থেকে কোনো বিধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কোনো বৈধ অধিকার আমাদের নেই। কোনো ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীম বা সহীহ হাদীসে সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও বা সে বিষয়ে তাতে বিধান রচনার জন্য কোনো মৌলিক নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও সে সুস্পষ্ট বিধান বা নীতিমালা পরিহার করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি জনগণের জন্য নিজ থেকে কোনো বিধান রচনা করেন, তা হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নিজেদের প্রবৃত্তিকেই নিজেদের ইলাহ বানিয়ে থাকবেন। এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾ [الجاثية: ٢٣]

"আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে।"[২০৬]

এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর বক্তব্য হচ্ছে:

---

[206]. আল-কুরআন, সূরা জাছিয়াহ : ২৩।

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيۡرِ هُدٗى مِّنَ ٱللَّهِۚ﴾ [القصص: ٥٠]

"আল্লাহর হেদায়াত ব্যতীত যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে।"[২০৭]

সাধারণ জনগণ যদি সে ধরনের কোনো বিধান বিনা প্রতিবাদে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেন, তা হলে তাদের অবস্থা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের মতই হবে, যারা তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের এ জাতীয় কর্মকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করার ফলে তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]

"ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের পাদরী ও ধর্মযাজকদের আল্লাহর বদলে বহু রব বানিয়ে নিয়েছিল।"[২০৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আদী ইবন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীস শ্রবণ করার পর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন : **"হে রাসূল! আমরাতো তাদেরকে রব বানিয়ে নেই নি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তারা কোনো বস্তু হালাল বা হারাম বলে দিলে তোমরা কি তা গ্রহণ করো না?**

---

[207]. আল-কুরআন, সূরা ক্বাসাস : ৫০।

[208]. আল-কুরআন, সুরা তাওবাহ : ৩১।

জবাবে আদী বলেন- হ্যাঁ, তা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটিই হচ্ছে তাদেরকে রব বানানোর শামিল।"[২০৯]

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা কোনো রাজনৈতিক নেতা বা ধর্মীয় কোনো ইমাম বা কোনো মাযহাবের নিঃশর্ত আনুগত্য ও অন্ধ অনুসরণ করবে, তাঁদের গৃহীত বিধান বা মতামতের ভুল-শুদ্ধ বিচার না করে এর বিপরীতে কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীস পাওয়া সত্ত্বেও চোখ বন্ধ করে অন্ধভাবে তাঁদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে তাদের পরিণতি ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের মতই হবে। বিশেষ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুসরণ করার ব্যাপারে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (মৃত ১১৭৬ হি.) স্বীয় গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'তে এবং ক্বাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (১১৮৩-১২২৫ হি.) তাঁর তাফসীরে মাযহারীতে মুসলিমদের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। অন্ধ তাকলীদ হারাম হওয়া প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) যা বলেছেন, তা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হলো :

---

[209]. তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুত তাফসীর, বাব : নং- ৯।

“যিনি কোনো একটি বিষয়েও ইজতেহাদ করার মত যোগ্যতা অর্জন করবেন, তার পক্ষে সে বিষয়ে অপরের অন্ধ তাকলীদ করা হারাম। অনুরূপভাবে যার নিকট এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো একটি আদেশ বা নিষেধ করেছেন এবং সে আদেশ বা নিষেধের ব্যাপারে বর্ণিত অন্যান্য সকল হাদীস অনুসন্ধান করে এবং এর পক্ষে বা বিপক্ষে যারা রয়েছেন, তাদের কথা-বার্তা অনুসন্ধান করে সে ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সে আদেশ বা নিষেধের কোনো মনসূখ বা রহিতকারী দলীল খুঁজে না পায়, অথবা বিষয়টি যদি এমন হয় যে, অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ রাসূলের আদেশ বা নিষেধ সম্বলিত কোনো হাদীস গ্রহণ করে থাকেন, অথচ দেখা যায় যিনি তা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করছেন, তিনি কেবল কোনো ক্বিয়াস (রায়) অথবা ইজতেহাদ বা অনুরূপ কিছুর দ্বারা এর বিরোধিতা করছেন, এমতাবস্থায় সে যদি (তা অনুধাবন করার পরেও নিজের ইমাম বা মাযহাবের মতামত পালন করার জন্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সে হাদীসের বিরোধিতা করে, তখন বুঝতে হবে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

হাদীসের বিরোধিতার পিছনে তার অন্তরে গোপন নেফাকী বা প্রকাশ্য আহমকী ব্যতীত আর কোনো কারণ নেই।"[২১০]

মাওলানা সানাউল্লাহ পানিপথী (১১৮৩-১১২৫ হি.) কুরআনুল কারীমে বর্ণিত :

﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [ال عمران: ٦٤]

"আমরা যেন পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি।"[২১১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : "এখান থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো হাদীস যদি কারো নিকট কোনো প্রকার বিরোধ থেকে মুক্ত

---

[210].এ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তা নিম্নরূপ:

إنما يتم (أي تحريم التقليد) فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة. و فيمن ظهر عليه ظهورا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا و نهى عن كذا ، و أنه ليس بمنسوخ ، إما بأن يتتبع الأحاديث و أقوال المخالف و الموافق في المسألة فلا يجد لها نسخا. أو بأن يرى جما غفير من المتبحرين في العلم يذهبون إليه ، ويرى المخالف له لا يحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك ، فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفاق خفي أو حمق جلي.

- দেখুন : আদ-দেহলভী , শাহ ওয়ালী উল্লাহ, **হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ;** (বৈরুত : দ্বারুল মা'রিফাহ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), পৃ. ১৫৪-১৫৬।

[211]. আল-কুলআন, সূরা আলে ইমরান : ৬৪।

অবস্থায় সহীহভাবে প্রমাণিত হয় এবং এর কোনো রহিতকারীও তার নিকট প্রমাণিত না হয়, এমতাবস্থায় উদাহরণস্বরূপ ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর কোনো ফতোয়াও যদি এর বিপরীতে হয়, আর চার ইমামের কোনো ইমাম এ হাদীসের উপর 'আমল করে থাকেন, তা হলে সে ব্যক্তির পক্ষে উক্ত হাদীসের উপর 'আমল করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (এমতাবস্থায়) কঠিনভাবে তার মাযহাবকে আঁকড়ে ধরে থাকা যেন তাকে সে হাদীসের উপর 'আমল করা থেকে বিরত না রাখে। কেননা, এমনটি করলে এতে আল্লাহকে ব্যতীত পরস্পরকে অসংখ্য রব বানানোর শামিল হবে।"[২১২]

তাকলীদ করার সরল ও সঠিক পন্থা :

---

[212].এ প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন এর আরবী ভাষান্তর নিম্নরূপ :

ومن ههنا يظهر أنه إذا صح عند أحد حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم سالما من المعارضة ، ولم يظهر له ناسخ ، وكان فتوى أبي حنيفة رحمه الله مثلا خلافه ، وقد ذهب على وفق الحديث أحد من الآئمة الأربعة، يجب عليه اتباع الحديث الثابت ، ولا يمنعه الجمود على مذهبه من ذلك ، لئلا يلزم اتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.

দেখুন : পানিপতী, ক্বাযী সানাউল্লাহ, **আত-তাফসীরুল মাজহারী**, (দেহলী : এদারাতু এশাআতিল উলূম, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ২/৬৩-৬৪।

আমরা যারা সাধারণভাবে কুরআন ও হাদীস অল্প-বিস্তর জানি অথবা যারা জানি না, আমরা সকলে অবশ্যই কারো না কারো অনুসরণ বা তাকলীদ করবো। তবে এ ক্ষেত্রে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের অনুরূপ হওয়ার অভিযোগ থেকে বাঁচতে হলে আমরা কোনো মাযহাব বা কোনো মনীষীর তাকলীদ করার ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবো যে, যখনই কোনো বিষয়ে আমরা অনুসরণীয় মাযহাব বা মনীষীর কোনো মতামত কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীতে রয়েছে বলে নিজস্ব পড়া-শুনা অথবা কারো মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে অবগত হতে পারবো, তখনই সে বিষয়ে সে মাযহাব বা সে মনীষীর মতামতের উপর 'আমল করা পরিহার করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দ্বারা যা করা সঠিক বলে প্রমণিত হয়, তা-ই করবো। অনুরূপভাবে যখনই আমাদের নিকট নিজ মাযহাবে প্রচলিত কোনো 'আমলের বিপরীতে অপর কোনো মাযহাবের 'আমল এক বা একাধিক অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হাদীস ও যুক্তির আলোকে 'আমলের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য বলে প্রতীয়মান হবে, তখনই আমরা যাবতীয় ধরনের গোঁড়ামি পরিহার করে নিজ মাযহাবের 'আমল পরিত্যাগ করে সে মাযহাবের আমলকে গ্রহণ করবো। আশা করি, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কারো বা কোনো মাযহাবের অনুসরণ করলে এতে আমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের অনুরূপ হওয়া থেকে বাঁচতে পারবো। সাধারণ

লোকেরা যে এ ধরনের সরল ও সোজা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কারো না কারো তাকলীদ করবে এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন :

“যে ব্যক্তি কারো তাকলীদ করে এ মানসিকতা নিয়ে যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অপর কারো কথা মানতে রাজি নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হালাল বা হারাম করেছেন সে কেবল তাই হালাল বা হারাম বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন, তা তার জানা নেই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্যসমূহের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ কথাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের বা তাঁর কথা থেকে অনুসন্ধান করে মাসআলা বের করার পন্থা সম্পর্কেও তার কোনো জ্ঞান নেই, এমতাবস্থায় সে যদি কোনো হেদায়াত প্রাপ্ত আলিমের অনুসরণ করে এ ধারণার ভিত্তিতে যে, তিনি যা বলেন তা সঠিক, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেই ফতোয়া দেন এবং তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করেন, তবে তিনি (অনুসরণীয় ব্যক্তি) যদি কখনও তার উক্ত ধারণার বিপরীত কিছু করেন বলে তার নিকট প্রমাণিত হয়, তা হলে সে কোনো প্রকার বিতর্ক অথবা জিদ না করে তাৎক্ষণিকভাবেই সে আলিমের অনুসরণ করা পরিত্যাগ করবে। তা হলে এমন

তাকলীদকে কেউ কিভাবে অস্বীকার করতে পারে ?...তিনি অতঃপর বলেন: যে নিষ্পাপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন, সে রাসূলের কোনো হাদীস যদি বিশুদ্ধ সনদে আমাদের নিকট পৌঁছায়, আর তা যদি নিজ ইমামের মাযহাবের বিপরীত কিছু প্রমাণ করে, এমতাবস্থায় আমরা যদি তাঁর হাদীসকে পরিত্যাগ করে মুজতাহিদের হাদীস বিরোধী ইজতেহাদকে গ্রহণ করি, তা হলে আমাদের চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে? কেয়ামতের দিন রব্বুল আলামীনের নিকট আমাদের কী জবাব হবে?"[২১৩]

---

[213].তিনি বলেন :

وليس محله (أي محل تحريم التقليد) فيمن لا يدين إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم و لا يعتقد حلا إلا ما أحله الله و رسوله ، و لا حراما إلا ما حرمه الله و رسوله لكن لم يكن له علم بما قال النبي صلى الله عليه و سلم و لا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه ، و لا بطريق الاستنباط من كلامه اتبع عالما راشدا على أنه مصيب فيما يقول ، و يفتي ظاهرا ، متبع سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فإن خالف ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال و لا أصرار، فهذا كيف ينكره أحد ... ثم قال : فإن بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذي فرض= الله علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتبعنا ذلك التخمين أي= قياس المجتهد واستنباطه، فمن أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين.

অন্তরকে সর্বদা আল্লাহ মুখী করে রাখার উপাসনা (الإنابة إلى الله) :

এনাবত 'إنابة' শব্দের অর্থ হচ্ছে- অগ্রসর হওয়া, ধাবিত হওয়া, তাওবা করা। আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে- অপরাধ করে বা না করে সর্বাবস্থায় অন্তরকে আল্লাহমুখী করে রাখা। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ﴾ [الزمر: ٥٤]

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হও এবং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর।"[২১৪]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহমুখী হয়ে থাকতে হবে, জীবনের যে কোনো অভাব ও অভিযোগের কথা সরাসরি কেবল তাঁরই নিকট পেশ করতে হবে। সর্ব অবস্থাতেই কোনো পীর বা অলির শরণাপন্ন হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে; কেননা, আমরা সর্বদাই তাঁর মুখাপেক্ষী, অপর কারো মুখাপেক্ষী নই। তিনি বলেছেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ١٥ ﴾ [فاطر: ١٥]

দেখুন : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, **হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ;** পৃ. ১৫৬।

214. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৫৪।

“হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ হলেন অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।”[২১৫]

আমাদের অন্তরকে আল্লাহর প্রতি ধাবিত না করে আমরা যদি নিজের জীবনের কোনো অভাব অভিযোগ বা বিপদের কথা কোনো মৃত অলি ও দরবেশের কাছে বা তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পেশ করি, তা হলে আমরা অন্তরের ‘এনাবতের’ উপাসনায় তাঁদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নেবো; কারণ আমাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে :

﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ﴾ [غافر: ٦٠]

“তোমরা আমাকে আহ্বান করো, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব।”[২১৬]

সৎ এবং অসৎ নির্বিশেষে সকলের প্রতি এ আহ্বান থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি তার অভাব ও বিপদের সময় গায়রুল্লাহর শরণাপন্ন হয়, তা হলে সে যেন গায়রুল্লাহকেই তার ইলাহ ও প্রতিপালক বানিয়ে নিল। এখানে স্মর্তব্য যে, কোনো সৎ জীবিত মানুষকে অভাব মোচন ও বিপদ দূরীকরণের মালিক মনে না করে এবং তাঁকে মানুষের সমস্যাদি আল্লাহর নিকট উপস্থাপনের মাধ্যম

---

[215]. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির : ১৫।

[216]. আল-কুরআন, সূরা গাফির : ৬০।

মনে না করে তাঁর কাছে গিয়ে বিপদ দূরীকরণের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য বলা যেতে পারে। কোনো মানুষ মরে যাওয়ার পর তার কাছে কোনো দু'আ কামনা করা যায় না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

"মানুষ যখন মরে যায় তখন তার যাবতীয় কর্ম বন্ধ হয়ে যায়"।[২১৭]

সার কথা :

একজন মুসলিম যখন এ কথার স্বীকৃতি দিবে যে, একমাত্র আল্লাহই আমার উপাস্য ও প্রতিপালক, তখন তাকে তার শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্তরের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় উপাসনা একমাত্র আল্লাহর জন্যেই করে তার এ স্বীকৃতির যথার্থতার প্রমাণ দিতে হবে। তাকে মনে রাখতে হবে যে, এ পৃথিবীতে আমার বাঁচা ও মরা, আমার যাবতীয় কাজ ও কর্ম কেবল আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত হবে। প্রতিটি মুসলিমের মনের অভিব্যক্তি যে সর্বদা এটাই হতে হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

---

[217]. হাদীসটি নিম্নরূপ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ... **দেখুন:** মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ, বাব নং ৩, ৩/১২৫৫; তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আহকাম, বাব নং ৩৬, হাদীস নং : ১৩৭৬; ৩/৬৬০; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ২/৩৭২।

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

“বলুন : আমার সালাত, কুরবানী, জীবন ও মৃত্যু (সব কিছুই) সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত। তাঁর কোনো শরীক নেই, এ ঘোষণা দেওয়ার জন্যেই আমি আদিষ্ট হয়েছি, আর আমিই হলাম প্রথম আত্মসমর্পণকারী।”[২১৮]

প্রত্যেকের মনের এ অভিব্যক্তিকে সত্যে পরিণত করতে হলে নিজেকে একজন যথার্থ মু’মিন বলে প্রমাণ করার জন্য নিজের উপাসনায় কোনো প্রকার শির্ক আছে কী না তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং থাকলে তা পরিহার করে তাওবাহ ও ইস্তেগফার করে নিজের ঈমান ও ‘আমলকে সংস্কার করে নিতে হবে।

শির্কে আকবার এর চতুর্থ প্রকার : অভ্যাসগত[219] শির্ক

মানব সমাজে অতীত কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এমন কিছু অভ্যাস প্রচলিত রয়েছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[218]. আল-কুরআন, সূরা আন‘আম : ১৬২।

[219] ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আগত অভ্যাসগত শির্ক বলে লেখকের পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে, তা আলাদা কোনো শির্ক নয়। এগুলো হয় আল্লাহর রবুবিয়াতে শির্ক, নতুবা আল্লাহর উলুহিয়াত তথা ইবাদাতে শির্ক। অথবা তাঁর নাম ও গুণে শির্ক। এর বাইরে কোনো শির্ক নেই ও হতে পারে না। [সম্পাদক]

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনুল কারীম ও হাদীসে জাহেলী যুগের যে সব শির্কী অভ্যাসের সমালোচনা বর্ণিত হয়েছে, সে সব অভ্যাসের মধ্যে ছিল :

১. কোনো উপত্যকায় অবতরণ করলে সেখানকার জিনের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে উপত্যকার জিনদের মহিলা সরদারকে আহ্বান করে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

২. দেবতাদের উদ্দেশ্যে চতুষ্পদ জন্তু উৎসর্গ করা এবং তা উৎসর্গ করা হয়েছে বুঝানোর জন্যে এর কান কাটা, শরীর বিকৃত করা ও ঘাড়ে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা। এ সকল উৎসর্গকৃত জন্তুর মধ্যে 'বাহীরা', 'সা-ইবা', 'ওয়াসীলা' ও 'হামী' ছিল অন্যতম।

৩. দেবতাদের জন্য শস্য ও চতুষ্পদ জন্তুতে অংশ নির্ধারণ করা।

৪. সন্তানাদিকে অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেবতাদের নিকট নিয়ে যাওয়া।

৫. তারকার প্রভাবে বৃষ্টি অবতীর্ণ হয় বলে বিশ্বাস করা।

৬. জ্যোতিষ, গণক ও কাহিনদের নিকট ভাগ্যের ভাল-মন্দ অবগতির জন্য গমন করা।

৭. কোন কোন রোগ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত নিজ থেকে সংক্রমিত হয় বলে মনে করা।

৮. পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা। পাখি ডান দিকে উড়ে গেলে এটাকে শুভ লক্ষণ এবং বাম দিকে উড়ে গেলে এটাকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা।

৯. কোন কোন দিন ও মাসকে অশুভ মনে করা।

১০. গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা।

১১. শিশুদের গায়ে তাবীজ ঝুলানো, ইত্যাদি।

ইসলাম পরবর্তী যুগে এ সব শির্কী অভ্যাসের অপনোদন করা হলেও অজ্ঞতাবশত মুসলিমদের মাঝে শির্কে আসগারের পর্যায়ে পড়ে এমন কিছু কথা-বার্তার প্রচলন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন রাসূল এর ইচ্ছাকে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত করে একদা এক সাহাবী বলেছিলেন :

«مَاشَاءَ اللهُ وَشِئْتَ»

"আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।"

লোকটির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَجَعَلْتَنِيْ للهِ عَدْلاً»

"তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করে নিলে?"[২২০]

---

[220].ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ১/২১৪।

অনুরূপভাবে অপর এক সাহাবী বলেছিলেন :

«نَسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَيْك»

“আল্লাহর শাফা‘আতের ওসীলায় আমি আপনার নিকট কামনা করছি”। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তিকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন: আল্লাহকে মাধ্যম করে কারো কাছে কিছু চাওয়া যায়না; কারণ, আল্লাহ সুমহান মর্যাদার অধিকারী।[২২১]

এ অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে এ জাতীয় অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বিধায়, এখানে এ সবের প্রমাণাদি ও তথ্যসূত্র সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হলো না।

সারকথা :

আলোচ্য পরিচ্ছেদের উপসংহারে যে কথাটি বলতে চাই তা হলো : শির্ক মূলত আল্লাহ তা‘আলার উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়ে থাকে। শির্ককে প্রথমে যে দু’প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে, তন্মধ্যে শির্কে আকবর হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাত উভয় কেন্দ্রিক। আবার শির্কে আকবরকে যে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তন্মধ্যে জ্ঞানগত,

---

[221]. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; কিতাবুস সুন্নাহ, বাব নং- ১৮; ৫/৯৫। (তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল। [সম্পাদক])

পরিচালনাগত ও অভ্যাসগত[222] এ তিন প্রকারের শির্কের সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের সাথে। অর্থাৎ- যারা এ তিন প্রকারের শির্কে নিমজ্জিত হবে তারা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের সাথে শির্ক করবে। আর উপাসনাগত অবশিষ্ট যে প্রকারটি রয়েছে এটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত। শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত বাহ্যিক যে সব উপাসনার বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহর উলূহিয়্যাতের সাথে, আর শরীরের গোপন অঙ্গ অন্তরের সাথে সম্পর্কিত যে সব উপাসনার বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়্যাতের সাথে। অর্থাৎ- যারা শরীরের বাহ্যিক উপাসনায় শির্ক করবে তারা আল্লাহর উলূহিয়্যাতে শির্ক করবে, আর যারা অন্তরের উপাসনায় শির্ক করবে তারা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শির্ক করবে[223]।

---

[222] আমরা আগেই বলেছি, লেখক এখানে অভ্যাসগত যে সকল শির্কের উদাহরণ দিয়েছেন তা হয় রুবুবিয়্যাত, নতুবা উলুহিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত। সেটাকে শুধু রুবুবিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত বলার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। [সম্পাদক]

[223] এখানেও বিশুদ্ধ মতটি আমরা লেখকের কথার বাইরে দেখতে পাই। কারণ, অন্তরের উপাসনার বিষয়টিও উলুহিয়্যাতের সাথেই সম্পৃক্ত। তবে কোনো কোনো সময় সেটা রুবুবিয়্যাতে শির্ক করা পর্যন্ত গড়ায়। [সম্পাদক]

আলোচ্য পরিচ্ছেদে শির্কের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, এর প্রকারাদি এবং এর পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর সামনের পরিচ্ছেদে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তা হলো- মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট জীব হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাঝে আদি থেকে কি তাওহীদী চিন্তা ও চেতনা বিরাজমান ছিল, না কি তাদের মাঝে শির্কী চিন্তা ও চেতনা বিরাজমান ছিল?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদি মানুষেরা তাওহীদ পন্থী ছিল না শির্কপন্থী?

কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী ও নাস্তিক এই বলে আওয়াজ উঠিয়েছে যে, সকল ধর্মেই অংশীবাদী চিন্তাধারা একত্ববাদী চিন্তাধারার পূর্বে বিরাজমান ছিল। তাদের ধারণা মানুষের এ অংশীবাদী চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয়ে একত্ববাদী চিন্তাধারায় পৌঁছাতে বেশ কয়েকটি বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করেই তা এ অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী জুলিয়ান হেক্সলীর চিন্তাধারায় উপর্যুক্ত বক্তব্য আমরা সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাই। তিনি বলেছেন,

"আল্লাহ সম্পর্কিত বিশ্বাসটি উন্নতির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে। এ চিন্তাধারাটি এখন আর কোনো উন্নতি গ্রহণ করতে পারবে না। বস্তুত মানুষ ধর্মের বোঝা বহন করার জন্য প্রকৃতির বাইরে একটি শক্তিকে আবিষ্কার করেছে। সে ধর্ম প্রথমে নিয়ে এসেছে জাদু, এরপর নিয়ে এসেছে আধ্যাত্মিক কার্যক্রম, এরপর নিয়ে এসেছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। পরিশেষে আবিষ্কার করেছে এক আল্লাহর চিন্তাধারা। এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধর্ম তার জীবনের শেষ স্তরে এসে পৌঁছেছে। নিঃসন্দেহে ধর্মের এ সকল বিশ্বাস এক সময় আমাদের সভ্যতার জন্য লাভজনক অংশ ছিল,

তবে সভ্যতার এ অংশসমূহ বর্তমান আধুনিক উন্নত সমাজে এর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলেছে।"[২২৪]

তারা এ পর্যন্ত বলেই থেমে যান নি। তারা আরো অগ্রসর হয়ে বলেন: পৃথিবীতে যে সব নামাবলী ও গুণাবলী প্রচলিত ছিল তা থেকে গ্রহণ করেই নাকি ধার্মিকগণ তাদের আল্লাহর নামাবলী ও গুণাবলী প্রদান করেছেন। পৃথিবীতে রাজাধিরাজ (الملك الأكبر) এ নামটি প্রচলিত ছিল, তাথেকেই তারা আল্লাহকে আকাশের রাজাধিরাজ নামকরণ করেছেন। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্বকোষের লেখক 'দ্বীন' সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন :

"অন্যান্য প্রভাব বলয়ের পাশাপাশি ধর্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাদির অংশ গ্রহণও অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আল্লাহর নামাবলী ও গুণাবলীসমূহ পৃথিবীর বুকে প্রচলিত অবস্থাদি থেকেই নির্গত হয়েছে। আল্লাহর রাজাধিরাজ (الملك الأكبر) হওয়ার এ বিশ্বাসটি মানুষের রাজাধিরাজ হওয়ারই অপর এক চিত্র। অনুরূপভাবে আকাশের রাজাধিরাজ পৃথিবীর রাজাধিরাজেরই অনুলিপি মাত্র। পৃথিবীর রাজা ছিলেন রাজাধিরাজ,

---

[224].ওয়াহিদ উদ্দিন খান, আল-ইসলামু ইয়াতাহাদ্দা; (কায়রো : আল-মাকতাবুল ইসলামী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩৮, ৩৯। ওয়াহিদ উদ্দিন খান এ কথাগুলো জুলিয়ান হেক্সলি প্রণীত Man in the Modern world এর ১৩১ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

ফলে এখেকে আল্লাহও এ সব গুণাবলী গ্রহণ করতে লাগলেন। আল্লাহকে সর্বশেষে বড় বিচারক (القاضي الأكبر الأخير) উপাধি দান করা হয়, যিনি মানুষকে তার ভাল-মন্দ কর্মের প্রতিদান দান করেন। আল্লাহর হিসাব গ্রহণকারী ও প্রতিদানকারী হওয়ার বিচারগত এ বিশ্বাস শুধু যে ইয়াহূদী ধর্মেই পাওয়া যায় তা নয়; বরং খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাসেও এ বিশ্বাসের মৌলিক অবস্থান রয়েছে।”[২২৫]

এ দু’জন লেখকের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা বলতে চান, বাস্তবে আদিতে মানুষের মাঝে ধর্ম ও আল্লাহর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এটি প্রাচীন কালের মানুষের তৈরী বৈ আর কিছুই নয়। তাদের ধারণা মতে, অতীতে মানুষেরা যখন ধর্ম ও আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করেছে, তখন তারা অসংখ্য আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল এবং এক আল্লাহের চিন্তাধারা হচ্ছে এ সম্পর্কিত চিন্তাধারার সর্বশেষ পরিণতি।

এ দু’জন এবং অন্যান্য আরো যারা এ জাতীয় দাবী উত্থাপন করেছেন, তাদের এ দাবী নিতান্তই ভ্রান্ত, মূল্যহীন ও বাস্তবতা বিবর্জিত। মুসলিমদের মাঝে যদি এ জাতীয় দাবীর অনুসারী কিছু মানুষ পাওয়া না যেতো এবং যে কোনো বিষয়ে মুক্ত চিন্তা

---

[225].তদেব। তিনি এ বক্তব্যটি Encyclopedia of Social Sciences, ১৯৫৭, এর ১৩খন্ড পৃষ্ঠা ২৩৩ থেকে গ্রহণ করেছেন।

প্রকাশের অধুনা স্বীকৃত অধিকারের দাবীতে এ জাতীয় দাবী যদি উত্থাপিত না হতো, তা হলে এ জাতীয় দাবী করার বিষয়টি আলোচনায় আনারই অযোগ্য বলে বিবেচিত হতো। এ জাতীয় দাবী যেহেতু ধর্ম এবং আল্লাহর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা থেকে উত্থাপিত হয়েছে, সেহেতু অংশীবাদের উপর একত্ববাদের অগ্রগণ্যতা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে ধর্ম ও আল্লাহর বাস্তবতা সম্পর্কে অন্যান্য বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের কি চিন্তাধারা রয়েছে, সে সম্পর্কে নিম্নে সামান্য কিছু আলোচনা করা হলো।

ধর্ম ও আল্লাহর বাস্তবতা :

ধর্ম ও আল্লাহ সম্পর্কে ফ্রান্সের সুবিখ্যাত দার্শনিক ও বর্তমান যুগের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ উইল ডুরান্ট বলেন :

“এ কথা সত্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো জাতির জীবনে বাহ্যত ধর্ম পরিলক্ষিত হয় না, আর কোনো আফ্রিকান বামন (Dwarf) জাতির সাধারণভাবে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা আচার-আচরণ ছিল না, এ অবস্থা অত্যন্ত বিরল। প্রাচীনতম বিশ্বাস চিরকাল এই ছিল যে, ধর্ম সুস্থ বিশ্বাস হিসেবে সমগ্র মানবতার মধ্যে প্রকাশমান ছিল এবং সমাজ দার্শনিকদের অভিমত এটাই

ছিল।"[২২৬]

তিনি এরপর লিখেছেন : "দার্শনিকগণ ধর্মীয় বিশ্বাসকে (একটি) প্রাচীনতম প্রকাশ ও চিরকালে অবস্থিত থাকার কথা বিশ্বাস করেন।"[২২৭]

মাওলানা আব্দুর রহীম এ প্রসংগে একটি চমৎকার কথা বলেছেন, তা হলো এই- "মানব জাতির বিগত হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এবং সভ্যতার উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করলে নিঃসন্দেহে জানা যেতে পারে যে, ধর্ম ও ধর্ম পালন মানুষের জীবন, সমাজ ও সভ্যতা গড়ার কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং তা মানুষের মৌল স্বভাবগত প্রবণতা, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনরূপে গণ্য হয়েছে। কালের আবর্তন ও অবস্থার পরিবর্তনে তাতে আজও একবিন্দু ব্যতিক্রম ঘটে নি।"[২২৮]

---

[226].মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, শির্ক ও তাওহীদ; (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২৫তম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ.৩২। তিনি এ-কথাগুলো 'ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সত্য' নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

[227].তদেব।

[228]. তদেব।

স্যামউল কোনিক নামের একজন খ্যাতনামা সমাজবিজ্ঞানীও প্রাচীন মানুষের জীবনে ধর্ম দৃঢ়ভাবে থাকার কথা অকৃত্রিমভাবে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন :

"প্রত্নতাত্ত্বিক খোদাই এর মাধ্যমে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে জানা যায় যে, বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষরা ধর্ম পালনকারী ও ধার্মিক ছিল। এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, তারা তাদের মৃত লাশ দাফন করত, সে জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করত, লাশের সাথে তারা তাদের কাজের যন্ত্রপাতিও দাফন করে দিত। এভাবে তারা তাদের এই জগতের পরে অবস্থিত আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস প্রমাণ করত।"[২২৯]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন : "এ সব মানুষ ধর্ম পালনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করত এবং প্রকৃতি ও উর্ধ্ব জগতের দিকে লক্ষ্যদানকে তাদের এক অপরিহার্য অংশরূপে মনে করত।"[২৩০]

দার্শনিক উইল ডুরান্ট ধর্ম প্রসঙ্গে আরো বলেন : "মানুষেরা প্রথম কাল থেকেই এই যে 'তাকওয়া' অবলম্বন করত- যাকে কোন জিনিষই মুছে ফেলে নি তার ভিত্তি কী ছিল? তিনি নিজেই

---

[229]. তদেব।

[230]. তদেব।

এর জবাব দিয়ে বলেছেন : গণক নতুন করে ধর্মকে সৃষ্টি করে নি, বরং সে তা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে মাত্র, যেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ঝোঁককে ব্যবহার করে। তা হলে বুঝা যায়, ধর্মীয় বিশ্বাস কৃত্রিমভাবে তৈরী হয়নি, তা পুরোহিতদেরও বানানো নয়, বরং তা মানুষের প্রকৃতি নিহিত তাকীদেই গড়ে উঠেছে।”[২৩১]

আমার মনে হয় ধর্মের বাস্তবতা ও মৌলিকতা প্রমাণের জন্য সমাজবিজ্ঞানীদের উপর্যুক্ত বক্তব্যের উদ্ধৃতিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এর দ্বারাই আমরা বুঝে নিতে পারি যে, ধর্মযাজকগণ সাধারণ জনগণকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য ধর্মকে তৈরী করে নি, অথবা সাধারণ মানুষেরাও ধর্মকে নিজেদের জীবনের কল্যাণার্জনে বা অকল্যাণ দূরীকরণের স্বার্থে এমনিতেই মিছেমিছি তৈরী করেনি। বরং ধর্ম ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস মানুষের একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার। যে দিন থেকে মানুষ এ পৃথিবীতে বসবাস করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই তারা এখানে ধর্ম পালন শুরু করেছে। মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই মানুষের মাঝে আল্লাহর একত্ববাদ ও ধর্মের প্রতি যে বিশ্বাস বিরাজমান রয়েছে, তা অহী লব্ধ দলীল প্রমাণাদির দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হলেও যেহেতু

---

[231]. প্রাগুক্ত; পৃ. ৩২, ৩৩।

অবিশ্বাসীরা তা বিশ্বাস করে না, তাই উক্ত বিষয়টি প্রমাণের জন্য অহী লব্ধ দলীলের বদলে অস্বীকারকারীদের চেয়েও আরো অধিক খ্যাতিমান সমাজবিজ্ঞানীদের উক্তির মাধ্যমে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হলো।

তাওহীদী বিশ্বাস কোন বিবর্তিত চিন্তার ফসল নয়:

সুদূর অতীতকাল থেকেই মানুষের মাঝে আল্লাহ ও ধর্মীয় বিশ্বাস বর্তমান থাকার সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণের পর এবার নিম্নে কতিপয় দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের কথার উদ্ধৃতি প্রদানের মাধ্যমে আমরা একথার প্রমাণ পেশ করবো যে, অনন্তকাল থেকেই মানুষের মাঝে আল্লাহর ব্যাপারে তাওহীদী চিন্তা ভাবনা বিরাজমান ছিল এবং এ বিষয়টি মানুষের মাঝে চিন্তার ক্ষেত্রে বিবর্তনের কোনো ফসল নয়।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আল-গাযালী[২৩২] এ প্রসঙ্গে বলেন : "মানুষের মধ্যে যে সকল নির্বোধরা এ ধারণা পোষণ করে যে, মেধা শক্তির আবদ্ধতা থেকেই নাকি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে, অথবা যারা বলে যে, মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অধিক পারদর্শিতা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মৌলনীতিকে

---

[232]. তিনি মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন ইসলামী দলের একজন প্রখ্যাত নেতা ও ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন।- লেখক

নড়বড়ে করে দেয় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে অতীব দুর্বল করে দেয়, তাদের এ জাতীয় ধারণা তাদের মূঢ়তা ও নির্বুদ্ধিতারই ফসল। এদের বুদ্ধিহীনতা প্রমাণের জন্য তিনি অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক ও আকাশবিদ স্যার উইলিয়াম হরসেল (Sir William Hershel)[২৩৩]-এর বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

হরসেল বলেছেন : ‘‘জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তৃত হবে ততই একজন অসীম শক্তিধর সৃজনশীল প্রজ্ঞাময়ের বর্তমান থাকার উপর প্রমাণাদি অধিক হতে থাকবে। ভূতত্ত্ববিদ, জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিজ্ঞানী ও গণিত শাস্ত্রবিদগণ তাদের বিবিধ প্রচেষ্টা ও আবিষ্কারের দ্বারা সৃষ্টিকর্তার কথা সমুন্নত করার জন্য একটি বিজ্ঞানাগার প্রস্তুত করতে যা প্রয়োজন, তা সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন’’।[২৩৪]

---

[233]. হারসেল একজন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ ছিলেন। ১৭৮১ সালে তিনি ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার করেন। টেলিসকোপও তাঁরই আবিষ্কার। ১৭৩৮ থেকে ১৮২২ সাল পর্যন্ত ছিল তাঁর যুগ।- লেখক

[234]. মুহাম্মদ আল-গাযালী, ‘আক্বীদাতুল মুসলিম; (কায়রো : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২২; ইনসাক্লোপেডিয়া ‘‘আজাদী’’, ‘ইলাহ’ শব্দমূল, ১ম খন্ড, পৃ. ৫০৩।

এর পর তিনি দার্শনিক সক্রেটিস[২৩৫] এর এ সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যা সক্রেটিস তাঁর ছাত্র প্লেটোকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সে পত্রের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব তাঁর একত্ববাদ এবং তিনিই যে এ জগত সৃষ্টি করেছেন, সে সবের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

সক্রেটিস লিখেছিলেন : "এ জগত আমাদেরকে প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, এখানে হঠাৎ করে অপরিকল্পিতভাবে কিছুই হয়ে যায় নি; বরং এর প্রতিটি অংশই একটি লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর এই লক্ষ্য তার চেয়েও উচ্চতর লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলেছে। এ ভাবে পরিশেষে একটি চূড়ান্ত একক লক্ষ্যের দিকে পৌঁছোনো যায়। জগতের এই পূর্ণাঙ্গ বিধান তার খুঁটিনাটিসহ কোথা থেকে তৈরী হলো, যা প্রতিটি দিক থেকেই মহত্ত্বের দ্বারা বেষ্টিত? হঠাৎ করে এমনিতেই হওয়াতো সম্ভবপর নয়। আমাদের পক্ষে যদি এ কথা বলা সম্ভব হয় যে, তা এমনিতেই তৈরী হয়েছে, তা হলে

---

[235]. তিনি একজন প্রখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৪৭১ সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে তিনি যে সব তাত্ত্বিক কথা-বার্তা বলেছেন, তা নবী ও রাসূলগণের কথার সাথে মিলে যায়। দেখুন : গংগোহী, মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ, **জাফারুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুআললিফীন**; (করাচী : দারুল এশা'আত, ১ম সংস্করণ, সন বিহীন), পৃ. ১৪১।

আমাদের পক্ষে এ কথাও বলা সঠিক হবে যে, নদীর বুকে ভাসমান নৌকার তক্তাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে।

আমরা যখন জগত পরিবেষ্টিত উপাদানগুলোর দিকে তাকাই, তখন তা পরিমাণে এতো বেশী দেখতে পাই যা বুদ্ধির দ্বারা সীমাবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। এ সব কিছু এমনিতেই হয়ে গেছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি না। এ জন্য একজন মহাজ্ঞানীর অস্তিত্ব মেনে নেয়া জরুরী হয়ে দাঁড়ায়...আর সে বুদ্ধিমান অস্তিত্বই হচ্ছে একক সৃষ্টিকর্তা। কারণ, প্রকৃতির সর্বত্রই এমন এক মহান সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদের নিদর্শন বিরাজ করছে যিনি চিন্তা করার সাথে সাথেই তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়ে যায়। তাতে ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার কোনই অবকাশ নেই।

তিনি উপস্থিত, সর্বজ্ঞাত ও সামর্থ্যবান, তা সত্ত্বেও তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা অসম্ভব...তাঁর দৃষ্টান্ত সূর্যের মত যা সমস্ত দৃষ্টিশক্তিকে স্পর্শ করে, অথচ সে কাউকে তার নিজেকে দেখার অধিকার দেয় না।”[২৩৬]

---

[236]. প্রাগুক্ত।

আল্লামা ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ সক্রেটিস সম্পর্কে বলেন :

"সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তাঁর মতামত আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী স্বীকৃতি দানকারীদের মতের কাছাকাছি ছিল। তিনি (সক্রেটিস) বলেছেন: "তিনি (সৃষ্টিকর্তা) সকল বস্তুর উপাস্য, সৃষ্টিকর্তা, নিরূপক ও পরাক্রমশালী। তাঁর উপর কেউ বিজয়ী হতে পারেনা। তিনি মহা বিজ্ঞানী। তাঁর জ্ঞান, শক্তি ও হিকমত এতই অসীম যে, তা বুদ্ধির দ্বারা ব্যক্ত করা যাবে না।

তিনি (সক্রেটিস) রাসূলগণকে স্বীকৃতি প্রদানের নিকটবর্তী ছিলেন। সৃষ্টির শুরু, পূনরুত্থান ও সৃষ্টিকর্তার গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য নবীগণের বক্তব্যের নিকটতম ছিল।"[২৩৭]

সক্রেটিসের শিষ্য দার্শনিক প্লেটোও (জন্ম খৃ.পূর্ব ৪৩০) একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি বলতেন :

"এ জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি অনাদি ও অনন্তকাল থেকে নিজ থেকেই আছেন। তিনি সকল জ্ঞানের আধার।"[২৩৮]

---

[237]. ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, এগাছাতুল লহফান ফী মাকাইদিস শয়তান; ২/২০৯, ২১০।

ইংরেজ বৈজ্ঞানিক স্পেন্সার (Spencer)[২৩৯]এ প্রসঙ্গে বলেন :

"আমরা এ কথার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য যে, এ মহা বিশ্বের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা প্রবাহ আমাদেরকে এমন এক মহাশক্তিমান সত্তার সন্ধান দেয়, যাঁকে অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ধর্মই সর্বপ্রথম এ সর্বশক্তিমান সত্তাকে গ্রহণ এবং মানব জাতিকে তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান দান করে।"[২৪০]

স্পেন্সার আরো বলেন : "বিজ্ঞান কুসংস্কারের বিরোধী, তবে ধর্মের বিরোধী নয়, পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম বিরোধী চেতনা পাওয়া যায়, তবে সঠিক বিজ্ঞান যা ভাসাভাসা জ্ঞানকে অতিক্রম করেছে এবং প্রকৃত জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করেছে, তা উপর্যুক্ত ধর্ম বিরোধী চেতনা থেকে মুক্ত। আর পদার্থ বিজ্ঞান ধর্ম বিরোধী নয়।"[২৪১]

যারা আল্লাহ ও ধর্মে বিশ্বাস করে না এবং জীব জগত এলোমেলোভাবে এমনিতেই সৃষ্টি ও উন্নতি লাভ করেছে বলে মনে

---

[238]. প্রাগুক্ত।

[239]. স্পেন্সার (Spencert, Herber, ১৮২০-১৯০৩) একজন বৃটিশ দার্শনিক । তিনি মনস্তত্ত্বও সমাজতত্ত্বের উপর বই লেখেন।- লেখক

[240]. মুহাম্মদ আল-গাযালী, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩।

[241]. আস-সাইয়্যিদ আস-সাবেক, প্রাগুক্ত ; পৃ. ৫০।

করে, ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন (Kelvin)[২৪২] তাদের সংগে বিদ্রূপ করেন এবং আল্লাহর বর্তমান থাকা এবং তাঁর একত্ববাদের উপর হিকমত ও প্রকৃতির বিধানের মাঝে যে সব অকাট্য দলীল প্রমাণাদি রয়েছে, কোন কোন বিজ্ঞানীদের এ সবের প্রতি কোনো দৃষ্টি না দেয়াতে তিনি আশ্চর্য বোধ করে বলেন : "মানুষের পক্ষে এ কথা কল্পনা করাই কঠিন যে, কোন পরিকল্পনাকারী, সৃজনশীল শক্তির বর্তমান থাকা ছাড়াই জীবনের আরম্ভ বা তা চলমান থাকতে পারে। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক জীব সম্পর্কিত তাদের তাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে এ জগতের বিধানসমূহে (সৃষ্টিকর্তার পরিচয়ের) যে সব অকাট্য প্রমাণাদি রয়েছে, তা তারা অস্বাভাবিকভাবে এড়িয়ে গেছেন। কারণ, আমাদের চারপার্শ্বে হাজারো রকমের অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত রয়েছে যা এক মহাশক্তিশালী ও কুশলী ব্যবস্থাপকের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। প্রকৃতির মাঝে বর্তমান এ সব দলীল আমাদেরকে এক স্বাধীন সার্বভৌম সত্তার সন্ধান দেয়। এই প্রমাণগুলো আমাদের বলে দিচ্ছে- প্রতিটি জীবই এক, অদ্বিতীয়

---

[242]. Kelvin William Thomson Lord (১৮২৪-১৯০৭ খ্রি.), তিনি একজন প্রখ্যাত ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন। লেখক

এবং চিরস্থায়ী মহান স্রষ্টার সৃষ্টি এবং সবাই তাঁরই উপর নির্ভরশীর।”[২৪৩]

বৈজ্ঞানিক নিউটন বলেনঃ “সৃষ্টিকর্তা বর্তমান থাকার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করো না; কারণ, আকস্মিক হওয়া একটি ঘটনা নিজ থেকেই এ সৃষ্টির মূল হওয়ার বিষয়টি কোনোভাবেই বুঝে আসার মত বিষয় নয়।”[২৪৪]

আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের সাথে বিদ্রূপ করে বিজ্ঞানী ফুলটির বলেন :

“আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ করছো কেন, তিনি যদি না থাকতেন, তবে আমার স্ত্রী আমার সাথে বেইমানী করতো, আমার খাদেম আমার সম্পদ চুরি করতো।”[২৪৫]

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আব্দুর রহীম (মৃত ১৯৮৭ খ্রি.) এ প্রসঙ্গে বলেন :

“বস্তুত দূর অতীতকাল থেকে মানব প্রকৃতির অধ্যয়ন চালালে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ধর্মবিশ্বাস মানব প্রকৃতির গভীরে

---

243. মুহাম্মদ আল-গাযালী, প্রাগুক্ত; পৃ.২৪।

244. হাসানুল বান্না, মাজমূ‘আতু রাসাইলিল ইমাম আশ-শহীদ; (বৈরুত : আল-মুআচ্ছাছাতুল ইসলামিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃ, ৩১৯।

245. ড. আমহদ শালাবী, মুক্বারানাতুল আদইয়ান; (কায়রো : মাকতাবাতুন নুহদাতিল মিসরীয়্যাহ, ৮ম সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৯৩।

নিহিত রয়েছে। মূল আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাসেও বস্তুর্ধ্ব জগতের প্রতি লক্ষ্য আরোপে কোনো বিরোধ কোনো দিনই ছিল না। বিরোধ দেখা গেছে এ বিশ্বাসের বিশেষত্ব ও পদ্ধতি পর্যায়ে মাত্র। তার অর্থ, মূল বিশ্বাসে অতীত কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোনো পার্থক্য বা বিরোধ দেখা দেয় নি, তার খুঁটিনাটি বিস্তারিত ব্যাপারের মধ্যেই বিরোধ সীমাবদ্ধ রয়েছে। তার অর্থ আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাসের ব্যাপারে বিশ্ব মানবতার যে পরম ঐক্য অর্জিত হয়েছে, তা চিরকাল ইতিহাসের প্রত্যেকটি পর্যায়েই লক্ষ্য করা যায়।”[২৪৬]

তিনি এ পর্যায়ে আরো বলেন : “বহু বিশেষজ্ঞই দাবী করেছেন যে, এই বিশ্বলোকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফুর্ত ব্যাপার। আর কুরআনের আয়াত থেকে এ সত্য উদঘাটন অতীব সুস্পষ্ট, সে জন্য কোনো যুক্তি-প্রমাণ অবতারণার আদৌ কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষভাবে কোনো চিন্তা-ভাবনা গবেষণারও কোনো আবশ্যকতা নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজ দার্শনিক থমাস কাবেল এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। থমাস বলেছেন :

---

[246]. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, শির্ক ও তাওহীদ; (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২৫তম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ.) পৃ. ৩৩।

"যাঁরা আল্লাহর অস্তিত্ব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, তাদের অবস্থা এ থেকে ভিন্নতর নয় যে, তারা আকাশে দৃশ্যমান সূর্যকে প্রদীপ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে মাত্র।"[২৪৭]

প্রকৃতকথা হচ্ছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তারা অপরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী। তারা এ ক্ষেত্রে যে সব ধারণার অনুসরণ করছে, পরিপক্ক জ্ঞানীদের নিকট সে সব ধারণার কোনই মূল্য নেই। তারা তাদের চিন্তা ও কথার দ্বারা আমাদেরকে আল্লাহর একথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ٨ ﴾ [الحج: ٨]

"মানুষের মাঝে এমনও কতক লোক রয়েছে যারা কোন জ্ঞান, প্রমাণ, ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে।"[২৪৮]

এ সব নাস্তিকদের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে- কোনো একটি বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় বা তার অস্তিত্ব থাকার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা যায় যদি তা প্রমাণের জন্য কোনো

---

[247]. তদেব।

[248]. আল-কুরআন, সূরা হজ্জ : ৮।

দলীল প্রমাণাদি না থাকে। আল্লাহর বর্তমান থাকার বিষয়টি তো সে পর্যায়ে পড়ে না; কারণ, তাঁর অস্তিত্বের যাবতীয় প্রমাণাদি চক্ষুষ্মানদের জন্য পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবাই মিলে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদেরই সাক্ষ্য প্রদান করছে। সে জন্য একজন কবি বলেছেন :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل

و في كل شيء لـــــــه آية * تدل على أنه الــــــــــواحد

"আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তুই বাতিল, সকল নেয়ামত অবশ্যই বিলীন হয়ে যাবে, প্রত্যেক বস্তুতেই রয়েছে তাঁর নিদর্শন, যা তাঁর একত্ববাদের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করছে।"

আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদের উপর অজস্র দলীল প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও যখন কিছু সংখ্যক চেতনাহীন মানুষ তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছে, সে-জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন :

﴿أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ﴾ [ابراهيم: ١٠]

"যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সে আল্লাহর ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ আছে।"[২৪৯]

---

[249]. আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম : ১০।

اللَّهُمَّ لا না, তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশের কোনই অবকাশ নেই। সন্দেহ পোষণকারীরা তাঁকে স্বীকার করুক আর না-ই করুক, তিনি অনন্তকাল থেকে আছেন, চিরকাল ধরেই থাকবেন।

পরিশেষে আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের বলবো : তারা যদি নিজেদের অস্তিত্বকে কোনো দিন সম্পূর্ণ অস্বীকার বা তাতে কোনো সন্দেহ পোষণ করতে পারে, তা হলে তারা আল্লাহর ব্যাপারেও তা করতে পারে- আর তা যদি না পারে এবং অবশ্যই তারা তা কস্মিনকালেও পারবে না- তা হলে তাদের পক্ষে আল্লাহকে শুধু স্বীকার করাই উচিত নয়, তাঁকে স্বীকার করে নেয়ার পাশাপাশি তাঁকে ভয় করাও উচিত। তারা যেন তাদের নিজেদের মধ্যে একটু লক্ষ্য করে; কারণ, তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যেই তাঁর অস্তিত্বের প্রচুর প্রমাণপঞ্জী বিদ্যমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٢١ ﴾ [الذاريات: ٢١]

"তোমাদের নিজেদের মধ্যেও আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে, তবুও কি তোমরা তা লক্ষ্য করবে না।"[২৫০]

তারা যেন তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে নিহিত আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শনাদির প্রতি লক্ষ্য করে অন্যান্যদের মত

---

[250]. আল-কুরআন, সূরা যা-রিয়াত : ২১।

আল্লাহকে স্বীকার করে নেয়। এইতো পরমাণু বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ, প্রাণী বিজ্ঞানী ও গণিতশাস্ত্রবিদগণ অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁদের কাছে অনেক দলীল প্রমাণাদি রয়েছে যা এমন এক মহান অস্তিত্বের প্রমাণ করে, যিনি এই সৃষ্টি জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও করুণার দ্বারা অত্যন্ত যত্নের সাথে তা পরিচালনা করছেন।[২৫১]

এ ছাড়া তাদের পূর্বে বিজ্ঞানের জনক সক্রেটিস ও প্লেটো যেখানে আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদের কথা অকপটে স্বীকার করে গেছেন, সেখানে তাদের অস্বীকৃতিতে অল্লাহর কিছুই যায় আসে না। বরং এতে তাঁকে অস্বীকারকারীদেরই মার্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

জগত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের স্বীকৃতি দ্বারা আল্লাহ ও ধর্মের সত্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার পর এবার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাবো। আর তা হলো-

---

[251]. মুহাম্মদ আল-গাযালী স্বীয় আক্বীদাতুল মুসলিম গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় এ-তথ্যটি বর্ণনা করেছেন। যা রয়টার সংবাদ সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে মিসরের কোনো এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সৃষ্টির সূচনালগ্নে মানুষেরা কোন্ চিন্তায় বিশ্বাসী ছিল?

এ প্রশ্নের জবাবে বলবো : হ্যাঁ, মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম তাওহীদী চিন্তা-ভাবনাই বিরাজমান ছিল। এ বিষয়টি আমরা ঐশী বাণী ও যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করতে পারি।

ঐশী প্রমাণাদি :

আমাদের নিকট কুরআন ও হাদীসের প্রচুর প্রমাণাদি রয়েছে যা এ কথারই সত্যতা প্রমাণ করে। আর কেমন করেই বা তা হবে না! কারণ; এ কথাতো কোনভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না যে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করবেন, অতঃপর তাদেরকে কোনো প্রকার হেদায়াত না দিয়েই লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেবেন। ফলে তারা যা ইচ্ছা চিন্তা করবে! কে তাদের সৃষ্টি করলো, কেনইবা করলো, কোথায় তাদের প্রস্থান? এ সব বিষয়ে তাদেরকে কিছুই না জানিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?

কুরআনুল কারীম আমাদেরকে এ কথার প্রমাণ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা‘আলা মানব সৃষ্টির সূচনাতেই তাদের প্রকৃতিতে তাঁর পরিচয়ের ব্যাপারটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে প্রোথিত করে দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর পরিচয়ের উপর তাদের নিকট থেকে শক্ত প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٠ ﴾ [الروم: ٣٠]

"তুমি নিজেকে একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো, এটাই আল্লাহর নিকট গৃহীত প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা তা জানে না।"[২৫২]

এ আয়াতে (فطر الناس عليها) এ বাক্যের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা দ্বীন গ্রহণ ও তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদানের যোগ্য করে মানুষকে সৃষ্টি করার কথাই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি দানের উপর তাদের নিকট থেকে গৃহীত প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে বলেছেন :

﴿ وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَأَشۡهَدَهُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنۡ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ١٧٢ ﴾ [الاعراف: ١٧٢]

"আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং তাদেরকে এ প্রতিজ্ঞা করালেন যে, আমি কি তোমাদের

---

[252]. আল-কুরআন, সূরা রূম : ৩০।

পালনকর্তা নই? তারা সকলেই বললো : হ্যাঁ, আপনি আমাদের পালনকর্তা, আমি তোমাদের এ প্রতিশ্রুতির উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম যাতে কেয়ামতের দিন তোমরা এ কথা বলতে না পারো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।”[২৫৩]

অনুরূপভাবে কুরআনুল কারীম আমাদেরকে আরো বলে দিচ্ছে যে, প্রথম মানব আদম ও হাওয়া ‘আলাইহিস সালাম মানব প্রকৃতির সে বিধান মোতাবেক তাঁদের প্রতিপালকের তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করতেন। সে জন্যেই তাঁরা দু’জনে জান্নাত থেকে বেরিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করার পর তাঁদের প্রতিপালকের নিকট তাঁদের অপরাধকে স্বীকার করেছিলেন এবং এককভাবে কেবল তাঁরই নিকট তাঁদের কৃত অপরাধের জন্য মার্জনা কামনা করেছিলেন। তাও আবার এমন কিছু বাক্য পাঠ করার মাধ্যমে, যা তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই এই বলে দু‘আ করেছিলেন :

﴿رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٢٣﴾ [الاعراف: ٢٣]

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের প্রতি জুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে মার্জনা না করেন এবং আমাদের

---

253. আল-কুরআন, সূরা আ‘রাফ : ১৭২।

প্রতি দয়া না করেন, তা হলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবো।”[২৫৪]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম যদি তাঁদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর তাওহীদ সম্পর্কে অবগত না হতেন, তা হলে তাঁরা 'হে আমাদের প্রতিপালক' (ربنا) বলে এ ভাবে এককভাবে তাঁরই নিকট তাঁদের অপরাধের স্বীকৃতি ও তা মার্জনার জন্য তাঁকে আহ্বান করতেন না।

আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম যখন তাঁদের একক প্রতিপালককে চিনতেন ও জানতেন, তখন স্বাভাবিক অবস্থার দাবী হচ্ছে তাঁরা এ বিষয়টি তাঁদের সন্তানদেরকেও অবহিত করে থাকবেন। এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলা যে সকল মানুষের রূহের নিকট থেকে তাঁর পরিচিতির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, তা তো আমরা একটু আগেই অবগত হয়েছি। মানুষকে যে আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত সে প্রতিশ্রুতির উপরেই সৃষ্টি করা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»

---

254. আল-কুরআন, সূরা আরাফ : ২৩।

"প্রত্যেক সন্তানই তাঁর প্রতিপালক আল্লাহর স্বীকৃতি দানের প্রকৃতির উপরেই জন্মলাভ করে, অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজকে পরিণত করে।"[২৫৫]

প্রথম মানুষ আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম যখন আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, সে সময় যখন অপর কোনো ধর্ম ছিল না, কোনো কিছুতে বিকৃতিও যখন একদিনে হয় না, তখন সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত আদম সন্তানরা যে তাওহীদী বিশ্বাসের উপরেই থাকবে, এটাই যুক্তি ও বাস্তবতার দাবী। কুরআনুল কারীম থেকেও এ যুক্তি ও বাস্তবতার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [البقرة: ٢١٣]

"মানুষেরা (প্রথমে একই চিন্তা লালনকারী) একই জাতিভুক্ত ছিল। অতঃপর (তারা বিভক্ত হয়ে গেলে) আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেন।"[২৫৬]

---

[255]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল কদর, বাব নং:৫, হাদীস নং ২৬৫৮; ৪/২০৪৭; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ২/২৫৩।

[256].আল-কুরআন, সূরা বাক্কারাহ : ২১৩।

এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন :

«كَانَ بَيْنَ نُوْحٍ وَ آدَمَ عَشَرَةُ قُرُوْنٍ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيْعَةِ الْحَقِّ فَاخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ»

"আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম-এর মধ্যকার দশ যুগ বা প্রজন্মের সকলেই সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, অতঃপর তারা ধর্মীয় বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়, ফলে তাদেরকে সত্য ধর্মের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীস্বরূপ প্রেরণ করেন।"[২৫৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যা বলেছেন তার সত্যতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَ نُوْحٍ عَشَرَةُ قُرُوْنٍ كُلُّهُمْ عَلَى الإِسْلاَمِ»

---

[257].আত-ত্ববারী, আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর, **জামিউল বয়ান ফী তাফছীরিল কুরআন**; (বৈরুত : দ্বারুল ফিকর, সংস্করণ বিহীন, ১৪০৫হি:), ২/৩৩৪; আন-নীসাপুরী, আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, **আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন**; (বৈরুত : দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.), ২/৫৯৬।

"আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম-এর মধ্যবর্তী দশ যুগ বা প্রজন্ম পর্যন্ত সবাই ইসলামের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।"[২৫৮]

---

[258]. আত-ত্ববারী, প্রাগুক্ত; ২/৩৩৪; আল-হাকিম, প্রাগুক্ত; ২/৫৯৬; ইমাম হাকিম বলেন : ইমাম বুখারীর শর্তানুযায়ী এ হাদীসটি সহীহ। ইমাম জাহাবীও তাঁর এ মতকে সমর্থন করেছেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে 'ঊফী কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি হাদীস রয়েছে। তাতে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন :

كان الناس أمة واحدة، يقول : كفارا...

'মানুষেরা সকলেই এক জাতি ছিল। এ বাক্যের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন : তারা সকলেই কাফির ছিল..., এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়; কারণ, 'ঊফী একজন দুর্বল বর্ণনাকারী, তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। ইমাম ইবন কাছীর বলেন : ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত প্রথম বক্তব্যটি সনদ ও অর্থের দিক থেকে বিশুদ্ধ কারণ, প্রতিমা পূজার পূর্ব পর্যন্ত মানুষেরা সকলেই আদম আলাইহিস সালামের ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। মূর্তি পূজা শুরু হলে অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। ফলে তিনি পৃথিবীর জনগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত প্রথম রাসূল ছিলেন। দেখুন : **তাফছীরুল কুরআনিল 'আযীম**; ১/২৫০; ইবন কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ ও ইবন কাছীর এর কথাটি সঠিক হওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। দেখুন : ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, **এগাছাতুল লহফান**; ২/১৬০।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যে একনিষ্ঠ তাওহীদের উপরেই সৃষ্টি করেছেন, তা নিম্নোক্ত হাদীসে কুদসীর দ্বারাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

«إِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيْطَانُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوْا بِيْ مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا»

"আমি আমার বান্দাদের সকলকেই একনিষ্ঠ তাওহীদে বিশ্বাসী করেই সৃষ্টি করেছি, শয়তান এসে তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছে, আমি তাদেরকে যা হালাল করেছিলাম সে তা তাদেরকে হারাম করেছে, আমি যে শির্ক করার ব্যাপারে কোনো দলীল অবতীর্ণ করি নি, আমার সাথে সে শির্ক করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ করেছে"।[২৫৯] উপর্যুক্ত এ সব আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে পরবর্তী দশ যুগ বা প্রজন্ম পর্যন্ত তাঁর সন্তানরা তাওহীদী চিন্তা চেতনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং অংশীবাদী চিন্তা-ভাবনা তাদের মধ্যে প্রথম দশ যুগ বা প্রজন্মের পরের মানুষের মাঝে অনুপ্রবেশ

---

[259]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জান্নাতি..., বাব নং ১৬, হাদীস নং ২৮৬৫, ৪/২১৯৭; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ৪/১৬২।

করেছে, যা সংশোধনের নিমিত্তে আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালামকে প্রথম রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

যৌক্তিক প্রমাণ :

এটা কোনো যৌক্তিক কথা হতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করার পর কিছুকাল পর্যন্ত তাঁকে তাঁর সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না দিয়েই ফেলে রাখবেন; ফলে আদম এ ব্যাপারে যা খুশী চিন্তা করতে থাকবে এবং যাকে মনে হয় তাকে তাঁর রব ও উপাস্য বানিয়ে নেবে। অনুরূপভাবে এ কথাও বিবেক সম্পন্ন হতে পারে না যে, আদম আলাইহিস সালাম নিজে তাঁর প্রতিপালককে চিনবেন ও জানবেন, অথচ তিনি তাঁর সন্তানদেরকে এ ব্যাপারে কিছুই বলবেন না; কারণ, পিতা সর্বদাই তার সন্তানকে সে উপদেশই দিয়ে থাকেন যা তার সন্তানদের জন্য একান্ত উপকারী। নিজের প্রতিপালকের পরিচয় জানা যেহেতু সকল উপকারের চেয়ে বড় উপকারের কথা; সেহেতু আদম আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তানদেরকে যে এ বিষয়টি জানিয়ে থাকবেন, তা অন্তত নিশ্চিত করে বলা যায়।

প্রকৃতকথা হচ্ছে, যারা অংশীবাদের উপর একত্ববাদের প্রচলন হওয়ার দাবী উত্থাপন করে থাকেন, তারা তাদের

ধারণানুযায়ী বিবর্তনবাদের নীতির বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করেই এ দাবী উত্থাপন করে থাকেন। তারা বলেন :

"এক আল্লাহ সম্পর্কিত মতবাদটি মূলত একাধিক আল্লাহর চিন্তার বিবর্তিত একটি উন্নত রূপ, তবে এ বিবর্তনটি তার সরল পথ হারিয়ে একটি অজানা পথের দিকে অগ্রসর হওয়ার ফলে তা জ্ঞানীদেরকে হয়রানির মাঝে ফেলে দিয়েছে, যেমনভাবে তা একাধিক আল্লাহ এর চিন্তা থেকে এক আল্লাহর চিন্তায় ভ্রান্তভাবে বিবর্তিত হওয়ার কারণে নিজেকে একটি বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে দিয়েছে। একাধিক আল্লাহর ধারণা একটি সামাজিক মূল্যবোধ বহন করতো, যার পরিণতি ছিল বিভিন্ন আল্লাহতে বিশ্বাসীগণ পারস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমে তারা নিরাপদে ও শান্তিতে বসবাস করবে; কিন্তু এক আল্লাহর চিন্তা সর্বোচ্চ ধর্মের মতবাদ সৃষ্টি করার ফলে এ সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়েছে। এ মতবাদের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মাঝে এমন সব অকল্যাণকর যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হয়েছে, যার কোনো শেষ নেই। এক আল্লাহর ধারণাটি এভাবে উল্টো দিকে বিবর্তিত হওয়ার ফলে নিজেই নিজেকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আর এ ধরনের বিবর্তনকেই বিবর্তনবাদ বলা হয়।"[২৬০]

---

[260]. ওয়াহীদ উদ্দিন খাঁন, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫১-৫২। তিনি এ কথাগুলো Man of the modern world বই এর ১১২ পৃষ্টা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

আল্লামা ওয়াহীদ উদ্দিন খান[২৬১] তাদের এ চিন্তাধারার প্রতিবাদ করে বলেন :

“আমরা কিন্তু কার্যত এ ক্ষেত্রে মূল বাস্তবতাকে এড়িয়ে চলেছি। সর্বজনবিদিত ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করছে যে, সকলেরই এ কথা জানা যে, প্রথম প্রেরিত পুরুষ [রাসূল] ছিলেন নূহ আলাইহিস সালাম, আর তিনি জনগণকে এক আল্লাহর দিকেই আহ্বান জানাতেন। অনুরূপভাবে আমরা আরো জানি যে, একাধিক আল্লাহর মধ্যে সকলেই এক পদমর্যাদার ছিলেন না, যার অর্থ দাড়ায়: মানুষেরা বড় ইলাহ এর সাথে অন্যান্য (ছোট) ইলাহদের শরীক করে নিয়েছিল এ উদ্দেশ্যে যে, তারা (ছোট ইলাহরা) তাদেরকে বড় ইলাহ এর নিকটতম করে দেবে, তাদের জন্য দু‘আ ও শাফা‘আত করবে। এ সকল মৌলিক বিষয়াদি বর্তমান থাকার ফলে বিবর্তনবাদের মতবাদটি একটি প্রমাণবিহীন দাবীতে পরিণত হয়ে যেতে বাধ্য।”[২৬২]

এর পর তিনি বিবর্তনবাদ সম্পর্কে স্যার আরসর কীস এর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেছেন :

---

[261]. ঊনিশ শতকে ভারতের একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ।

[262]. তদেব।

"বিবর্তনবাদের মতবাদটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয় এবং দলীল প্রমাণাদি দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণ করারও কোনো উপায় নেই। তা সত্ত্বেও আমরা এ মতবাদে বিশ্বাসী কেবল এ জন্যে যে, এতে বিশ্বাস না করলে আমাদের সামনে সরাসরি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। অথচ আমাদের পক্ষে এ বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন চিন্তা করাও সম্ভবপর নয়।"[২৬৩]

আমরা পশ্চিমা এ চিন্তাবিদের বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম যে, তারা মূলত ধর্মের চিন্তা থেকে পলায়ন করার জন্যেই এ বিবর্তনবাদের মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছে। এটি যে একটি প্রমাণিত সত্য মতবাদ, সে জন্যে নয়।

বিবর্তনবাদের মতবাদটি যখন স্বয়ং এর প্রবক্তাদের নিকটেই সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য নয়, তখন এ ভ্রান্ত মতবাদের উপর নির্ভর করে কী করে এ কথা বলা যায় যে, পৃথিবীতে মানুষের সূচনা লগ্নে তাওহীদের পূর্বে অংশীবাদ এর প্রচলন ছিল। না, কস্মিনকালেও তা বলা ও বিশ্বাস করা যায় না। প্রকৃত কথা হলো: এ মতবাদে বিশ্বাসীরা মূলত ধর্ম থেকে পলায়নের জন্যেই এ

---

[263]. তদেব। এ বক্তব্যটি তিনি একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যা Islamic thought পত্রিকায় ডিসেম্বর ১৯৬১ খ্রি. প্রকাশিত হয়েছে।

ধরনের দাবী উত্থাপন করেছে মাত্র, যেমনটি আমরা স্যার আরসর কীস এর বক্তব্যের দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই বুঝতে পারলাম।

সর্বশেষে এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু যাহরাহ[২৬৪] এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গের ইতি টানবো। তিনি এ প্রসঙ্গে বলছেন :

"ব্রাহ্মণ (হিন্দু) ধর্ম অতি প্রাচীন হওয়ায় তা ইতিহাসের গভীর থেকে গভীর পরতে প্রবেশ করেছে। এ ধর্মের অনুসারীরা প্রারম্ভে জগত ও এর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী একটি শক্তির উপাসনা করতো, এর একত্ববাদেও তারা বিশবাস করতো, যদিও সে শক্তিকে তারা ইসলামী পরিভাষার ন্যায় আল্লাহ বলে নামকরণ করতো না এবং সেটাকে ঠিক সে ধরনের একক বলেও বিশ্বাস করতো না যেমনভাবে মুসলিমরা আল্লাহর ব্যাপারে বিশ্বাস করেন। অতঃপর তারা সে শক্তিকে দেহ সর্বস্ব করে নেয় এবং কোনো কোনো দেহে তা প্রবেশ করেছে বলেও বিশ্বাস করে। যার পরিণতিতে তারা মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়। এতে তাদের দেবতাদের সংখ্যা একাধিক হয়ে গিয়ে তেত্রিশটি দেবতায় পৌঁছায়। এরপর

---

[264]. ইমাম আবু যাহরাহ বিংশ শতাব্দির শেষার্ধের একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে বিশেষ করে ইসলামকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে তাঁর বহু লিখনী প্রকাশিত হয়েছে ।- লেখক।

তাদের বিশ্বাসে আরো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়ে পরিশেষে তাদের দেবতা তিন অংশের মাঝে সীমাবদ্ধ হয় :[২৬৫]

১. ব্রহ্মা (পরমেশ্বর) : তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতার ব্রহ্মা নামের এ অংশই হলো সৃষ্টিকর্তা ও জীবনদাতা। এটি এমন শক্তি যে, সকল বস্তু এখেকেই জন্ম লাভ করে, সকল জীব-জন্তু তারই দয়া কামনা করে থাকে। সূর্যের সম্পর্ক রয়েছে তারই সাথে যার ফলে তাপ অর্জিত হয়, দেহসমূহ জীবনী-শক্তি লাভ করে এবং তাদের ধারণামতে জীব ও তরুলতায় এর কারণেই জীবন প্রবাহিত হয়ে থাকে।

২. শিব : তাদের ধারণামতে দেবতার এ অংশের কাজ হলো সবকিছু ধ্বংস করা। এর কারণেই সবুজ পাতা হলুদ বর্ণ হয়, যৌবনের পর বার্ধক্য আসে।

---

[265]. **তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন :**

ومنشأ الوثنية في الديانة البرهمية أنهم كانوا يعبدون القوى المؤثرة في الكون وتقلباته في زعمهم، ثم لم يلبثوا أن جسدوا تلك القوى، بأن اعتقدوا حلولها في بعض الأجسام، فعبدوا والأصنام لحلولها فيها، و تعددت آلهتهم حتى وصلت إلى ثلاثة و ثلاثين إلها = ثم عرا عقائدهم التغيير والتبديل حتى انحصر الآلهة في ثلاثة أقانيم، وذلك أنهم توهموا أن للعالم ثلاثة آلهة...إلى آخر ما قال.

ইমাম আবু যাহরাহ, **মুকারানাতুল আদইয়ান**; (কায়রো : দারুল ফিকরিল ‘আরাবী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২৩।

৩. বিষ্ণু : তাদের বিশ্বাস মতে দেবতার এ অংশ সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে থাকে। এরই কারণে জগত পূর্ণাঙ্গভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

তাদের ধারণামতে এ তিন দেবতা এক দেবতার অংশ বিশেষ, আর সেই এক দেবতা হলেন মহাত্মা (الروح الأعظم), তাদের ভাষায় যার নাম হলো 'আতমা' বা 'আত্মা'।

পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী একটি অতি প্রাচীনতম জাতির যদি আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা হয়, তা হলে আমরা কী করে সে লোকদের দাবী সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি যারা বলে যে, এক আল্লাহর বিশ্বাসের পূর্বে মানুষের মাঝে একাধিক আল্লাহর বিশ্বাসই প্রচলিত ছিল।"[২৬৬]

অবশেষে বলবো : পৃথিবীতে মানুষের সূচনা লগ্নে আল্লাহ সম্পর্কিত তাদের চিন্তাধারায় তাওহীদী চিন্তা-ভাবনা থাকার পরিবর্তে তাদের মাঝে অংশীবাদী চিন্তা-ভাবনা থাকার এ ধারণাটি সঠিক নয়; কেননা, তা কোনো প্রামাণ্য দলীল প্রমাণাদির উপর নির্ভরশীল নয়। যারা এই ধারণার অনুসারী তারা মূলত আল্লাহ ও ধর্মকে অস্বীকার করার জন্যেই এ আওয়াজ উঠিয়েছেন। এ সব

---

[266]. তদেব; পৃ. ১৯-২৪।

লোকদের আল্লাহ ও ধর্মকে অস্বীকার করার পিছনে যে কারণ রয়েছে, সেটিকে মোট তিনভাবে চিহ্নিত করা যায় :

১. ধর্মের প্রতি একপেশে দৃষ্টি দান করার ফলে তারা ধর্মকে বাঁকা দেখতে পেয়েছেন।

২. তারা প্রচলিত সকল ধর্মগুলোকে একপাত্রে রেখে মূল্যায়ন করেছেন, তাই সকল ধর্মই তাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা বলে মনে হয়েছে। তারা যদি ইসলামকে নিয়ে পৃথকভাবে ভাবতেন, তা হলে এর সত্যতা তাদের কাছে প্রমাণিত হতো।

৩. তারা ধর্ম ও আল্লাহর অস্বীকৃতির এ-দাবী উত্থাপন করেছেন তাদের নিজ নিজ দেশে অবস্থিত গির্জাসমূহের কর্তৃত্ব ও এর জুলুমের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। এ অস্বীকৃতি মূলত কোনো সত্য প্রাপ্তি ও তা প্রচারের জন্যে নয়।

অতএব এ কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায় যে, পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষের সময় থেকেই মহাবিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী এক আল্লাহর বিশ্বাসই মানুষের মাঝে বিরাজমান ছিল। বিভিন্ন কারণবশত পরবর্তী সময়ে মানুষের মাঝে তাওহীদী ধ্যান-ধারণার স্থলে অংশীবাদী ধ্যান-ধারণা অনুপ্রবেশ করেছে। তা সত্ত্বেও কারো পক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণ করা সম্ভব হবে না যে, মানুষেরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছিল, মর্যাদার দিক থেকে তারা

তাদেরকে আল্লাহর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান বা তাঁর সমতুল্য মনে করতো, বরং বাস্তব অবস্থা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তারা তাদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করেছিল যে, এরা তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেওয়ার মাধ্যম ও শাফা'আতকারী। সুদূর অতীত ও তৎপরবর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে এ তথ্যই প্রমাণিত হয়েছে। তাই এ কথা বলা যায় যে, তাওহীদের পূর্বে মানুষের মাঝে অংশীবাদের প্রচলন ছিল বলে যারা দাবী করেন, তাদের এ দাবী সম্পূর্ণভাবে কল্পনাপ্রসূত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সর্বপ্রথম কোন্ জাতি শির্কে লিপ্ত হয়?

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার প্রক্কালে তাঁর সন্তানদেরকে তিনি সঠিক ধর্মের উপরেই একই মুসলিম জাতিভুক্ত রেখে গেছেন। তখন তাদের ধর্ম ছিল এক ও অভিন্ন এবং মহান আল্লাহই ছিলেন তাদের একক রব ও উপাস্য। তাদের মাঝে এ অবস্থা পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। কালের পরিক্রমায় যখন তাদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষার অবনতি ঘটে, তখন তাদের চির শত্রু শয়তান তাদের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে যেভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল ঠিক সেভাবেই সে তাদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল এবং অবশেষে তাদেরকে মু'মিন ও মুশরিক দু'টি দলে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ۚ﴾ [يونس: ١٩]

"মানুষেরাতো (ধর্মের দিক থেকে প্রারম্ভে) একই জাতিভুক্ত ছিল, অতঃপর তারা (এ ক্ষেত্রে) মতবিরোধে লিপ্ত হয়।"[২৬৭]

---

267. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ১৯।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষেরা দীর্ঘ এক সময় পর্যন্ত একই ধর্ম ও একই বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীতে তাদের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদের সূত্রপাত হয়। এতে কিছু লোক পূর্বের ন্যায় তাওহীদী বিশ্বাসের উপরেই বহাল থাকে, আর কিছু লোক সে বিশ্বাসের পরিপন্থী কর্মে লিপ্ত হয়। আমরা হাদীস দ্বারা অবগত হয়েছি যে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দশ যুগ বা প্রজন্মের সকল লোক ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত হাদীসে বর্ণিত 'আশারাতু ক্বুরুন' এর অর্থ এক হাজার বছরও হতে পারে, আবার দশ প্রজন্মের লোকও হতে পারে। তবে 'আল-ইসলাম' শব্দের দ্বারা এ যুগকে সীমাবদ্ধ করাতে প্রথম অর্থই অগ্রগণ্য বলে মনে হয়। কারণ, এতে মনে হয় যে, মানুষেরা এ সময়সীমা পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম এর মাঝে পরবর্তী আরো অনেক যুগ রয়েছে যাতে সকল লোকেরা ইসলামের উপর একমত ছিল না; বরং পরবর্তীতে তারা মু'মিন ও কাফির এ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে তাদেরকে সংশোধনের জন্যে প্রথমে আল্লাহ তা'আলা ইদ্রীস আলাইহিস সালাম-কে তাদের নিকট নবী হিসেবে প্রেরণ

করেছিলেন[268]। এরপর প্রথম রাসূল হিসেবে শরী'আত দিয়ে নূহ আলাইহিস সালাম-কে তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

'কুরুন' 'قرون' শব্দটিকে কুরআন ও হাদীসে প্রজন্মের অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন আল্লাহ বলেন :

﴿ وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِنَ ٱلۡقُرُونِ مِنۢ بَعۡدِ نُوحٖۗ ﴾ [الاسراء: ١٧]

"আর আমি অনেক প্রজন্মের মানুষদেরকে ধ্বংস করেছি নূহ এর পরে।"[২৬৯]

এ আয়াতে 'قرون' শব্দ দ্বারা প্রজন্মই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অনুরূপভাবে (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ) "আমার যুগের মানুষেরা সর্বোত্তম

---

[268] ইদ্রিস আলাইহিস সালাম এর প্রেরণকাল, তিনি নবী কিংবা রাসূল ছিলেন, এ সম্পর্কে কুরআন বা হাদীস থেকে বিস্তারিত পওয়া যায় না। যদিও ঐতিহাসিকগণ তাকে 'আখনূখ' বলেছেন এবং আদম ও নূহ আলাইহিমাস সালামের মধ্যবর্তী সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন বলেছেন, কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন তিনি এবং ইলিয়াস আলাইহিস সালাম একই ব্যক্তি। সে হিসেবে তিনি বনী ইসরাইলের একজন নবী। আদম ও নূহ এর মাঝখানে তিনি প্রেরিত হন নি। এর আরও একটি যৌক্তিক কারণ হচ্ছে, তিনি যদি আদম ও নূহ এর মাঝখানে এসে থাকবেন তবে নিশ্চয় সেখানে শির্ক হয়ে থাকবে, যা উপরোক্ত হাদীসের বিপরীত। কারণ, রাসূল প্রেরিত হওয়ার জন্য সর্বজন গৃহীত শর্ত হচ্ছে, তাদের উম্মতের মধ্যে ঈমানদার ও কাফের উভয় শ্রেণি থাকবেন। তবে যদি তাঁকে কেবল নবী বলা হয়, সেটা ভিন্ন কথা। [সম্পাদক]

[269]. আল-কুরআন, সূরা ইসরা : ১৭।

মানুষ’’[২৭০] এ-হাদীসেও ‘ক্বরন’ (قرن) শব্দটি প্রজন্মের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর হাদীসে বর্ণিত ‘ক্বুরূন’ (قرون) শব্দটি প্রজন্মের অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে ‘সময়’ এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। হাদীসের বাহ্যিক অর্থের দ্বারা যদিও এ কথা মনে হয় যে, আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম-এর মধ্যে মোট এক হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং এ সময়ের সকল লোকেরা মুসলিম ছিল; কিন্তু এ বাহ্যিক অর্থটি ইতিহাস ও বাস্তবতার সাথে খাপ খায় না। কেননা, বাস্তবতা এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, একটি জাতির মধ্যে বিভ্রান্তি হঠাৎ করে এসে যায় না, বরং তা ধীরে ধীরে হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলাও কোনো জাতির বিভ্রান্তির প্রথম অবস্থাতেই নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন না। এমতাবস্থায় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে বলতে হবে যে, মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে নূহ আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকেই এবং আল্লাহ তাঁকে তাঁর জাতির বিভ্রান্তির প্রারম্ভেই রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যদিও তা বাস্তবতা বহির্ভূত।

---

[270]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু ফাদাইলিস সাহাবাহ; ৩/৫/১৬৩; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ১/৩৭৮।

এ দিকে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের দ্বারা মূর্তিপূজার কারণে যখন তাদের কুফরী কার্যকলাপ চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের নিকট ইদ্রীস আলাইহিস সালাম-কে নূহ আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এসে তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান জানালে তারা তাঁকে অস্বীকার করে, ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে (ইদ্রীস আলাইহিস সালাম) মর্যাদাপূর্ণ স্থানে উঠিয়ে নেন।[২৭১] এ ইতিহাসও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর হাদীসের বাহ্যিক অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কারণে আমরা এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস দ্বারা আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম এর মধ্যকার মোট সময় নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য করা হয় নি;বরং এর উদ্দেশ্য সে সময়সীমা বর্ণনা করা যে সময়ের মধ্যে সকল লোকেরা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যদিও তাঁদের উভয়ের মাঝে এ সময়সীমার বাইরে আরো অনেক সময় ছিল, যাতে লোকেরা ইসলাম তথা তাওহীদের উপর একমত ছিল না।

---

[271]. ইবনুল জাওযী, আবুল ফরজ আব্দুর রহমান, **তলবীসে ইবলীস**; (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৬৩-৬৪।

তবে ইমাম ইবন হিববান তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গৃহীত হওয়ার সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটি নিম্নরূপ:

«أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَ نَبِيٌّ كَانَ آدَمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ مُكَلَّمٌ . قَالَ: فَكَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نُوْحٍ؟ قَالَ : عَشَرَةُ قُرُوْنٍ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আদম কি নবী ছিলেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "হ্যাঁ, তিনি এমন একজন নবী ছিলেন যার সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন।" লোকটি আবার বললো : তিনি এবং নূহ এর মধ্যে কত বছরের ব্যবধান ছিল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বললেন : "দশ যুগ" অর্থাৎ এক হাজার বছর।"[২৭২]

---

[272]. ইবন কাছীর, ইসমাঈল, আবুল ফেদা, **ক্বাছাছুল আম্বিয়া**; সম্পাদনা ও টীকা : 'আব্দুল কাদির আহমদ আত্বা, (কায়রো : মাত্বাবায়াতু হেসান, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১০৪। ইবনে হিববানের বর্ণনা মতে এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, তবে তিনি তাঁর সহীহ মুসলিমে তা বর্ণনা করেন নি।

এ হাদীসে বর্ণিত ‘عشرة قرون’ শব্দের দ্বারা উভয়ের মধ্যবর্তী সময় এক হাজার বছরের মধ্যে সীমিত বলে প্রমাণিত হয়।

উভয় হাদীসের মধ্যে সমাধান:

ইমাম ইবন কাছীর রহেমাহুল্লাহ ইবন আব্বাস ও আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস দু’টি বর্ণনা করার পর উভয় হাদীসের মধ্যে সমাধান কল্পে যা বলেছেন, সংক্ষেপে তা নিম্নে বর্ণিত হলো :

তিনি বলেন : “যেহেতু ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে ‘عشرة قرون’ দশ যুগ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ইসলামী ধ্যান-ধারণা প্রচলিত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসকে আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসের পরিপূরক হিসেবে গণ্য করতে হবে। এবার ‘قرن’ শব্দের অর্থ যদি যুগ ধরা হয়, তা হলে উভয় হাদীসের অর্থ দাঁড়াবে : আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম-এর মধ্যকার প্রথম দশ যুগ অর্থাৎ এক হাজার বছর আদম সন্তানদের মাঝে ইসলাম ছিল। তাঁদের মধ্যকার পরবর্তী যুগসমূহে মানুষেরা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। ক্বরন (قرن) শব্দ দ্বারা যদি ‘প্রজন্ম’ এর অর্থ গ্রহণ করা হয়, যেমন কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তা এ অর্থে

ব্যবহৃত হয়েছে,[২৭৩] তা হলে হাদীস দু'টির অর্থ হবে : আদম ও নূহ এর মাঝে দশ প্রজন্মের মানুষ অতিবাহিত হয়েছে, যারা সকলেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নূহ পূর্ববর্তী মানুষেরা সাধারণত দীর্ঘজীবী হতেন বিধায়, আদম ও নূহ আলাইহিমাস সালাম-এর মাঝে এক হাজার বছর অতিবাহিত না হয়ে হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ারই কথা। এ কথাটি সত্য হওয়ার পাশাপাশি যেহেতু ক্বরন (قرن) দ্বারা প্রজন্মের অর্থ গ্রহণ করলে তা বাস্তবতা ও ইতিহাসের নিরিখে সঠিক বলে মনে হয় না, তাই ক্বরন (قرن) শব্দ দ্বারা 'যুগ' এর অর্থই গ্রহণ করতে হবে''[২৭৪]

আমার মতে ইমাম ইবন কাছীর (রহ.) কর্তৃক উপরে বর্ণিত উভয় হাদীসের সমাধান গ্রহণ করার পাশাপাশি নিম্নরূপভাবেও উভয় হাদীসের মধ্যে সমাধান করা যেতে পারে। আর তা হলো- আবু উমামাহ এর হাদীসে ইসলাম শব্দটি না থাকায় হতে পারে সে হাদীসে 'قرن' দ্বারা আদম ও নূহ এর মাঝে দশ প্রজন্মের মানুষ অতিবাহিত হওয়ার কথাই বর্ণিত হয়েছে। সে সময়ের মানুষেরা অধিক আয়ু লাভ করতেন বিধায়, দশ প্রজন্ম অতিবাহিত

273.আল-কুরআন, সূরা ইসরা এর ১৭ নং আয়াত, এবং সূরা মু'মিনুন এর ৩১ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

274.ইবনে কাছীর, **কাসাসুল আম্বিয়া**; পৃ.১০৪, ১০৫।

হতে কয়েক হাজার বছর সময় লেগেছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কতকাল তারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এ বিষয়ের বর্ণনা আবু উমামাঃ এর হাদীসে বর্ণিত হয় নি। অন্যদিকে ইবন আব্বাসের হাদীসে 'عشرة قرون' দশ যুগ বা প্রজন্মের ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। এখন যদি এ হাদীসে বর্ণিত ' عشرة قرون' দ্বারা আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম-এর মধ্যে দশ যুগ অতিবাহিত হয়েছে বলে মনে করা হয়, তা হলে তা বাস্তবতা ও ইতিহাসের সাথে খাপ খায় না। তাই বাধ্য হয়ে এ-কথা বলতে হবে যে, ইবন আব্বাসের হাদীস দ্বারা উভয়ের মধ্যকার মোট সময়ের বর্ণনা করার উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং কত সময় তারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা বর্ণনা করাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মূল উদ্দেশ্য ছিল এবং এ উদ্দেশ্যেই বোধ হয় তিনি তাতে 'ইসলাম' শব্দটি অতিরিক্ত যোগ করেছিলেন। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম-এর মাঝে দশ প্রজন্মের লোক অতিবাহিত হয়েছে। তবে আদম আলাইহিস সালাম-এর তিরোধানের পর তাঁর বংশধররা এক হাজার বছর পর্যন্ত ইসলামের উপর কায়েম ছিল। পরবর্তী সময়ের প্রজন্মের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। সে জন্য তাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে প্রথমত আল্লাহ তা'আলা ইদ্রীস আলাইহিস সালাম-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তিনি খুব একটা

সফলকাম হতে না পারলে পরবর্তীতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত দশ প্রজন্ম অতিক্রান্ত হওয়ার প্রাক্কালে নূহ আলাইহিস সালাম-কে প্রথম রাসূল হিসেবে তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়। والله أعلم

আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রকৃতি :

আদম সন্তানদের তাওহীদ থেকে অংশীবাদের দিকে চলে যাওয়ার সূত্রপাত হয় প্রথমত তাদের মধ্যকার সৎমানুষদের বৈঠকশালা ও কবরসমূহের পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ এবং তাঁদের মূর্তি তৈরী করার মধ্য দিয়ে। প্রথমে মূর্তি তৈরীর উদ্দেশ্য ছিল সৎ মানুষদের স্মরণ করা এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁদের সৎকর্মসমূহের অনুসরণ করা। শয়তানের প্ররোচনায় পড়েই মূলত তারা এ কাজটি করেছিল বলে তিনটি ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় :

প্রথম বর্ণনা :

ইমাম ইবন আল-জাওযী ঐতিহাসিক হিশাম ইবন মুহাম্মদ ইবন আস-সা-ইব আল-ক্বালবী থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেন : আমার পিতা বলেছেন : সর্বপ্রথম মূর্তি পূজা করা হয় আদম আলাইহিস সালাম-এর তিরোধানের পর। শীশ এর সন্তানরা আদম আলাইহিস সালাম-কে ভারতের (বর্তমান শ্রীলংকার) ‘ইয়াজ’ নামক পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বরতম সেই

পর্বতের গুহায় দাফন করে যেখানে তাঁকে বেহেশত্ থেকে অবতরণ করানো হয়েছিল। হিশাম বলেন : আমার পিতা আমাকে বলেছেন, তিনি আবূ সালেহ থেকে এবং তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন : "আদম আলাইহিস সালাম এর ছেলে শীশ এর সন্তানরা সে গুহাতে আদম আলাইহিস সালাম-এর শরীরের পার্শ্বে আগমন করে এর সম্মান করতো এবং তাঁর জন্য আল্লাহ তা'আলার রহমত কামনা করতো। এদের এ অবস্থা দেখে কাবিলের সন্তানদের একজন বললো : হে কাবিলের সন্তানগণ! বনী শীশদের একটি ত্বওয়াফ করার স্থান রয়েছে যার চার পার্শ্বে তারা ত্বওয়াফ করে এবং এটাকে তারা সম্মান করে, অথচ তোমাদের এ ধরনের কিছু নেই। তাই সে তাদের জন্য একটি মূর্তি তৈরী করলো এবং সে-ই হলো প্রথম মানুষ যে মূর্তি তৈরী করলো।"[২৭৫]

দ্বিতীয় বর্ণনা :

এ বর্ণনাটিও ইমাম ইবন আল-জাওযী হিশাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'ওয়াদ্দ' 'সুয়া'' 'য়াগুছ' 'য়াউক' ও নসর' এরা সকলেই সৎ মানুষ ছিলেন। তারা সকলেই

---

[275]. ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৩, ৬৪; ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযী, **এগাছাতুল লহফান**; ২/১৬২।

এক মাসের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তাঁদের স্বজনরা তাঁদের জন্য খুবই বেদনার্ত হয়। তাদের এ অবস্থা দেখে কাবিল গোত্রের এক ব্যক্তি বললো: আমি কি তোমাদের জন্য তাঁদের আকৃতিতে আত্মাবিহীন পাঁচটি মূর্তি তৈরী করে দেব? তারা সবাই এতে সম্মত হলে সে তাদের জন্য তাঁদের আকৃতিতে পাঁচটি মূর্তি নির্মাণ করে দিল। এর পর লোকেরা তাদের রক্তের সম্পর্কানুযায়ী এ মূর্তিগুলোর নিকটে এসে এগুলোকে নিজের ভাই, চাচা ও চাচাতো ভাই এর মত মনে করে এগুলোকে সম্মান ও এর চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ করতে থাকলো। এ অবস্থার উপর এ যুগ অথবা এ প্রজন্ম অতিবাহিত হয়ে যায়। এ মূর্তি নির্মাণ করা হয় ইয়াজাজ ইবন মাহলাইল ইবন কাইনান ইবন আনূশ ইবন শীশ ইবন আদম আলাইহিস সালাম-এর যুগে। এরপর দ্বিতীয় যুগ বা প্রজন্ম আসলে তারা এ মূর্তিগুলোকে প্রথম প্রজন্মের বা যুগের চেয়ে আরো অধিক পরিমাণে সম্মান প্রদর্শন করে। এরপর আসে তৃতীয় যুগ বা প্রজন্মের লোকেরা, তারা বললো : প্রথম যুগের জনগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট এ পাঁচটি মূর্তির শাফা'আত প্রাপ্তির আশায় এঁদের সম্মান করেছে। এ মনে করে এ মূর্তিগুলোর উপাসনা করার ফলে তারা এগুলোর মান-মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে। এভাবে তাদের কুফরী কার্যকলাপ মারাত্মক আকার ধারণ করলে অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ইদ্রীস আলাইহিস সালাম-কে

তাদের নিকট সর্বপ্রথম নবী হিসেবে প্রেরণ করে তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানান, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা ইদ্রীস আলাইহিস সালাম-কে সমুন্নত স্থানে উঠিয়ে নেন। কলবী আবূ সালেহ থেকে এবং আবূ সালেহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যে বর্ণনা করেছেন, সে অনুযায়ী বনী আদমের অবস্থা নূহ পর্যন্ত এভাবে গুরুতর থেকে গুরুতর হতে থাকে, অবশেষে আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালাম-কে তাদের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন।"[২৭৬]

উপর্যুক্ত এ দু'টি বর্ণনার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মূর্তি নির্মাণের কাজটি তাদের অনেকটা স্বেচ্ছা প্রনোদিতভাবেই হয়েছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে তা শয়তানের প্ররোচনার ফলেই হয়েছিল; কারণ শয়তানই বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল এবং এ সব যে শয়তানের প্ররোচনায়ই হয়েছে তাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সূরা নূহ এ বর্ণিত হয়েছে :

﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣ ﴾ [نوح: ٢٣]

---

[276]. তদেব।

“তারা বললো: তোমরা তোমাদের দেবতাদের পরিত্যাগ করো না, আরো পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুয়া‘, য়াগুছ, য়া‘উক ও নছরকে”[২৭৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলো হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালাম-এর জাতির পূর্ব পুরুষদের মধ্যকার পাঁচজন সৎ মানুষের নাম। তাঁরা মৃত্যুবরণ করার পর শয়তান তাঁদের জাতির নিকট এসে এ মর্মে প্ররোচনা দান করে যে, তোমরা তাঁদের বৈঠকশালাতে তাঁদের মূর্তি দাঁড় করো এবং তাঁদের নামে এগুলোর নামকরণ করো। শয়তানের নির্দেশে তারা তা করে। ধীরে ধীরে এ প্রজন্মের লোকদের বিদায়ের পর পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের নিকট এ মূর্তিগুলোর প্রকৃত ইতিহাস বিলুপ্ত হয়ে গেলে এগুলোর উপাসনা করা হয়।”[২৭৮]

ইমাম ইবন জারীর আত-ত্ববারী (২২৪-৩১০) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : “এরা পাঁচজন আদম ও নূহ আলাইহিস সালাম-এর মধ্যবর্তী সময়ের সৎ মানুষ ছিলেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী অনেক মানুষ ছিল। তাঁরা মৃত্যুবরণ করার পর

---

[277]. আল-কুরআন, সূরা নূহ : ২৩।

[278]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুত তাফছীর, সূরা নূহ, ৩/৬/২৮১।

তাঁদের অনুসারীরা বললো : আমরা যদি তাঁদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করি, তা হলে তা দেখে আমরা আল্লাহর উপাসনার প্রতি অধিক আগ্রহী ও মনোযোগী হতে পারবো। এ মনে করে তারা তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরী করলো। এদের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় প্রজন্মের জনগণের নিকট ইবলীস (শয়তান) এসে বললো : তোমাদের পূর্বপুরুষগণ এঁদের উপাসনা করতো, এঁদের ওসীলায় তারা বৃষ্টি কামনা করতো। এভাবে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তারা তাঁদের উপাসনা করতে আরম্ভ করে।”[২৭৯]

উপর্যুক্ত এ সব বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, এ পাঁচ জন সৎ মানুষের মূর্তি নির্মাণ মূলত শয়তানের প্ররোচনায়ই হয়েছিল। এটি শয়তানের সে প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নেরই প্রারম্ভিক কাজ ছিল, যা সে জান্নাত হতে বিতাড়িত হওয়ার সময় আদম সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য করেছিল।

তৃতীয় বর্ণনা :

ইমাম ইবন কাছীর আবু জা‘ফর আল-বাক্বির থেকে ‘ওয়াদ্দ’ সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিয়েছেন। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ : ইমাম আবু জা‘ফর আল-বাক্বির এর নিকট ইয়াযীদ ইবন আল-মুহাল্লাব

---

[279]. ইবনে কাছীর, **জামিউল বয়ান ফী তাফছীরিল ক্কুরআন**; ১২/২৯/৬২; ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযীয়্যাহ. **এগাছাতুল লহফান**; ২/১৬১।

সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন : ইয়াযীদ ইবন আল-মুহাল্লাব এমন এক স্থানে নিহত হয়েছিলেন যেখানে সর্বপ্রথম গায়রুল্লাহর উপাসনা করা হয়েছিল। 'ওয়াদ্দ' নামের একজন সৎ মানুষ ছিলেন, তিনি তাঁর জাতির কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর ব্যাবিলনের মানুষেরা তাঁর কবরের পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করে তাঁর জন্য খুবই আহাজারী করতো। ইবলীস তাদের এ অবস্থা দেখে একজন মানুষের আকৃতি ধরে আগমন করে তাদেরকে বললো : এ ব্যক্তির জন্য তোমাদের যে কী দুঃখ ও বেদনা, আমি তা লক্ষ্য করেছি। আমি কি তোমাদের জন্য তাঁর প্রতিকৃতি নির্মাণ করে দেব? যা তোমরা তোমাদের যৌথ মিলন কেন্দ্রসমূহে রেখে এর মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করবে? তারা এতে সম্মত হলে সে তাঁর অনুরূপ একটি মূর্তি তৈরী করে দিল। তারা এটিকে তাদের যৌথ মিলনকেন্দ্রে রেখে তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। তাদের স্মরণের এ অবস্থা দেখে শয়তান পুনরায় এসে বললো : আমি কি তোমাদের প্রত্যেকের গৃহে রাখার জন্য অনুরূপ মূর্তি তৈরী করে দেব? তারা এতেও সম্মত হলে সে প্রত্যেক গৃহবাসীর জন্য এর অনুরূপ মূর্তি তৈরী করে দেয়। তারা তা গ্রহণ করে এর মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। তাদের সন্তানরা তাদের এ সকল কার্যকলাপ দেখতে থাকে। বংশ বৃদ্ধি হয়ে যখন নতুন প্রজন্ম তাদের স্থান দখল করে নিল এবং তাঁকে স্মরণ

করার মূল কারণ সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা অজ্ঞ রয়ে গেল, তখন তাদের সন্তানের সন্তানেরা আল্লাহকে ব্যতীত এ মূর্তিরই উপাসনা করতে লাগলো। ফলে 'ওয়াদ্দ'ই হলেন প্রথম দেবতা যাকে আল্লাহর সাথে উপাসনা করা হয়।"[২৮০]

এ তিনটি ঐতিহাসিক বর্ণনা আমাদেরকে মোটামুটিভাবে এ প্রমাণ দিচ্ছে যে, তাওহীদ থেকে অংশীবাদের দিকে মানুষের পথভ্রষ্টতার সূত্রপাত হয় সৎমানুষদের (যারা সাধারণ মানুষদের পরিভাষায় আউলিয়া) কবরসমূহে প্রারম্ভে অবস্থান গ্রহণ এবং পরবর্তীতে তাঁদেরকে স্মরণ ও আল্লাহ তা'আলার উপাসনায় আগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের মূর্তি নির্মাণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের কাছে সেই সৎ মানুষদের মূর্তি নির্মাণের পিছনে তাদের পূর্বপুরুষদের কী উদ্দেশ্য ছিল, তা হারিয়ে যায়। এর সাথে সংযোজিত হয় আল্লাহর রুবূবিয়্যাত সম্পর্কিত ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব। সে কারণে তারা পথভ্রষ্টতার দিকে অনেক দূর এগিয়ে যায়। তারা এ সব মূর্তির সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কী কী কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল, এর বিশদ কোন বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে পাওয়া না গেলেও এ কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায় যে, আউলিয়াদেরকে কেন্দ্র করে আজকের

---

[280]. ইবনু কাছীর, **ক্বাসাসুল আম্বিয়া**; পৃ. ১১৫; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, **আদ-দুররুল মানছূর**; ৬/২৬৯।

সাধারণ মানুষেরা যে সব অলীক ধ্যান-ধারণা পোষণ করে, তারাও তাঁদের অলিদের ব্যাপারে সে ধরনের ধ্যান-ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিল। তাঁদেরকে তাদের দুনিয়া-আখেরাতের জীবনের কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছিল। তাঁদেরকে আল্লাহর দরবারে তাদের অভাব অভিযোগ উপস্থাপনের মাধ্যম ও সুপারিশকারী হিসেবে গণ্য করেছিল। সে সময়ে কোনো শরী'আত না থাকাতে[281] তারা তাদের অলিদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এমন সব কর্ম করতে আরম্ভ করেছিল যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার উপাসনার শামিল ছিল। এভাবে তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আল্লাহর উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতে শির্কী কর্মে নিমজ্জিত হয়েছিল।

আদম সন্তানদেরকে এভাবে পথভ্রষ্ট করার মাধ্যমে শয়তান প্রত্যেক যুগে বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় এবং পরবর্তী প্রতিটি জাতিকে শির্কে নিমজ্জিত করার ক্ষেত্রে সে তার পরিচিত এই পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। যদিও যুগের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনের নিরিখে এ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে নিত্য নতুন পন্থা অবলম্বন করেছে। কুরআনুল কারীম আমাদের জন্য এ কথার উত্তম সাক্ষ্য

---

[281] শরী'আত ছিল না, এটা স্বাভাবিক অর্থে নয়, অর্থাৎ শরী'আত সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল। [সম্পাদক]

যে, শয়তান এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেই অতীতে হূদ, সালেহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জাতিসমূহকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তাদেরকে নিজ হাতে তৈরী মুর্তিসমূহের ব্যাপারে একই ধরনের ধারণা ও উপাসনায় লিপ্ত করেছিল। শয়তান এভাবে যুগের পর যুগ ধরে বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তার সেই পূর্ব প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছে। তার এ প্রচেষ্টার ফলে যে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-একনিষ্ঠ তাওহীদের অনুসারী ও ঘোষণাকারী ছিলেন, এক সময় সে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর বংশধরদেরকেও সে পথভ্রষ্টতার অতলতলে নিক্ষেপ করেছিল। মহান আল্লাহ একান্ত অনুগ্রহে শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করার ফলে দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলে দাবীদার অনুসারীদের মধ্যে পুনরায় তাওহীদের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল; কিন্তু শয়তানের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলে সেই তাওহীদী বিশ্বাসের মাঝেও সুদূর অতীতকাল থেকেই শয়তান পুনরায় শির্কী চিন্তা-ভাবনা ও কর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য মুসলিমদের অবস্থা সেই দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলে দাবীদারদের অনুরূপ হয়ে গেছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿ وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ ۝١٠٦ ﴾ [يوسف: ١٠٦]

“এদের অধিকাংশরাই মুশরিক অবস্থায় আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে”।[২৮২]

[282].আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : ১০৬।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাক ইসলামী যুগে আরব জনপদে প্রচলিত শির্ক

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাসূল হয়ে প্রেরিত হওয়ার প্রাক্কালে আরব দ্বীপের অধিবাসীদের অধিকাংশ লোকেরাই ‘আরবুল ‘আরিবাহ ও ‘আরবুল মুসতা‘রিবাঃ[২৮৩] এর অধঃস্তন বংশধর ছিল। মক্কা নগরী ও এর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে আল- ‘আরাবুল মুসতা‘রিবাঃদের বসবাস ছিল। তবে আল-‘আরাবুল ‘আরিবাহ বলে পরিচিত লোকেরাই হলো আরব দ্বীপের আদি অধিবাসী এবং ‘আরাবুল মুসতা‘রিবাহ বলে পরিচিতরা হলো সেখানে অভিবাসনকারী। এদের প্রথম পুরুষ যিনি এ দ্বীপে অভিবাসন গ্রহণ করেন, তিনি হলেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। তাঁকে আমাদের আদি পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর মাতাসহ ছোট বেলায় কা‘বা শরীফের পার্শ্বে আল্লাহর আদেশে রেখে গিয়েছিলেন।

---

[283]. আল-‘আরবুল ‘আরিবাহ (العرب العاربة) হচ্ছে, ইয়া‘রুব ইবন ইয়াশজান (يعرب بن يشجان) এর বংশধর, আর আল- ‘আরাবুল মুসতা‘রিবাহরা (العرب المستعربة) হলো ইসমাঈল ইবন ইব্রাহীম -এর বংশধর। দেখুন : আল-মুবারকপুরী, সফ্‌ইউর রহমান, আর-রাহীক্বুল মাখতূম; (রিয়াদ : দারুস সালাম, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৬; ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত; ১/৭৭।

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বড় হয়ে জনগণকে তাঁর পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানান। ফলে সে সময়ের অধিকাংশ লোকেরাই তাঁর অনুসারী হয়ে যেয়ে মহান আল্লাহর উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতে সম্পূর্ণরূপে তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে যায়।[২৮৪] যুগের আবর্তনে যখন তাদের মধ্যে কয়েক প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ধর্ম সম্পর্কে তারা নতুন করে কোনো শিক্ষা পায়নি, তখন তারা ধর্মের অনেক বিষয়াদি ধীরে ধীরে ভুলতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদের মাঝে শুধু তাওহীদী বিশ্বাস এবং ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর স্মৃতি বিজড়িত কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও নিদর্শনাদি ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে নি। অবশেষে তারা তাওহীদী বিশ্বাস থেকেও বিচ্যুত হয়ে মূর্তি পূজা করার ফলে মুশরিকে পরিণত হয়। তাদের মাঝে প্রতিমা পূজার মাধ্যমে শির্কী কর্মকাণ্ডের সূচনা হয় কা‘বা শরীফের সম্মানে এর পার্শ্ব থেকে সংগৃহীত পাথরের চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ করার মাধ্যমে, যা তারা মক্কা থেকে দূর-দূরান্তে হিজরত করার সময় সাথে করে নিয়ে অবতরণ স্থলের এক পার্শ্বে স্থাপন করতো।[২৮৫] তাদের মাঝে ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস

---

[284]. তদেব; পৃ. ৩৫।

[285]. ইবন কাছীর, **আল-বেদায়াতু ওয়ান নেহায়াহ;** (বৈরুত : মাকতাবাতুল মা‘আ-রিফ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.), ১/১৮৮।

সালাম-এর ধর্মের কিছু বিষয়াদি যেমন : কা'বা শরীফের সম্মান করা, এর ত্বওয়াফ, হজ্জ ও 'উমরা করা, সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ে সা'য়ী করা, আরাফা ও মুযদলিফায় অবস্থান গ্রহণ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উট ও বকরী কুরবানী বা উৎসর্গ করা...ইত্যাদি কর্ম প্রচলিত ছিল। যদিও এ সব ক্ষেত্রে তারা নিজ থেকে কিছু বিষয়াদি সংযোজন ও বিয়োজন করেছিল যা মূল ধর্মীয় কর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[২৮৬]

মক্কাবাসীদের ধর্মীয় অবস্থার অবনতি :

এরপর তাদের ধর্মীয় অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। তাদের মাঝে মূর্তিপূজার মাধ্যমে শির্কী কর্মকাণ্ড শুরু হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেসালত লাভের প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে[২৮৭] খুযা-'আহ গোত্র প্রধান ও মান্যবর ব্যক্তিত্ব 'আমর ইবন লুহাই এর মাধ্যমে। ঐতিহাসিক ইবন হেশামের বর্ণনামতে 'আমর ইবন লুহাই কোনো উপলক্ষে মক্কা থেকে সিরিয়া গমন করে সেখানকার লোকদেরকে কতিপয় মূর্তির পূজা করতে দেখে বলে : এ মূর্তিগুলো কী, যাদের আপনারা উপাসনা করছেন?

---

[286]. ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, **এগাছাতুল লহফান**; ২/১৬৫-১৬৬। (সংক্ষিপ্তাকারে)

[287]. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, **আল-ফাওযুল কাবীর**; পৃ. ৫।

উত্তরে লোকেরা বললো : এদের কাছে বৃষ্টি চাইলে এরা আমাদেরকে বৃষ্টি দান করে, সাহায্য চাইলে তারা আমাদের সাহায্য করে। এ কথা শুনে 'আমর ইবন লুহাই বললো : এদের মধ্য থেকে একটি মূর্তি আমাকে দান করুন, আমি সেটিকে আরব দেশে নিয়ে যাব, ফলে আরবরা এর উপাসনা করবে। এতে লোকেরা তাকে 'হুবল' নামের একটি মূর্তি দান করে। অতঃপর সে তা নিয়ে মক্কায় আগমন করে এবং তা কা'বা শরীফের নিকটতম এক স্থানে সম্মানের সাথে স্থাপন করার পর আরব জনগণকে এর উপাসনা ও সম্মান করার জন্য নির্দেশ করে।[২৮৮]

এ 'আমর ইবন লুহাই ছিল জিন সাধক। সে তার অনুগত জিন এর পরামর্শ অনুযায়ী নূহ আলাইহিস সালাম-এর জাতির উপাস্য সেই মূর্তিগুলো জিদ্দা এলাকা থেকে মাটি খনন করে বের করে নিয়ে আসে। সেগুলোকে নূহ আলাইহিস সালাম-এর সময়কার প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও তুফান এতদঅঞ্চলে বহন করে নিয়ে এসেছিল। ধীরে ধীরে বন্যার পানি নেমে যাবার সময় এগুলো জিদ্দা এলাকার চরাঞ্চলে আটকা পড়েছিল এবং পরবর্তিতে তা

---

288. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুত তাফসীর, বাব নং- ৩৯৮, ওয়ালা তাজারুন্না ওয়াদ্দান... হাদীস নং ৪৬৩৬, ৪/১৮৭৩; ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত; ১/৭৬; ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, **এগাছাতুল লহফান**; ২/১৬৫;ইবনে কাছীর, **আল-বেদায়াতু ওয়ান নেহায়াহ**; ১/১৮৮।

বালুর নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ‘আমর ইবন লুহাই তার অনুগত জিনের পরামর্শে এগুলোকে বের করে নিয়ে এসে হজ্জের মৌসুমে ‘আরব জনগণকে এগুলোর উপাসনা করার প্রতি আহ্বান জানায়। লোকেরা এতে তার আনুগত্য করলে সে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে তা বন্টন করে দেয়।[২৮৯] সে অনুযায়ী ‘ওয়াদ’ (وَدْ) নামের মূর্তিটি ছিল দাওমাতুল জানদাল এলাকার ‘কালব’ গোত্রের নিকট, সুয়া‘ (سُوَاع) নামের মূর্তিটি ছিল ‘হুজায়েল’ গোত্রের নিকট, ‘য়াগুছ’ (يغوث) নামের মূর্তিটি ছিল ‘মুরাদ’ গোত্রের নিকট, ‘ইয়াউক’ (يعوق) নামের মূর্তিটি ছিল হামাদন গোত্রের নিকট, আর ‘নাছর’ (نسر) নামের মূর্তিটি ছিল ইয়ামনের ‘হিময়ার’ গোত্রের নিকট।[২৯০] এ পাঁচটি মূর্তির পাশাপাশি ‘আরব জনপদে আরো অসংখ্য মূর্তি ছিল।

‘আরব জনপদে উল্লেখযোগ্য মূর্তিসমূহ :

আরবের লোকেরা ছোট এবং বড় বিভিন্ন রকমের মূর্তিদেরকে আল্লাহ তা‘আলার রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের

---

[289]. ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, **এগাছাতুল লহফান**; ২/১৬৩-১৬৪ ।

[290]. ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত; ১/৮৭; ইবনে কাছীর, **তাফছীরুল কুরআনিল ‘আযীম**; ৪/৪৫৪-৪৫৫; ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, **এগাছাতুল লহফান**; ২/১৬২-১৬৪।

বৈশিষ্ট্যে সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মূর্তি নিম্নরূপ :

লাত :

এটি 'ত্বায়েফ' নামক স্থানের 'ছক্বীফ' গোত্রের প্রসিদ্ধ এক দেবী মূর্তির নাম। এর মাধ্যমে তারা কুরায়েশ গোত্রের উপর গর্ব করতো। ইমাম ইবনে কাছীর এর বর্ণনা মতে এটি ছিল একটি সাদা পাথরের মূর্তি। এর মধ্যে একটি ঘরের চিত্র অংকিত ছিল। কা'বা ঘরের ন্যায় এটিকে তারা পর্দা দ্বারা আবৃত করে রেখেছিল। অনুরূপভাবে তারা কা'বা শরীফের প্রাঙ্গণের ন্যায় এর প্রাঙ্গণকেও পবিত্র জ্ঞান করতো। ছক্বীফ গোত্র থেকেই এর খাদেম নিয়োগ করা হতো। ইমাম ইবনে জারীর এর বর্ণনা মতে তারা 'আল্লাহ' শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ হিসেবে এর নাম 'লাত' রেখেছিল।[২৯১] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে সুদূর অতীতে একটি চারকোণা বিশিষ্ট পাথরে বসে একজন ইয়াহূদী ব্যক্তি হাজীদের জন্য 'সাতু' তৈরী করে খেতে দিত। লোকটি সেখানে মৃত্যুবরণ করলে তার সততা ও ভাল কর্মের জন্য লোকেরা এ-পাথরকে সম্মান করে এর পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ

---

[291]. ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম; ৪/২৫।

করতে আরম্ভ করে।[২৯২] কুরায়েশ এবং সমগ্র আরব গোত্রের লোকেরাও একে পূজা ও সম্মান করতো।[২৯৩]

উয্যা :

'উয্যা' নামের এ দেবীটি মক্কার নিকটবর্তী 'নাখলাহ' নামক স্থানে স্থাপিত ছিল। এটা কুরায়েশ গোত্রের দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়মাপের দেবতা ছিল।[২৯৪] কুরায়েশরা কা'বা শরীফের হরমের ন্যায় এর জন্যও একটি হরম (পবিত্র এলাকা) নির্ধারণ করেছিল। সম্ভবত এটি ছিল কুরায়েশদের যুদ্ধের দেবী। তাদের সাথে কারো যুদ্ধ হলে তারা এ দেবীর কাছে যুদ্ধে জয় কামনা করতো। সে জন্যই উহুদ যুদ্ধের সময় আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন : "আমাদের উয্যা দেবতা আছে, তোমাদের কোনো উয্যা নেই।"[২৯৫] মূলত এ দেবতাটি ছিল বত্নে নাখলাহ নামক স্থানের তিনটি ছোট বাবলা

---

[292]. তদেব।

[293]. ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, **এগাছাতুল লহফান**; ২/১৬৮; ইবনে জারীর আত-ত্ববারী, প্রাগুক্ত; ২৭/৫৯।

[294]. ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত; ১/৮৪; ড. ফারুক হামাদাহ, **আল-ওয়াসিয়্যাতুন নববীয়্যাহ**; (আল-মাগরিব : দারুছ ছেক্বাফাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১৬।

[295]. মাওলানা সয়ৈদ সুলায়মান নদভী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪১৮।

গাছের সমষ্টি।[২৯৬] এ গাছগুলোতে একটি মহিলা জিন থাকতো। এর উপাসকরা তা বুঝতে না পারলেও এ জিনই এর উপাসকদেরকে এ গাছের মধ্য থেকে অলৌকিকভাবে শব্দ শুনাতো।[২৯৭] মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তা ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি পর পর তৃতীয় গাছটি কাটতে উদ্যত হলে আকস্মিকভাবে সে জিনটি ঘাড়ে হাত রেখে, দাঁত কটমট করে, এলোমেলো কেশে কুৎসিত হাবশী মহিলার আকৃতিতে আত্ম প্রকাশ করে। খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারী দিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করলে তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে হঠাৎ একটি কবুতরে রূপান্তরিত হয়ে মরে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরে এসে সর্বশেষ গাছ কাটতে গিয়ে তিনি যা দেখলেন তা তাঁকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তা শুনে বললেন :

---

[296]. ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান, **তারীখুল ইসলাম**; (কায়রো : মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিশরিয়্যাঃ, ১৪ সংস্করণ, ১৯৯৬ খিষ্টাব্দ.), পৃ. ৬১; মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, **তারীখু আরদিল ক্বুরআন**; (করাচী : দারুল এশা'আত, ১ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন), পৃ. ৪২০; ইবনে জারীর আত-ত্ববারী, প্রাগুক্ত; ২৭/৫৯।

[297]. ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত ; পৃ. ৬৮।

«تِلْكَ الْعُزَّى وَ لاَ عُزَّى بَعْدَهَا لِلْعَرَبِ»

"এ হাবশী মহিলাই মূলত 'উয্যা' ছিল, আরবদের জন্য এরপর আর কোন উয্যা থাকবে না।"[২৯৮] অপর এক বর্ণনামতে উয্যা নামের এ দেবীটি একটি সাদা পাথর ছিল।[২৯৯]

মানাত :

এটি প্রাচীন দেব-দেবীদের মাঝে অন্যতম একটি দেবীর নাম। সম্ভবত এটি ছিল কুরবানীর দেবী। এর নামে পশুর রক্ত প্রবাহিত করা হতো।[৩০০] এটাকে ভাগ্যদাতা ও মৃত্যুদানকারী বলে মনে করা হতো।[৩০১] মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'কুদায়েদ' নামক স্থানে এটি স্থাপিত ছিল। হজ্জ উপলক্ষে 'ইয়াসরিব' তথা মদিনার আওস এবং খযরজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা এসে এর চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ করতো।[৩০২] এতে (শয়তানের পক্ষ থেকে নিযুক্ত) একটি

---

298. ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, এগাছাতুল লহফান; ২/১৬৮-১৬৯; **আল-মুবারক পূরী, প্রাগুক্ত;** পৃ. ৪০৯-৪১০।

299. وقال آخرون كانت العزى حجرا أبيض وقال آخرون كان بيتا بالطائف تعبده ثقيف **-দেখুন : ইবনে জারীর আত-ত্বারী, প্রাগুক্ত; ২৭/৫৯।**

300. মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী, তারীখু আরদিল কুরআন; (করাচী : দারুল এশা'আত, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃ. ৪১৮।

301. তদেব।

302. তদেব।

মহিলা জিন থাকতো এবং এ জিনই এর পূজারীদেরকে নানা রকম অলৌকিক কর্মকাণ্ড করে দেখাতো। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে সা'য়ীদ ইবন যায়দ আল-আশহালী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ মূর্তিটি ধ্বংস করতে যান। এ সময় সে জিনটি কালো বর্ণের একটি মহিলা আকৃতিতে উলঙ্গ অবস্থায় এলোমেলো কেশে আত্মপ্রকাশ করে নিজের জন্য ধ্বংসের আহ্বান করে বুক চাপড়াতে ছিল। সা'য়ীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এ অবস্থাতেই হত্যা করেন।[৩০৩]

লাত উয্যা ও মানাতকে নারীর নামে নামকরণ করার কারণ :

লাত, উয্যা ও মানাত এগুলো তিনটি নারী দেবীর নাম। এগুলো মুশরিকদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে পারে এ ধারণার ভিত্তিতে তারা এদেরকে সব সময় কল্যাণার্জন এবং অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য আহ্বান করতো। তাদের এ আহ্বান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿ إِن يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثٗا وَإِن يَدۡعُونَ إِلَّا شَيۡطَٰنٗا مَّرِيدٗا ١١٧ ﴾ [النساء: ١١٧]

---

[303]. সফিয়্যুর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪১০; **-আত-ত্ববারী, আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর, প্রাগুক্ত ; ২৭/৫৯।**

"তারাতো আল্লাহকে ব্যতীত শুধু নারীদের আহ্বান করে, আসলে তারা কেবল অবাধ্য শয়তানকেই আহ্বান করে"।[৩০৪]

এখানে 'ইনাসান' বলে লাত, উয্যা, মানাত ও অন্যান্য নারী নামের সকল দেবীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[৩০৫] এগুলোকে 'ইনাস' বলার পিছনে মোট তিনটি কারণ থাকতে পারে :

এক. 'ইনাসান' শব্দটি 'উন্সা' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ নারী। লাত, উয্যা ও মানাত এ তিনটিকে নারীর নামে নামকরণ করার কারণে এদেরকে 'ইনাসান' বলা হয়ে থাকতে পারে। মূলত কোনো নারীদের সাথে এদের ঐতিহাসিক কোনো সম্পর্ক থাকার কারণে নয়।[৩০৬]

দুই. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতে 'ইনাস' অর্থ 'আওছান' তথা প্রতিমাসমূহ। 'আওছান' শব্দটি 'ওয়াসান' শব্দের বহুবচন। আরবীতে বহুবচন জাতীয় শব্দগুলো স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে গণ্য

---

[304]. আল-কুরআন, সূরা নিসা : ১১৭।

[305]. আল-কুরত্বুবী, আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-আনসারী, **আহকামুল কুরআন**; (মিশর : আল-হাইআতুল মিশরিয়্যাতু লিল কুত্তাব, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), ১০/৭৮।

[306]. তদেব।

হয়ে থাকে। যেহেতু মুশরিকরা একাধিক ‘ওয়াছান’ তথা প্রতিমাকে আহ্বান করতো, সে জন্য এগুলোকে ‘ইনাছান’ বলা হয়েছে।[৩০৭]

তিন. মুশরিকরা ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করে এদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এদের উপাসনা করতো। তারা এগুলোর নারী আকৃতির মূর্তি তৈরী করে এদের পূজা-অর্চনার জন্য কিছু নিয়ম নীতি তৈরী করেছিল, এদের গলায় অলংকার ঝুলিয়ে দিয়ে বলেছিল: এরা আল্লাহর মেয়ে যাদের আমরা উপাসনা করি। বিশিষ্ট তাবেঈ দাহহাক (রহ.) থেকে এ ব্যাখ্যাটি বর্ণিত হয়েছে।[৩০৮] ‘তারা এ সব মূর্তিকে আহ্বান করে মূলত অবাধ্য শয়তানকেই সাহায্যের জন্য আহ্বান করতো’ উক্ত আয়াতে এ কথা বলার কারণ হলো : শয়তানই মূলত তাদেরকে এ সবের আহ্বান করতে প্ররোচিত করতো। উবাই ইবনে কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনা মতে এ সব মূর্তির সাথে একটি

---

[307]. ইবনে কাছীর, তাফছীরুল কুরআনিল ‘আযীম; ১/৫৬৮।

[308]. ইবনে জারীর ত্ববারী দাহহাক থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

قال جرير عن الضحاك في الآية : قال المشركون للملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى .قال فاتخذوهن أربابا وصوروهن جواري ، فحكموا وقلدوا وقالوا هؤلاء بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة .قال ابن كثير : هذا التفسير شبيه بقول الله تعالى :[أفرأيتم اللات والعزى] الآيات- .

দেখুন : ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম; ১/৫৬৮।

করে মহিলা জিন থাকতো।[৩০৯] আর এ জিনরাই অদৃশ্যে থেকে তাদের আহ্বানকারীদের উপকার করে দিত। ফলে মুশরিকরা এ উপকারকে এ সব মূর্তির কাজ বলেই মনে করতো। তাদের ধারণা মতে ফেরেশ্তারা আল্লাহর মেয়ে হওয়ার কারণে তারা আল্লাহর অতীব নিকটতম ও প্রিয়ভাজন। তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব। সে জন্যেই তারা তাদের উপাসনা করতো এবং বলতো: "তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে, এ উদ্দেশ্যেই আমরা তাদের উপাসনা করছি"।[৩১০] আরো বলতো : "এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা'আতকারী।"[৩১১]

লাত, উয্যা ও মানাত এ তিনটি দেবীকে নারীর নামে নামকরণ করার কারণ হিসেবে যে তিনটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, এর যে কোনটির কারণে এগুলোর উপর্যুক্ত নামকরণ হয়ে থাকতে পারে। তৃতীয় সম্ভাবনাটির কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত না হলেও মুশরিকরা যে ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করতো এবং ফেরেশ্তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই যে তারা এ তিনটি দেবীকে উপর্যুক্ত

---

[309]. তদেব।

[310].আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৩।

[311]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ১৮।

নামে নামকরণ করেছিল, তা স্বয়ং কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। তারা যে ফেরেশ্তাদেরকে নারী মনে করতো সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثًا ۚ﴾ [الزخرف: ١٩]

"তারা ফেরেশ্তাদেরকে, যারা আল্লাহর বান্দা, তাদেরকে নারী বলে স্থির করেছে"।[৩১২] আবার ফেরেশ্তাদেরকে যে তারা আল্লাহর মেয়ে মনে করতো, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۝١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ۝٢٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۝٢١ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ ۝٢٢ إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ﴾ [النجم: ١٩، ٢٣]

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত, উয্যা ও তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে আর কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্যে। এটা হবে খুব অন্যায় বন্টন। এগুলো কতকগুলো নাম বৈ আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছো, এসবের কোনো প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেন নি।"[৩১৩]

উক্ত আয়াত দু'টির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করেই তাদের উপাসনার

---

[312].আল-কুরআন, সূরা যুখরূফ : ১৯।

[313]. আল-কুরআন, সূরা নাজম : ১৯।

মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে লাত, উয্যা ও মানাত নামের এ তিনটি দেবীকে নারীর নামে নামকরণ করেছিল। সে জন্যে ইমাম ইবনে কাছীরও তাঁর তাফসীরে দাহহাক কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যাকে أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ...الآية এর সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে মন্তব্য করেছেন।[৩১৪]

ফেরেশ্তাদের উপাসনা :

মুশরিকরা লাত, উয্যা ও মানাতের নামে কোনো নারী আকৃতির মূর্তি তৈরী না করলেও তারা যে ফেরেশ্তাদেরকে উদ্দেশ্যে করেই এ সব নাম রেখে এগুলোর উপাসনা করতো, তা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ۝٤٠ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝٤١﴾ [سبا: ٤٠، ٤١]

"আর যেদিন তিনি সবাইকে একত্রিত করবেন, অতঃপর ফেরেশ্তাদের বলবেন: এরা কি তোমাদেরই উপাসনা করতো? তারা বলবে : আপনি পবিত্র, আপনিই আমাদের অভিভাবক, ওরা

314.ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম; ১/৫৬৮।

নয়; বরং তারা জিনেরই উপাসনা করতো এবং তাদের অধিকাংশরাই এদের উপর ঈমান আনয়ন করতো।”[৩১৫]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা কোনো কোনো ফেরেশ্তাদের উপাসনা করতো। আর এ দেবীগুলোর নাম নারীর নামে রাখাতে মনে হয় যেন তারা তিনজন ফেরেশ্তাকে উদ্দেশ্য করেই এ তিনটি দেবীর নাম এভাবে রেখেছিল। যদিও সে সব দেবীর স্থানে নারীর আকৃতির কোনো মূর্তি ছিল বলে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা পাওয়া না গেলেও তৎকালীন সময়ে আরব উপদ্বীপের বনী ইসমাঈল এবং অন্যান্য ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা ফেরেশ্তা ও নবীদেরকে ইলাহ ও রবের আসনে সমাসীন করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ وَلَا يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرۡبَابًاۗ ﴾ [ال عمران: ٨٠]

“কোন নবী তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিতে পারেন না যে, তোমরা ফেরেশ্তা ও নবীদেরকে অসংখ্য রব হিসেবে গ্রহণ করবে।”[৩১৬]

---

[315]. আল-কুরআন, সূরা সাবা : ৪১।

[316]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ৮০।

এ আয়াত দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কুরাইশরা কোনো কোনো ফেরেশ্তাকে আল্লাহ্‌র রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বানিয়ে নিয়েছিল এবং সে ধারণার ভিত্তিতে তারা তাদের নিকট নিজেদের জীবনের কল্যাণ কামনা করতো ও অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য তাদেরকে আহ্বান করতো। লাত, উয্যা ও মানাত নামের দেবীগুলোকে নারীর নামে নামকরণ করাতে বুঝা যায় যে, তারা তিনজন ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করেই এ তিনটি দেবীর নামকরণ করেছিল; কারণ, তারা ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করতো। والله أعلم بالصواب

য়াসাফ ও না-য়েলাহ :

ঐতিহাসিক বর্ণনামতে এ দেবতা দু'টি মূলত 'জুরহাম' গোত্রের দু'জন মানুষ ছিল। য়াসাফ না-য়েলাহকে ভালবাসতো। একদা কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে তারা অবৈধভাবে যৌনকর্মে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তিস্বরূপ দু'টি পাথরে রূপান্তরিত করেন। সাধারণ লোকেরা যাতে এদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সে জন্য লোকেরা এ পাথর দু'টির একটিকে কা'বা শরীফের পার্শ্বে এবং অপরটিতে যমযম কূপের পার্শ্বে স্থাপন করেছিল। দীর্ঘদিন যাবত এ পাথর দু'টি এভাবেই ছিল। যুগের পরিক্রমায় এ পাথর দু'টির বাস্তব ইতিহাসও পরবর্তী লোকেরা ভুলে যায়। এরই মধ্যে তাদের মাঝে মূর্তি পূজার প্রচলন

হয়, তখন অন্যান্য মূর্তির সাথে এ-গুলোকেও তারা পূজা করতে থাকে। কুরায়েশরা পরবর্তিতে কা‘বা শরীফের পাশেরটিকে অপরটির নিকটে স্থানান্তরিত করেছিল এবং এ দু’টির নিকট তারা পশু যবাই ও কুরবানী করতো।[৩১৭]

জুল খালাসাহ :

এটি ছিল একটি সাদা রঙ্গের পাথর। এর মাথায় ছিল একটি টুপির নকশা। মক্কা ও ইয়ামনের মধ্যবর্তী স্থানে এর জন্য একটি গৃহ ছিল। খাছ‘আম, বুজায়লা ও অন্যান্য নিকটতম স্থানের লোকেরা এটাকে সম্মান করতো এবং তাদের মনোবাঞ্ছনা পূরণের জন্য এর উদ্দেশ্যে অর্থ সম্পদ প্রেরণ করতো। এটি ধ্বংস করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জারীর ইবন ‘আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একদল অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন।[৩১৮]

জুল কাফীল :

এ দেবতাটি ছিল ‘দাওস’ নামক গোত্রের নিকট পূজনীয়। ‘আরব জনপদে এভাবে যখন মূর্তি পূজার হিড়িক পড়ে যায়, তখন

---

[317]. তদেব; ২/১৭০।

[318]. ইবনে হাজার আসকালানী, **ফতহুল বারী বিশরহিল বুখারী**;, বৈরুত : দ্বারুল মা‘রিফাহ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন, ৮/৭১।

মক্কা ও এর বাইরের সকল জনগণই নিজ নিজ গৃহে উপাসনার জন্য পৃথক পৃথক মূর্তি গ্রহণ করেছিল। যখন তাদের কেউ কোথাও ভ্রমণে যাওয়ার জন্য তৈরী হতো, তখন সে ব্যক্তির গৃহের সর্বশেষ কাজ হতো এ মূর্তির গায়ে হাত বুলানো এবং ভ্রমণ থেকে ফিরে আসলেও গৃহে প্রবেশ করলে তাদের প্রথম কাজই হতো সম্মানের উদ্দেশ্যে এ মূর্তির গায়ে হাত বুলানো।[৩১৯]

জিনের উপাসনা :

মুশরিকরা সাধারণত উপর্যুক্ত জড়পদার্থের মূর্তি এবং মানুষ ও ফেরেশ্তাদের নামে নির্মিত মূর্তিসমূহের প্রতি এরা তাদের লাভ ও ক্ষতি করতে পারে- এ ধারণার ভিত্তিতে এদেরকে সাহায্যের জন্য যেমন আহ্বান করতো, তেমনি কোনো কোনো এলাকার লোকেরা জিনের ব্যাপারেও উপর্যুক্ত ধারণা পোষণ করে জিনদেরকেও সাহায্যের জন্য আহ্বান করতো। যেমন আল্লাহ বলেন :

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ﴾ [الاسراء: ٥٧]

---

319. ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত; ১/৮৩; ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, এগাছাতুল লহফান; ২/১৭১; ইবনে কাছীর, আল-বেদায়াতু ওয়ান নেহায়াহ; ১/১৯১-১৯২।

"যাদেরকে তারা আহ্বান করে তারা নিজেরাই তো তাদের রবের অধিক নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করে, তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।"[৩২০]

এ আয়াতের তাফসীরে ইবন মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে :

[قَال كانَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ أَسْلَمُوْا وَكَانُوْا يُعْبَدُوْنَ فَبَقِيَ الذينَ كانُوْا يَعْبُدُوْنَ على عِبَادَتِهِمْ وَقَدْ أَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ]

"একদল জিন ইসলাম গ্রহণ করেছিল যাদের উপাসনা করা হতো; তাদের ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও যারা তাদের উপাসনা করতো তারা যথারীতি তাদের উপাসনায় থেকে যায়।"[৩২১]

বিপদে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা আল্লাহর উপাসনা হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো লোকেরা যে জিনদের উপাসনা করতো, তা জিনদের স্বীকারোক্তির দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন জিনরা বলেছিল :

---

[320]. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৭।

[321]. বুখারী, প্রাগুক্ত; বাব নং ২০৬, হাদীস নং ৪৪৩৮; ৪/১৭৪৮; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুত তাফসীর, বাব নং ৩, হাদীস নং ৩০৩০, ৪/২৩২১; কুরত্বী, প্রাগুক্ত; ১০/২৭৯।

﴿كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلۡإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقًا ۝٦﴾ [الجن: ٦]

"মানুষের মধ্যকার কিছূ লোকেরা জিনদের মধ্যকার কিছু জিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।"[৩২২]

এ ছাড়াও আল্লাহর অবাধ্যতায় মুশরিকরা শয়তানের নির্দেশের আনুগত্য করে মূর্তি পূজা করার কারণে তারা আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে শয়তানকে শরীক করে নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلۡجِنَّ وَخَلَقَهُمۡۖ ﴾ [الانعام: ١٠٠]

'আর মুশরিকরা শয়তানকে আল্লাহর শরীক করে নিয়েছে, অথচ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন।"[৩২৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাছীর বলেন : "যারা আল্লাহর উপাসনায় জিন তথা শয়তানকে শরীক করে নিয়েছিল উক্ত আয়াতে তাদের সে উপাসনার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা শয়তানের নির্দেশের আনুগত্য করার কারণেই মূর্তি পূজা করেছিল

---

[322]. আল-কুরআন, সূরা জিন : ৬।

[323]. আল-কুরআন, সূরা আন'আম : ১০০।

বিধায়, প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানেরই আনুগত্য করেছে এবং তার কাছেই সাহায্য চেয়েছে ও তারই সুপারিশ কামনা করেছে।”[৩২৪]

পাথর পূজা :

পাথর পূজার ক্ষেত্রে তারা বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল। প্রথমত কা‘বা শরীফ ও এর প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে থাকা পাথর অন্যত্র বহন করে নিয়ে পাথর পূজার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে তারা যখনই কোথাও অবতরণ করতো তখন তাদের সাথে কা‘বা শরীফের প্রাঙ্গণের পাথর না থাকলে সেখানকারই একটি ভাল পাথরের পূজা করতো। কোন পাথর না পেলে কিছু মাটি বা বালু একত্রিত করে এর উপর ছাগলের দুধ দোহন করে সে মাটি বা বালু একটু শক্ত হলেই এটিকে মূর্তি মনে করেই এর চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ করতো। এ সম্পর্কে আবু রাজা-আল আত্বারিদী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

---

[324]. তিনি বলেন :

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء له في العبادة تعالى الله عن شركهم وكفرهم فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام فالجواب أنهم ماعبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك كقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يعبدون إلا شيطانا مريدا

দেখুন : ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম; ২/১৬৫।

"আমরা (পাথর না পেলে) বালু একত্রিত করতাম এবং এর উপর ছাগলের দুধ দোহন করে এর উপাসনা করতাম। আমরা সাদা পাথর পেলে কিছুদিন এর উপাসনা করতাম। অতঃপর তা ফেলে দিতাম।"[৩২৫]

গৃহ পূজা :

এ সকল মূর্তি ছাড়াও কা'বা শরীফের ন্যায় মর্যাদার অধিকারী তাদের আরো কিছু গৃহ ছিল। এ সব গৃহেরও খাদেম ও গিলাফ ছিল। কা'বা শরীফের ন্যায় তারা এ সব গৃহের ত্বওয়াফ করতো। এর উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গ করতো। এ সম্পর্কে হেশাম ইবন মুহম্মদ আল-কালবী স্বীয় 'কিতাবুল আসনাম' গ্রন্থে বলেন :

"বনী হারিছ ইবন কা'ব গোত্রের একটি কা'বা গৃহ ছিল নাজরান নামক স্থানে। তারা এর সম্মান করতো। এ গৃহের বর্ণনাই জাহেলী যুগের কবি আ'শা তার কবিতায় উল্লেখ করেছেন:

وكعبة نجران حتم علي ** ك حتى تناخي بأبوابها

"নাজরানের কা'বার দরজায় তোমার উট বসিয়ে দেয়া একান্ত জরুরী"

---

[325]. ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, এগাছাতুল লহফান; ২/১৭৩।

অনুরূপভাবে ‘কূফা’ ও ‘বসরা’ এর মধ্যবর্তী ‘সিনদাদ’ নামক স্থানেও ‘ইয়াদ’ গোত্রের একটি কা‘বা ছিল।[৩২৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় প্রবেশ করে কা‘বা শরীফের ভিতরে ও এর পার্শ্বে ৩৬০টি মূর্তি দেখতে পান এবং

﴿جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقٗا﴾ [الاسراء: ٨١]

“সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়িত, আর অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী।”[৩২৭] এবং

﴿جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَمَا يُبۡدِئُ ٱلۡبَٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ [سبا: ٤٩]

“সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য নতুন কিছু সৃজন করতে পারে না এবং এর পুনরাবর্তনও হবে না।”[৩২৮]

এ আয়াত দু’টি পাঠ করে মূর্তিগুলোকে ধনুক দিয়ে আঘাত করতে থাকলে তা মুখ থুবড়ে পড়তে থাকে।[৩২৯] রাসূলুল্লাহ

---

[326]. ইবনে কাছীর, আল-বেদায়াতু ওয়ান নেহায়াহ; ১/১৭৩।

[327].আল-কুরআন, সূরা ইসরা : ৮১।

[328].আল-কুরআন, সূরা সাবা : ৪৯।

[329]. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব, **মুখতাসারু সীরাতির রাসূল**; (রিয়াদ : আর-রিয়াসাতুল আ-ম্মাহ লি এদারাতিল বুহুছিল ইলমিয়্যাহ..., সংস্করণ বিহীন, ১৪০৮হিজরী), পৃ. ২০২।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের ভিতরের দেয়ালে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর চিত্র দেখতে পেলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁরা তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করছেন। তা দেখে তিনি বলেন :

«قَاتَلَهُمُ اللهُ وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَابِهَا قَطُّ»

"মুশরিকদের আল্লাহ ধ্বংস করুন! আল্লাহ্র শপথ তাঁরা দু'জন কখনও তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করেন নি।"[৩৩০]

উপরে বর্ণিত এ সব মূর্তি ছাড়াও সাধারণ মানুষের বাড়ীতে ব্যক্তিগত এবং বিভিন্ন স্থানে গৃহ, পাথর ও গাছের আকৃতিতে যে সব মূর্তি ও প্রতিমা ছিল, আরব জনগণ বিশেষ করে বনী ইসমাঈলদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ সব ছিল শয়তানের একেকটি পাতানো ফাঁদ বিশেষ।

দেব দেবীদের ধরন ও প্রকৃতি :

মুশরিকরা যে সব সৎমানুষের মূর্তি, ফেরেশ্তা, জিন, গাছ ও পাথরের দেব-দেবীদেরকে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাত অথবা উলুহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বানিয়ে নিয়ে সে সবের উপাসনা করতো, সেগুলোর প্রকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

[330]. সফিয়্যুর রহমান আল-মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪০৪।

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٩٤﴾ [الاعراف: ١٩٤]

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে আহ্বান করো, তারা সবাই তোমাদের মতই (আমার) বান্দা। (তারা তোমাদের উপকার ও অপকার করতে পারে, এ মর্মে) তাদের ব্যাপারে তোমরা যে ধারণা করেছো, তাতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তা হলে তোমরা তাদের আহ্বান করো, তারাও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিক।"[৩৩১]

এখানে তাদের দেবতা ও দেবীদেরকে 'ইবাদ' তথা 'বান্দা' বলার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে :

১. তারা পাথরের যে সব প্রতিমা ও মূর্তির পূজা করতো, সে-গুলো তাদের মতই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর যারা আল্লাহর মালিকানায় রয়েছে, তারা সবাই তাঁর বান্দা।

২. এ-পাথরের প্রতিমা ও মূর্তিগুলো তাদের মতই আল্লাহর সৃষ্টি। আর সকল সৃষ্টিই আল্লাহর বান্দা।

৩. পাথরও তাদের ন্যায় আল্লাহর হুকুম ও আদেশের আওতাধীন।[৩৩২]

---

[331].আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ : ১৯৪।

[332]. কুরতুবী, প্রাগুক্ত; ৭/৩৪২।

৪. তারা ওয়াদ, সুয়া, য়াগুছ, য়া'উক ও নসর নামের যে-সব সৎমানুষ এবং যে সব ফেরেশ্তাদের পূজা করতো, তারাও তাদের মতই আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁর মালিকানাধীন ও তাঁর আদেশ ও নিষেধের আওতাধীন।

উপর্যুক্ত এ কারণসমূহের মধ্য থেকে যে কারণেই তাদেরকে 'ইবাদ' বলা হোক না কেন, এগুলো সর্বাবস্থায় তাদের মতই আল্লাহর বান্দা হওয়ায় কোনো অবস্থাতেই এরা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের কোনো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে তাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না। ইমাম কুরত্বুবী সৎমানুষ ও ফেরেশ্তাদের সাথে সম্পর্কহীন পাথরের মূর্তিসমূহকেই এ আয়াতের উদ্দেশ্য বলে নির্ধারণ করেছেন। তবে আমার মতে এ আয়াত দ্বারা শুধুমাত্র পাথরের মূর্তিসমূহকেই উদ্দেশ্য করা হয় নি, বরং এর দ্বারা পাথরের মূর্তিসহ অন্যান্য যাবতীয় মূর্তি ও প্রতিমাসমূহকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেগুলোকে তারা সৎমানুষ ও ফেরেশ্তাদেরকে কেন্দ্র করেও তেরী করেছিল।

মুশরিকরা পাথরের মূর্তি ছাড়াও ফেরেশ্তা, মানুষ ও জিনদের উপাসনা করতো?

আমাদের মাঝে মুশরিকদের ব্যাপারে একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে যে, তাদের বানানো মূর্তিগুলোর সাথে কোন সৎ মানুষ অথবা আল্লাহর নিকটতম কোনো জীবের সম্পর্ক নেই। তারা

মিছেমিছি জড়পদার্থ তথা গাছ ও পাথরের মূর্তি বানিয়ে সেগুলোর পূজা করতো বলেই আল্লাহ তাদেরকে মুশরিক বলে অভিহিত করেছেন। তবে কাফিরদের মূর্তিসমূহের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে যে সব আয়াত বর্ণিত হয়েছে, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের প্রতিমা ও মূর্তিসমূহের ব্যাপারে আমাদের উক্ত ধারণা কোনো কোনো মূর্তির বেলায় সঠিক হলেও সকল প্রতিমা ও মূর্তির ক্ষেত্রে সঠিক নয়। আমরা একটু আগেই অবহিত হয়েছি যে, মুশরিকরা যাদেরকে আহ্বান করতো সেগুলোকে আল্লাহ তাঁর বান্দা বলে অভিহিত করেছেন। এগুলোকে বান্দা বলার কারণ সম্পর্কে আমরা আরো জেনেছি যে, তারা ফেরেশ্তা ও জিনদের উপাসনা করার কারণে এগুলোকে বান্দা বলা হয়ে থাকতে পারে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকদের যাবতীয় প্রতিমা ও মূর্তিসমূহ মিছেমিছি পাথর সর্বস্বই ছিল না। বরং এগুলোর কোনো কোনোটি সুদূর অতীতে কোনো সৎমানুষ ও ফেরেশ্তাদেরকে কেন্দ্র করেই নির্মাণ করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ ওয়াদ্দ, সুয়া‘, ইয়াগুছ, ইয়া‘উক ও নসর নামের মূর্তিসমূহের কথা বলা যায়। আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি যে, এ মূর্তিগুলো পাঁচজন অলির নামে নূহ আলাইহিস সালাম এরও পূর্ব যুগে নির্মিত হয়েছিল। এগুলো ছাড়াও ইয়াসাফ ও না-ইলাহ নামের প্রতিমাদ্বয়ও মূলত দু’জন মানুষ কেন্দ্রিক ছিল।

আখেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশ্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা তাঁদেরও পূজা করতো। সূরায়ে বনী ইসরাঈলের ৫৭ নং আয়াত দ্বারা জিনদের উপাসনা করার কথাও প্রমাণিত হয়। সর্বোপরি নিম্নে বর্ণিত আয়াতদ্বয় দ্বারাও এ সত্যই প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ شُرَكَآءَهُمۡ قَالُواْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدۡعُواْ مِن دُونِكَۖ فَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡهِمُ ٱلۡقَوۡلَ إِنَّكُمۡ لَكَٰذِبُونَ ۝٨٦ ﴾ [النحل: ٨٦]

"যখন মুশরিকরা তাদের শরীকদের (আখেরাতে)দেখবে, তখন বলবে : প্রভু হে! এরাই হচ্ছে আমাদের ঐসব শরীক যাদেরকে আমরা তোমার পরিবর্তে আহ্বান করতাম। শরীকগণ তাদের এ কথার প্রতিবাদ করে বলবে: তোমরা মিথ্যাবাদী।"[৩৩৩]

এ আয়াত দ্বারা 'শুরাকা' বলতে যেমন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা, আগুন ও পাথর ইত্যাদির কথা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি এর দ্বারা ফেরেশ্তাদেরকে বুঝারও সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উভয় সম্ভাবনার কথাই বর্ণনা করেছেন। ফেরেশ্তা ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যদের আখেরাতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য হাজির করা আল্লাহর পক্ষে কোনো কঠিন কাজ নয়। তাই এ আয়াত দ্বারা

---

[333].আল-কুরআন, সূরা নাহাল : ৮৬।

প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতে যেমন সকল উপাস্যদের হাজির করা হবে, তেমনি সে দিন ফেরেশ্তাদেরকেও হাজির করা হবে এবং মুশরিকরা তাদেরকে দেখে উক্ত ধরনের কথা বলবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা শুধু জড়পদার্থ বা চন্দ্র ও সূর্যেরই উপাসনা করে নি, তারা কোনো কোনো মূর্তিকে ফেরেশতাদের মূর্তি মনে করে তাদেরও উপাসনা করতো।[৩৩৪]

[334]. ইমাম কুরত্বুবী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

قوله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها وذلك أن الله يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يوردوهم الناروفي صحيح مسلم من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث خرجه من حديث أنس والترمذي من حديث أبي هريرة وفيه فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون وذكر الحديث قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك أي الذين جعلناهم لك شركاء فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أي ألقت إليهم الآلهة القول أي نطقت بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهة ولا أمرتهم بعبادتها فينطق الله الأصنام حتى تظهر ثم ذلك فضيحة الكفار وقيل المراد بذلك الملائكة الذين عبدوهمّ

আল-কুরত্বুবী, আবু অব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ, প্রাগুক্ত; ১০/১৬৩।

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَكَانُوا۟ قَوْمًۢا بُورًا ﴿١٨﴾ ﴾ [الفرقان: ١٧، ١٨]

"সে দিন আল্লাহ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদাত করতো তাদেরকে, সে দিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন: তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? তারা বলবে : আপনি পবিত্র, আমাদের পক্ষে আপনার পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা কোনভাবেই সম্ভবপর ছিল না; তবে তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হলো : আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।"[৩৩৫]

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সে সময়ের মুশরিকরা শুধু জড়পদার্থের মূর্তি বানিয়েই সেগুলোর পূজা করতো না। বরং তাদের অনেক মূর্তির পিছনে অতীতের জানা বা অজানা

---

335. আল-কুরআন, সূরা ফুরকান : ১৬-১৭।

কোনো মানুষ ও ফেরেশ্তার সম্পর্ক ছিল। সে জন্যই ইমাম ইবনে জারীর ত্ববারী এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন:

[يقول تعالى ذكره ويوم نحشر هؤلاء المكذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن]

"মহান আল্লাহ বলেন: যেদিন আমি আখেরাতে অবিশ্বাসী প্রতিমা পূজকদের এবং আল্লাহকে ব্যতীত তারা যে সব ফেরেশ্তা, মানুষ ও জিনদের উপাসনা করতো তাদেরকে একত্রিত করবো...।"[৩৩৬] এ ছাড়াও উপরে বর্ণিত আখেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশ্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত আয়াত থেকেও এ-কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, কিছু লোকেরা ফেরেশ্তাদেরও উপাসনা করতো। আর সে কারণেই আল্লাহ ফেরেশ্তাদেরকে সে লোকদের দ্বারা তাদের উপাসনা করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

উল্লেখ্য যে, আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ সংক্রান্ত এ সব আয়াত দ্বারা যাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে তারা যেমন আরবের মুশরিকরা হতে পারে, তেমনি এ সবের উদ্দেশ্য সে সময়ের আরবের খ্রিষ্টান ও ইয়াহূদীরাও হতে পারে; কেননা, সে সময়ের অনেক খ্রিষ্টান ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাঁর মূতি

[336]. ইবনে জারীর আত্ ত্বাবারী, প্রাগুক্ত; ১৮/১৮৯।

বানিয়ে পূজা করতো। তাদের মধ্যকার সৎমানুষদের কবরে গির্জা ও মূর্তি বানিয়ে সেখানে তাদের আরাধনা করতো। অনুরূপভাবে ইয়াহূদীরাও ‘উযায়ের আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাঁর উপাসনা করতো।

আরব জনপদে প্রচলিত শির্কী কর্মকাণ্ড :

আমরা আরব জনগণকে বিশেষ করে কুরায়শদেরকে মুশরিক বলে জানি; কিন্তু তাদের শির্কী কর্মকাণ্ড কী ছিল, তা বিস্তারিতভাবে আমাদের অনেকেরই জানা নেই। সে জন্য নিম্নে তাদের শির্কী কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হলো।

আমরা যখন তাদের শির্কী কর্মকাণ্ড জানার জন্য ক্বুরআন ও হাদীসের শরণাপন্ন হই, তখন তাদের শির্ককে শির্ক আকবারের চার প্রকারের মধ্যেই বিভক্ত দেখতে পাই। সে জন্য তাদের শির্কগুলোকে শির্কে আকবারের প্রকার অনুযায়ী সাজিয়ে বর্ণনা করা হলো।

কুরায়শ ও ‘আরবদের জ্ঞানগত শির্কী কর্ম

কাহিনদের কাছে ভাগ্য জানার জন্য যাওয়া : তৎকালের আরবের জনগণ কাহিন (Diviner)[৩৩৭] বা (গণক), আররাফ (Fortune

---

[337]. কাহিন বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে গোপন তথ্যাদি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার দাবী করে এবং সে অনুযায়ী ভবিষ্যতে কার ভাগ্যে কী ঘটবে, সে

teller)[৩৩৮]ও জ্যোতির্বিদদের (Astrologer)[৩৩৯] কথায় বিশ্বাস করতো এ ধারণার ভিত্তিতে যে, এরা গায়েব সম্পর্কে কম-বেশী জ্ঞান রাখে। সে জন্য তারা যা বলে তা অনেকটা সত্য হয়ে থাকে। এরা সবাই মানুষের ভাগ্য ও অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে মন্তব্য করতো, শর'য়ী দৃষ্টিতে কারো ব্যাপারে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত থাকার ধারণা করা শির্ক। সে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের কাছে যাওয়া ও তাদের কথায় বিশ্বাস করা থেকে মু'মিনদের বারণ করে বলেন :

সম্পর্কে জনগণকে আগাম সংবাদও দিয়ে থাকে। দেখুন : আল-জুরজানী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৮৩; সফিয়্যুর রহমান মুবারকপুরী আরেকটু বাড়িয়ে বলেন : "এদের কেউ কেউ দাবী করে যে, তাদের আনুগত্যকারী একটি জিন রয়েছে, আর সে জিনই তাদেরকে গোপন খবরাদি সরবরাহ করে।" দেখুন : সফিয়্যুর রহমান আল-মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৮।

[338]. আর-রাফ : এ ব্যক্তিও একধরনের গণক। কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ বা কারো কোন কাজ বা অবস্থা থেকে আগাম কিছু বিষয়াদি ও কারণ জানার মাধ্যমে গোপন জিনিষের স্থান সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করে। দেখুন : সফিয়্যুর রহমান আল-মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৮।

[339]. 'মুনাজ্জিম' বলা হয় সে ব্যক্তিকে, যে তারকারাজির গতিবিধি ও স্থানসমূহ লক্ষ্য করে এর মাধ্যমে সে ভবিষ্যতে জগতের অবস্থাদি ও ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে জানতে চায়। দেখুন : মুল্লাহ 'আলী আল-কারী, মিরক্কাতুল মাফাতীহ; (মুলতান : মাকতাবাহ ইমদাদিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ২/২, ৩।

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»

"যে ব্যক্তি কোন কাহিন তথা গণক অথবা ভবিষ্যত বক্তার কাছে গেল এবং সে-যা বলে তা বিশ্বাস করলো, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো।"[৩৪০]

জ্যোতির্বিদদের সম্পর্কে তিনি বলেন :

«مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ»

"যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যা অর্জন করলো সে যেন জাদু বিদ্যার একটি অংশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করলো, যে যত বেশী জানলো সে তত বেশী জাদু বিদ্যা অর্জন করলো।"[৩৪১]

সে সময়ের কাহিনরা ছিল জিন সাধক। জিনের সহযোগিতায়ই তারা মানুষের ভাগ্য ও অদৃশ্যে সংঘটিত হওয়া বিষয়াদি সম্পর্কে কথা বলতো। জিনরা উর্ধ্বাকাশে যেয়ে ফেরেশতাদের কথোপকথন শুনার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকতো। কখনও একটি কথা শুনলে এর সাথে একশ'টি মিথ্যা কথা

---

340. ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ২/৪০৮, ৪২৯, ৪৭৬।

341. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; কিতাবুত ত্বিব, বাব : তারকারাজী সম্পর্কে রাসূল যা বলেন; ৪/২২৬।

মিশিয়ে তাদের বন্ধু কাহিনের কাছে এসে বলতো।[৩৪২] এভাবে জিনদের সহযোগিতায় তারা পার্থিব দিক দিয়ে উপকৃত হতো। আর জিনরা সাধারণ জনমনে কাহিনদের ব্যাপারে অদৃশ্য সম্পর্কে জানার শির্কী ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে দিতে পারাকেই নিজেদের জন্য উপকার হিসেবে গণ্য করতো। জিনরা যে ফেরেশতাদের কথা শুনার জন্য উর্ধ্বাকাশে যেতো সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- জিনেরা বলে :

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝٨ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩ ﴾ [الجن: ٨، ٩]

"আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করে তা কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা পরিপূর্ণ দেখতে পেয়েছি। আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডকে ওৎ পেতে থাকতে দেখে।"[৩৪৩]

---

342. ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম; ২/৫৬৮।

343. আল-কুরআন, সূরা জিন : ৯, ১০।

কাহিন ও জিনদের পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হওয়া ও আখেরাতে তাদের কী পরিণতি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٢٨ ﴾ [الانعام: ١٢٨]

"যে দিন আমি সকলকে একত্রিত করবো, সেদিন জিনদেরকে লক্ষ্য করে বলবো : হে জিনসকল শুনো : তোমরা মানুষদের দ্বারা অতিমাত্রায় উপকৃত হয়েছো, (তখন) তাদের মানুষ বন্ধু (কাহিনরা) বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি, আমাদের জন্য আপনি যে সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, আমরা সে সময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ বলবেন : জাহান্নামই তোমাদের চিরস্থায়ী আবাস স্থল, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক খুবই বিজ্ঞ ও জ্ঞানী।"[৩৪৪]

কুরায়শ ও আরবদের পরিচালনাগত শির্কী কর্ম :

---

[344]. আল-কুরআন, সূরা আন'আম : ১২৮। শেখ আব্দুর রহমান ইবন হাসান আলুশ্ শায়খ, **ফতহুল মাজীদ**; (লাহুর : আনসারুস সুন্নাতিল মুহাম্মদিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), পৃ. ২৯৮।

দেবতারা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিতে সক্ষম : তারা মনে করতো যে, ওয়াদ, সুয়া‘ ও অন্যান্য আউলিয়া ও ফেরেশ্তাদের নামে নির্মিত লাত, উজ্জা ও মানাত নামের মূর্তি সমূহের আল্লাহর নিকটে অনেক মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে, তারা তাদের সে মর্যাদার মাধ্যমে তাদের ভক্তদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিতে সক্ষম। সে জন্যই শরীর ও অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাসনার মাধ্যমে তারা সে সব দেবতাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চাইতো। মূর্তির উপাসনার পিছনে এটাই যে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সে সম্পর্কে তারা স্পষ্ট করেই বলতো :

﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣]

“দেবতারা যাতে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়, কেবল সে উদ্দেশ্যেই আমরা তাদের উপাসনা করি।”[৩৪৫] তারা যেহেতু আখেরাতে বিশ্বাসী ছিল না, সেহেতু দেবতাদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পেরে আল্লাহর পক্ষ থেকে পার্থিব আরাম, আয়েশ ও সুখ, শান্তি লাভ করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।

---

[345]. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৩।

আউলিয়া নামের দেবতাদেরকে শাফা'আতকারী মনে করা :

তারা আউলিয়াদের নামে নির্মিত মূর্তি ও অন্যান্য দেবতাদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করতো যে, আল্লাহর সাথে এদের যে সম্পর্ক রয়েছে এবং তাঁর দরবারে এদের যে মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে, সে সবের বদৌলতে তারা আল্লাহর দরবারে শাফা'আত করে তাদের ভক্তদের পার্থিব কল্যাণ এনে দিতে এবং অকল্যাণ দূর করতে সক্ষম। তারা যে এমন ধারণা পোষণ করতো সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ ﴾ [يونس: ١٨]

"তারা বলতো: এরা (দেবতারা) আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা'আতকারী।"[৩৪৬]

আর এ-ধারণার ভিত্তিতেই তারা দেবতাদেরকে আহ্বান করে সেগুলোর নিকট তাদের বিভিন্ন আবেদন ও নিবেদন করতো।

দেবতার নিকট থেকে ভাগ্য যাচাই করা :

কোথাও যাওয়া বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্ম করার পূর্বে তারা হুবল দেবতার নিকটে রাখা ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করে নিতো। 'কাজ কর' এ মর্মে লিখিত তীর উঠলে এতে তারা

---

[346]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ১৮।

দেবতার অনুমতি রয়েছে বলে মনে করতো। তাদের এ কর্মসহ আরো কিছু কর্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ আর কিছু নয়।"[৩৪৭]

পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহে নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করা :

পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহে তারা নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করতো। কোন কোন তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হতো বলেও বিশ্বাস করতো।[৩৪৮] হাদীসে কুদসীতে এ-জাতীয় বিশ্বাসকে কুফরী বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করে মহান আল্লাহ বলেন,

« مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَ كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»

"... যে বলে অমুক অমুক তারকা উদিত বা অস্ত যাওয়ার ফলে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার সাথে কুফরী করলো এবং তারকার প্রভাবের প্রতি বিশ্বাসী হলো।"[৩৪৯]

---

[347]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ্ :৯০।

[348]. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব, **মাসাইলুল জাহিলিয়্যাহ;** (মদীনা : মাতাবিউ জামে'আতিল ইসলামিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, ১৩৯৬হিজরী), পৃ১২৮।

[349]. ৬১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদেরকে প্রতিপালকের বৈশিষ্ট্য দান করা:

তৎকালের ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মীয় আহবার ও রুহবানদেরকে হালাল ও হারাম নির্বাচনকারী বানিয়ে নিয়েছিল। তারা কোনো বস্তুকে হালাল বা হারাম বললে তারা সে বস্তুকে তা-ই জ্ঞান করতো। তাদের কিতাবাদিতে সে বস্তুটির বিধান তাদের কথার বিপরীত লেখা থাকলেও তারা সে লেখার প্রতি কোন কর্ণপাত করতো না। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ জাতীয় কর্মের সমালোচনা করে বলেন :

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]

“ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মগুরুদেরকে আল্লাহ তা‘আলার বদলে অসংখ্য প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছিল।”[৩৫০]

কোন কোন রোগ নিজ থেকে সংক্রমিত হয় বলে বিশ্বাস করা:

দাদ, একজিমা ও প্লেগ ইত্যাদি রোগ আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নিজ থেকে অন্যের গায়ে সংক্রমিত হয়ে থাকে বলে তারা বিশ্বাস করতো। অনুরূপভাবে কোথাও যাওয়ার সময় পথিমধ্যে সামনে দিয়ে কোনো পাখি বা বন্য হরিণ বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে এটাকে তারা যাত্রা শুভ বলে মনে করতো, আর ডান দিক থেকে বাম দিকে গেলে এটাকে যাত্রা অশুভ বলে মনে করতো।

---

[350]. আল-কুরআন, সূরা তাওবাহ : ৩১।

এমনিভাবে রাতের বেলা গাছের ডালে বা ঘরের উপরে বসে পেঁচা অথবা নাম না জানা কোনো পাখি আওয়াজ করলে এটাকেও তারা অশুভ লক্ষণ বলে মনে করতো। তাদের এ জাতীয় শির্কী বিশ্বাসের সমালোচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لاَ عَدْوَى وَ لاَ طِيَرَةَ وَ لاَ هَامَّ»

"আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কোনো রোগ নিজ থেকে অন্যত্র সংক্রমিত হয় না, কোনো পাখিও কারো ভাগ্যের মঙ্গল অমঙ্গল জেনে ডানে বা বামে উড়ে যায় না, পেঁচা বা নাম না জানা কোনো পাখি গাছের ডালে বা কারো ঘরের উপর বসে রাতের বেলায় ডাকলে তাতে কোন অমঙ্গল নেই।"[৩৫১]

আরব জনপদে প্রচলিত উপাসনাগত শির্কী কর্ম :

চন্দ্র ও সূর্যকে সেজদা করা :

তারা অন্যান্য দেবতাদের পাশাপাশি চন্দ্র ও সূর্যকেও তাদের দেবতা হিসেবে মনে করতো এবং তাদের সেজদা করতো।

---

[351]. ইবনে হাজার আল-আস-কালানী, ফতহুল বারী বিশরহিল বুখারী; কিতাবুত্তিব, বাব : কুষ্ঠরোগের বিবরণ, ১/১৫৮; মুসলিম, প্রাগুক্ত; ৪/১৭৪৩; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাগুক্ত; ১/১৭৪।

আল্লাহ মুশরিক ও মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য এদের সেজদা করতে নিষেধ করে বলেন :

﴿ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾ [فصلت: ٣٧]

"সূর্য ও চন্দ্রকে সেজদা করোনা, সেজদা করো কেবল সেই আল্লাহকে যিনি এদের সৃষ্টি করেছেন।"[৩৫২]

সূর্যের উপাসনা ও এর উপাসকদের উপাসনার সাথে যাতে আল্লাহর উপাসনার কোনরূপ সাদৃশ্য না হয় সে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করতে মুসলিমদের নিষেধ করেছেন।

দেবতাদের যিয়ারত করতে দূর-দূরান্তে গমন করা :

তারা বিভিন্ন গৃহ ও দেবতাদের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহকে কা'বা শরীফ ও এর প্রাঙ্গণের ন্যায় পবিত্র, বরকতময় ও শরীফ মনে করতো। সে জন্য পুণ্যার্জন, পবিত্রতা অর্জন ও দেবতাদের নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে তারা কা'বা শরীফের ন্যায় সে সব গৃহ ও দেবতাদেরকে দূর-দূরান্ত থেকে যিয়ারত করতে যেতো। মহান আল্লাহ তাদের অন্যান্য সকল গৃহ ও স্থানসমূহের পবিত্রতা বাতিল পূর্বক পবিত্রতা,

[352]. আল-কুরআন, সূরা ফুসসিলাত : ৩৭।

পূণ্যার্জন ও তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য সাধারণ উপাসনাদির পাশাপাশি যিয়ারতের জন্য শুধুমাত্র কা'বা শরীফের যিয়ারতের বিষয়টিকে যথারীতি বহাল রেখে এর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা যিয়ারতে যাওয়ার অনুমোদন দান করেন এবং কেবলমাত্র সামর্থ্যবানদের উপরেই কা'বা গৃহের যিয়ারত ফরয করে দিয়ে বলেন :

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ ﴾ [ال عمران: ٩٧]

"যারা কা'বা শরীফ যিয়ারতে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তা যিয়ারতে যাওয়া ফরয।"[৩৫৩]

কোনো মুসলিম যাতে পুণ্যার্জন, পবিত্রতা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত এ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদ বা অপর কোনো স্থানে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে না যায়, সে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«لا تَشُدَّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِيْ هٰذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ وَالْمَسْجَدُ الأَقْصَى»

353. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ৯৭।

"(পুণ্যার্জনের জন্য) তিন মসজিদ ব্যতীত অপর কোথাও সফর করা বৈধ নয়: (সেই মসজিদ তিনটি হচ্ছে:) আমার মসজিদ, মসজিদুল হারাম ও মসজিদে আকসা।"[৩৫৪]

দেবতাদের চারপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা :

তারা তাদের তৈরী গৃহ, পবিত্র স্থান ও দেবতাদের শরীফ মনে করে এর চার পার্শ্বে কা'বা শরীফের ন্যায় ত্বওয়াফ করতো।[৩৫৫] মহান আল্লাহ তাদের অন্যান্য সব কিছুর ত্বওয়াফ বাতিল করে দিয়ে কেবলমাত্র কা'বা শরীফের ত্বওয়াফ করাকে যথারীতি বহাল রেখে বলেন :

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]

---

[354]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল হজ্জ, বাব নং ৭৪, হাদীস নং ১৩৩৯; ২/৯৭৫; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, প্রাগুক্ত; ২/১৩৪। এ তিন মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর সকল মসজিদই আল্লাহর গৃহ হওয়া সত্ত্বেও যদি পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে অপর কোন মসজিদে দূর থেকে ভ্রমণ করে যাওয়া বৈধ না হয়, তবে দূর-দূরান্তে অবস্থিত কোন পীর বা আউলিয়াদের মাযারে পুণ্যার্জনের জন্য ভ্রমণ করে যাওয়া কোন ভাবেই বৈধ হতে পারে না।– লেখক।

[355]. কুরাইশগণ কা'বা গৃহের চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ করার সময় বলতো :

واللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى فإنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى

লাত, উয্যা ও তৃতীয় মানাত নামের দেবতা, তারা অত্যন্ত শক্তিধর, তাদের শাফা'আত কামনা করা যায়।" দেখুন : ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬২।

"তারা যেন প্রাচীন পবিত্র গৃহের ত্বওয়াফ করে।"[৩৫৬]

দেবতাদের পার্শ্বে অবস্থান করা (العكوف عند الأصنام) :

তারা দেবতাদের সন্তুষ্টি ও নিজেদের মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য নূহ আলাইহিস সালাম-এর জাতির লোকদের ন্যায় দেবতাদের পার্শ্বে বসে সময় কাটাতো। দেবতাদের পার্শ্বে এভাবে অবস্থান গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের আদি পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর জাতির লোকেরাও অভ্যস্ত ছিল। কুরাইশগণ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর ধর্মের অনুসারী বলে দাবীদার হওয়াতে এ জাতীয় অবস্থানের ফলে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির লোকদেরকে যা বলে তিরস্কার করেছিলেন, তা বর্ণনা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাদের এ অবস্থানের সমালোচনা করেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর পিতা ও জাতির লোকদের বলেছিলেন :

﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ ۝٥٢﴾ [الانبياء: ٥٢]

"এ মূর্তিগুলো কী, যাদের পার্শ্বে তোমরা অবস্থান গ্রহণ করো।"[৩৫৭] উল্লেখ্য যে, আল্লাহর তা'আলার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কিছু দিন নির্জনে একাগ্রচিত্তে অবস্থান করে আল্লাহ

---

[356]. আল-কুরআন, সূরা হাজ্জ : ২৯।

[357]. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ৫২।

তা'আলার যিকির ও ধ্যান করা একটি উত্তম কাজ। ইসলামী পরিভাষায় এ কাজকে এ'তেকাফ (اعتكاف) বলা হয়। তবে ইসলামে বৈরাগ্যপনা স্বীকৃত নয় বলে এ কাজটি শুধুমাত্র রমাযান মাসের শেষ দশ দিনে মসজিদে করার বিধান রয়েছে। কোন কবর, মাযার বা দরগাহে রমাযান মাসে বা অন্য সময়েও তা করা বৈধ নয়।[৩৫৮]

দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করা :

তারা পার্থিব কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য সরাসরি আল্লাহর নিকট তা প্রার্থনা না করে লাত, উয্যা ও মানাতের নিকট প্রার্থনা করতো এবং তারা আল্লাহর নিকট থেকে শাফা'আত করে তা এনে দিতে পারে বলে মনে করতো। মুসলিম ও মুশরিক নির্বিশেষে কেউ যাতে প্রার্থনা করার জন্য অন্য কারো শরণাপন্ন না হয় সে জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠ ﴾ [غافر: ٦٠]

---

358. তবে এ উপাসনা কোন কবর, মাযার, দরবার, দরগাহ বা মানুষের দ্বারা গৃহীত কোনো পবিত্র স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা বেদ'আত। এর মাধ্যমে কবরস্থ অলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে তাতে শির্ক হবে।- লেখক

“তোমরা আমাকে আহ্বান কর, আমি তোমাদের আহ্বানে জবাব দেব। যারা (আহ্বানগত) আমার উপাসনা থেকে মুখ ফিরাবে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”[৩৫৯]

দেবতাদের উদ্দেশ্যে হাদিয়া ও মানত দেওয়া :

তারা দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকমের বস্তু হাদিয়া ও মানত দিত। মানতের জন্তুসমূহ প্রতিমাদের উপর যবাই করে এর মাংস ভাগাভাগি করে নিতো। আল্লাহ তাদের এ জাতীয় মাংস হারাম করে দিয়ে বলেন :

﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣]

“যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে (পাথরের প্রতিমার উপর) যবাই করা হয় (তা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে)।”[৩৬০]

এ ছাড়াও দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে তারা কোনো কোনো খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি এবং ক্ষেত ও চতুষ্পদ জন্তুতে দেবতাদের অংশ নির্ধারণ করতো। তাদের এ জাতীয় কর্মের সমালোচনাপূর্বক আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ نَصِيبٗا فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ﴾ [الانعام: ١٣٦]

---

[359]. আল-কুরআন, সূরা গাফির : ৬০।

[360]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ্ : ৩।

“আল্লাহ যে সব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে, অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে: এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের অংশীদারদের।”[৩৬১]

তাদের এ জাতীয় কর্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَقَالُواْ هَٰذِهِۦٓ أَنۡعَٰمٞ وَحَرۡثٌ حِجۡرٞ لَّا يَطۡعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعۡمِهِمۡ وَأَنۡعَٰمٌ حُرِّمَتۡ ظُهُورُهَا وَأَنۡعَٰمٞ لَّا يَذۡكُرُونَ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا ٱفۡتِرَآءً عَلَيۡهِۚ﴾ [الانعام: ١٣٨]

“তারা বলে- এ সব চতুষ্পদ জন্তু, শস্যক্ষেত্র ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ তাদের ধারণামতে আমরা যাকে ইচ্ছা করি কেবল সে ছাড়া অন্য কেউ তা খেতে পারবে না। আর কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা ভ্রান্ত ধারণাবশত আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না।”[৩৬২]

---

[361]. আল-কুরআন, সূরা আন‘আম : ১৩৬।

[362]. আল-কুরআন, সূরা আন‘আম : ১৩৮।

বরকত হাসিলের জন্য দেবতাদের গায়ে হাত বুলানো :

তারা বরকত ও কল্যাণ হাসিলের জন্য মূর্তির গায়ে হাত বুলাতো। কোথাও সফরে যাওয়ার পূর্বে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাদের সর্বশেষ কাজই হতো মূর্তির গায়ে হাত বুলানো এবং সফর শেষে বাড়ী ফিরলে ঘরে প্রবেশ করে প্রথম কাজই হতো মূর্তির গায়ে হাত বুলানো। তাদের এ জাতীয় বরকত হাসিলের কর্ম নিষিদ্ধ করে দিয়ে কেবল কা'বা শরীফের ডান পার্শ্ব, কৃষ্ণ পাথর (الحجر الأسود) ও কা'বা শরীফের দরজা থেকে হাত্বীম পর্যন্ত দেয়ালকে বরকত হাসিলের জন্য স্পর্শ বা চুম্বন করার অনুমতি প্রদান করা হয়[363]। যার প্রমাণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অন্তরের উপাসনার ক্ষেত্রে তাদের শির্ক :

দেবতাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা : তারা তাদের দেবতাদেরকে আল্লাহর ন্যায় ভালবাসতো। আল্লাহকে ভালবেসে যেমন আল্লাহর উপাসনা করতো, তেমনি দেবতাদের ভালবেসে তাদেরও উপাসনা করতো। তাদের এমন ভালোবাসার প্রতি ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ বলেন,

[363] আমরা আগেই জেনেছি যে কৃষ্ণ পাথর ও কাবার ডান পার্শ্ব ব্যতীত আর কোনো অংশ ধরা বা ছোয়ার ব্যাপারে সহীহ হাদীস নেই। [সম্পাদক]

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

“মানুষের মাঝে এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর অনেক সমকক্ষ নির্ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসার মতই ভালবাসে।”[৩৬৪]

দেবতাদের অনিষ্টের গোপন ভয় করা :

তারা মনে করতো যে, তাদের দেবতাদের কেউ বেআদবী করলে বা তাদের সমালোচনা করলে দেবতারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে কোন অনিষ্ট সাধন করতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেবতা ও মূর্তিসমূহের সমালোচনা করার ফলে তাঁকেও তারা তাদের দেবতাদের অনিষ্টের গোপন ভয় দেখাতো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ﴾ [الزمر: ٣٦]

“আল্লাহ ব্যতীত তাদের যে সব দেবতা রয়েছে, তারা তোমাকে সে সবের অনিষ্টের ভয় প্রদর্শন করে।”[৩৬৫]

---

[364]. আল-কুরআন, সূরা আন‘আম : ২৭।

[365]. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৩৬।

বিপদে দেবতাদের শরণাপন্ন হওয়া :

ইহকালীন প্রয়োজন বা বিপদাপদ দূরীকরণের জন্য তারা তাদের দেবতাদের শরণাপন্ন হতো। আল্লাহর কল্যাণ তাঁর নিকট সরাসরি না চেয়ে নিজেদের অক্ষমতা দেবতাদের কাছে পেশ করে, তাদের নিকট অনুনয় বিনয় করে তাদের মাধ্যমে আল্লাহর অনুকম্পা ও কল্যাণ লাভ করতে চাইতো। আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পা লাভের জন্য এ পদ্ধতি পরিহার করে সরাসরি আল্লাহর নিকটে তাঁর দয়া কামনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ﴾ [الزمر: ٥٤]

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও এবং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর।"[৩৬৬]

বিপদে দেবতাদেরকে আশ্রয়স্থল হিসাবে মনে করা :

কোন বিপদ হলে বা কোন অকল্যাণ পেয়ে বসলে তারা তাদের দেবতাদের শরণাপন্ন হতো, তাদেরকে তাদের আশ্রয় স্থল হিসেবে মনে করতো। আল্লাহর এ জগতে তিনি ব্যতীত মানুষের জন্য অপর কোন আশ্রয় স্থল নেই; সে জন্য তিনি তাঁর রাসূলকে দিয়ে এ ঘোষণা দিতে বলেন :

---

[366]. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৫৪।

﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴾ [الجن: ٢٢]

“আপনি তাদের বলুন: আল্লাহ তা‘আলার পাকড়াও থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি অপর কোন আশ্রয়স্থলও পাব না।”[৩৬৭]

দেবতাদের উপর ভরসা করা :

তারা বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে তাদের দেবতাদের উপর ভরসা করতো। তাই মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]

“যদি তোমরা মু’মিন হয়ে থাকো, তা হলে একমাত্র আল্লাহর উপরেই ভরসা করো।”[৩৬৮]

আরব জনপদে প্রচলিত অভ্যাসগত শির্ক :

দেব-দেবীদের নামে শপথ করা :

কোন কোন দেব-দেবীদের নামকে তারা বরকতময় ও সম্মানিত মনে করতো। তাদের নামে মিথ্যা শপথ করলে শপথকারীর পরিবার ও সহায় সম্পদে ক্ষতি হবার সমূহ আশঙ্কা

---

[367]. আল-কুরআন, সূরা জিন : ২২, ২৩।

[368]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ্ : ২৩।

করতো। যার ফলে তাদের নামে কেউ মিথ্যা শপথ করতে রাজি হতো না। গায়রুল্লাহের নামে শপথ করলে এতে গায়রুল্লাহর সম্মান করা হয় বিধায়, তা শির্কের অন্তর্গত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»

"যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে শপথ করলো, সে শির্ক করলো।"[৩৬৯]

দেব-দেবীদের নামে সন্তানাদির নাম রাখা :

তারা দেব-দেবীদের বরকত প্রাপ্তির জন্য সন্তানাদির নাম 'আব্দুল উজ্জা, 'আব্দে শামস ইত্যাদি রাখতো।

দেব-দেবীদের নিকট সন্তানের জন্য কল্যাণ কামনা করা :

নবজাত শিশুদের নিয়ে দেব-দেবীদের কাছে গমন করে শিশুর জন্য তাদের নিকট থেকে কল্যাণ কামনা করতো।

তাদের এ-কর্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

---

[369]. তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আইমান ওয়ান নুজুর, বাব : গায়রুল্লাহের নামে শপথ করা মকরূহ; ৪/১১০; আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আইমান ওয়ান নুজূর, বাব নং ৪, হাদীস নং ৩২৫১; ৩/২২৩; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ১/৪৭।

﴿ ۞هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ إِلَيۡهَاۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتۡ حَمۡلًا خَفِيفٗا فَمَرَّتۡ بِهِۦۖ فَلَمَّآ أَثۡقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنۡ ءَاتَيۡتَنَا صَٰلِحٗا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ۝١٨٩ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحٗا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَاۚ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ۝١٩٠ ﴾ [الاعراف: ١٨٩، ١٩٠]

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র সত্তা থেকে; আর তাথেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করলো (নারী পুরুষ উভয়ে দৈহিকভাবে মিলিত হল) তখন সে গর্ভবতী হলো অতি হালকা গর্ভে। সে তা নিয়ে চলাফেরা করতে লাগলো। এরপর যখন বোঝা হয়ে গেল তখন তারা উভয়েই তাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ডাকলো এই বলে যে, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ সন্তান দান করো, তবে আমরা তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করবো। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে সুস্থ সন্তান দান করলেন, তখন দানকৃত সে সন্তানে তারা তাঁর অংশীদার তৈরী করতে লাগলো। বস্তুত আল্লাহ তাদের শরীক সাব্যস্ত করা থেকে বহু উর্ধ্বে।"[৩৭০]

আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কোন বস্তু হালাল বা হারাম করা :

---

[370]. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ : ১৮৯-১৯০।

আল্লাহর হালালকৃত কোন কোন বস্তুকে তারা নিজ থেকে কারো জন্যে হালাল ও কারো জন্যে হারাম করে নিতো এবং বলতো যে, এ হালাল বা হারাম আল্লাহই করেছেন। যেমন তারা একটি উট একাধারে দশটি মাদী বাচ্চা জন্ম দিলে এ উটটিকে তারা দেবতাদের জন্য মুক্তভাবে ছেড়ে দিত, কেউ এর পিঠে আরোহণ করতো না, এর গায়ের পশমও নিত না, মেহমান ছাড়া অন্য কারো জন্যে এর দুগ্ধ পান করাকে বৈধ মনে করতো না। এ ধরনের উটকে তারা 'সা-ইবাহ' বলে নামকরণ করতো। এ 'সা-ইবাহ' উটটি পরবর্তীতে আরো একটি মাদী বাচ্চা জন্ম দিলে এ বাচ্চাটিকে 'বহীরাহ' নামকরণ করে এর কান ছিদ্র করে দিয়ে এটাকে তার মায়ের সাথে ছেড়ে দিত এবং এর সাথে তার মায়ের মতই আচরণ করতো।[৩৭১]

অনুরূপভাবে একটি বকরী পরপর পাঁচ বারে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করলে এবং এদের সাথে কোন নর বাচ্চা না থাকলে মহিলাদের জন্য তারা সে বকরীর মাংস ভক্ষণ করা হারাম বলে গণ্য করতো। এ বকরীটি মরে গেলে তা আবার মহিলাদের পক্ষেও ভক্ষণ করা হালাল বলে মনে করতো। এ ধরনের বকরীকে 'ওয়াসীলাহ' বলে নামকরণ করতো।[৩৭২]

---

[371]. সফিয়্যুর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৬।

[372]. তদেব।

অনুরূপভাবে একটি পুরুষ উট অপর মাদী উটের সাথে রমন ক্রিয়া সম্পাদন করার ফলে কোন নর সন্তান ছাড়াই একাধারে দশটি মাদী সন্তান প্রসব করলে এ পুরুষ উটের উপর আরোহণ করা ও এর পশম আহরণ করাকে হারাম বলে গণ্য করতো। এ ধরনের উটকে তারা 'হামী' বলে নামকরণ করতো।[৩৭৩]

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ জাতীয় খারাপ কাজ ও কুপ্রথা বা অভ্যাস সম্পর্কে বলেন :

﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ١٠٣ ﴾ [المائدة: ١٠٣]

"মহান আল্লাহ 'বহীরাহ, সা-ইবাহ, ওয়াসীলাহ এবং হামীকে শরী'আত সিদ্ধ করেন নি। কিন্তু যারা কাফের তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বুদ্ধি নেই।"[৩৭৪]

তারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে এ সব কর্মকে ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।[৩৭৫]

---

373. তদেব।

374. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ্ : ১০৩।

375. মুফতী মুহাম্মদ শফী', মা'আরেফুল ক্বুরআন; অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মহিউদ্দীন খান, (মদিনা : সৌদি আরব, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), পৃ.৪১৬।

শির্কযুক্ত কথার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক দেয়া :

তারা শির্কযুক্ত কথা-বার্তা (মন্ত্রের ন্যায়) পাঠ করে রোগীদের ঝাড়ফুঁক করতো।

‘আউফ ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

«كُنَّا نَرْقَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقُلْنَا لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ تَرَى ذٰلِكَ؟ فَقَالَ :أَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ. لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ»

“আমরা জাহেলী যুগে ঝাড়ফুঁক দান করতাম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম : আপনি এগুলো কী মনে করেন? তিনি বলেন : “তোমরা যা বলে ঝাড়ফুঁক দিয়ে থাকো তা আমাকে পড়ে শুনাও, ঝাড়ফুঁকে কোন দোষ নেই, যদি তা শির্ক মুক্ত হয়।”[৩৭৬] এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা শির্কযুক্ত কথা-বার্তা মন্ত্রের ন্যায় পাঠ করে বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে ঝাড়ফুঁক দান করতো।

---

[376].মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুস সালাম, বাব নং ২২ (শির্কমুক্ত ঝাড়ফুক বৈধ হওয়ার বর্ণনা) হাদীস নং ২২০০; ৪/১৭২৬; আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; কিতাবুত ত্বিব, বাব : মা জা-আ ফির রুক্বা; ৪/২১৪; আবু জা‘ফর ত্বহাবী, আহমদ ইবন মুহাম্মদ, শরহে মা‘আনী আল-আ-ছার; সম্পাদনা : মুহাম্মদ যুহরী আন-নাজ্জার, (বৈরুত : দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৯হি.), ৪/৩২৮।

শিশুদের তা'বীজ পরানো:

চোখের অশুভ দৃষ্টি (নজর লাগা) থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য তারা বাচ্চাদের গায়ে তা'বীজ ব্যবহার করতো। একই উদ্দেশ্যে তারা উটের গলায় ধাতু নির্মিত তারের মালা ঝুলিয়ে রাখতো। তা'বীজ বা ধাতু নির্মিত তারের মালা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল বিনষ্টকারী হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»

"যে তা'বীজ ঝুলালো সে শির্ক করলো।"[৩৭৭]

কোনো উটের গলায় তার বা হার ঝুলানো দেখলে তা কেটে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন:

«لاَيَبْقَيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةً مِنْ وَتَرٍ ، وَ لاَ قِلاَدَةً إِلاَّ قُطِعَتْ»

"কোনো উটের গলায় ধাতব দ্রব্য দ্বারা নির্মিত তারের হার অবশিষ্ট রাখবে না, গলায় ঝুলানো হার পেলেই তা কেটে দিবে।"[৩৭৮]

---

[377]. ইমাম আহমদ. প্রাগুক্ত; ৪/১৫৬।

[378]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জিহাদ, বাব নং ১৩৯; ২/৪/১৪৩; আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; ৩/৫২।

তিনি আরো বলেন :

«إِنَّ الرُّقَى وَ التَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»

"(শির্ক যুক্ত) ঝাড়ফুঁক, তা'বীজ ও জাদু শির্ক।"[৩৭৯]

শিশুদের গলায় ঝিনুকের মুক্তা ঝুলিয়ে রাখা :

শিশুরা যাতে অশুভ দৃষ্টির হাত থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত-শিষ্ট হয়, সে-জন্য তাদের গলায় ঝিনুক থেকে আহরিত মুক্তা ঝুলিয়ে রাখতো। যারা উক্ত উদ্দেশ্যে তা ঝুলায় তাদের জন্য বদ দু'আ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«مَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ»

"যে (কোন কিছুর অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য) ঝিনুক থেকে আহরিত মুক্তা শরীরে ঝুলায় আল্লাহ যেন তার সে অকল্যাণ দূর না করেন।" [৩৮০]

রোগ নিরাময়ের জন্য ধাতব দ্রব্য নির্মিত বালা ব্যবহার করা:

তারা বাত রোগ নিরাময়ের জন্য খণিজ (ধাতব) দ্রব্য দ্বারা নির্মিত বালা হাতে পরিধান করতো। ইমরান ইবন হুসাইন

---

[379]. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; কিতাবুত ত্বিব, বাব নং ১৭, (তা'লীকিত তামাইম), হাদীস নং ৩৮৮৩; ৪/৯; বায়হাক্বী, প্রাগুক্ত; ৯/৩৫০।

[380]. ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ৪/১৫৪।

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে হাতে স্বর্ণের বালা পরিধান করা অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন : "ওটা কী? লোকটি বললো : 'ওয়াহিনা' নামক রোগ থেকে (যা স্কন্ধ বা হাতের শিরায় হয়ে থাকে) আরোগ্য লাভের জন্য এটি পরেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন :

«أَنْزِعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ إِلاَّ وَهْناً، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَداً»

"তুমি এটি খুলে ফেল, কারণ এটি তোমার রোগ বৃদ্ধি ছাড়া কোন উপকার করবে না, তুমি যদি এটি হাতে পরিধান করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, তা হলে কস্মিনকালেও তুমি সফল হতে পারবে না, অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।"[৩৮১]

মূর্তি ও প্রতিমার স্থলে মেলা বসানো :[৩৮২]

তারা তাদের মূর্তি ও প্রতিমাসমূহের স্থলে বার্ষিক মেলা বসাতো। এ উপলক্ষে লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে নিজেদের নানাবিধ প্রয়োজন দেব-দেবীদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য আগমন করতো। তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নানা রকম নজর, নিয়াজ ও হাদিয়া তুহফা দান করতো। আমাদের রাসূল বা অপর

---

[381]. ইবন মাজাহ; কিতাবুত ত্বিব, বাব : যিয়ারতিল কবরি; ২/৫৩৪।

[382]. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৩।

কারো কবর, কিংবা কোন স্থান ও সময়কে কেন্দ্র করে মুসলিমদের মাঝে যাতে এমন কোনো মেলার প্রচলন না হয়, সে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْداً»

"তোমরা আমার কবরকে ঈদ তথা মেলার স্থানে পরিণত করো না।"[৩৮৩]

নবী ও অলিদের কবরে মসজিদ নির্মাণ করা :

ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের নবী ও অলিদের মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল। তাঁদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করেছিল। সে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর অভিসম্পাত করে বলেন :

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد»

"আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর অভিসম্পাত করেছেন, তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।"[৩৮৪]

---

[383]. টীকা নং ১৬২ দ্রষ্টাব্য।

[384]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জানাইয, বাব : বয়ান কারাহাতি ইত্তেখাজিল মাসাজিদি 'আলাল কাবরি; ১/৩/১৮৮; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল মসজিদ, বাব নং ৩; ১/৩৭৭।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন :

«فَلَوْ لاَ ذلِكَ لأَبْرَزَ قَبْرَهُ غَيْرَ أَنَّه خَشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِداً»

"লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরকে ভবিষ্যতে মসজিদ বানানোর ভয় না থাকলে তাঁর কবর ঘরের বাইরে প্রকাশ্য স্থানেই প্রদান করা হতো।"[৩৮৫]

পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা :

তারা পশু ও পাখিকে নিজ স্থান থেকে ধমক দিয়ে সরিয়ে বা উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতো। পশু বা পাখি ডান দিকে উড়ে গেলে এটাকে শুভ লক্ষণ হিসেবে গণ্য করতো। আর বাম দিকে গেলে এটাকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করতো।[৩৮৬] এ জাতীয় কর্ম শির্কের অন্তর্গত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاَثاً»

"পাখি উড়িয়ে দেয়া থেকে ভাগ্যের শুভ বা অশুভ নির্ধারণ করা শির্ক। (এ কর্মটি যে শির্ক তা গুরুত্বের সাথে বুঝাবার জন্য)

---

[385]. তদেব।

[386]. সফিয়্যুর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৮।

এ কথাটি তিনি তিন বার বলেন।”[৩৮৭]

অশুভ ধারণা :

তারা কোনো কোনো দিবস, মাস, কোনো পশু-পাখি, গৃহ ও মহিলাদেরকে অশুভ ও মন্দ বলে ধারণা করতো।[৩৮৮]

উপত্যকার জিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা :

সফরে গিয়ে কোনো উপত্যকায় অবতরণ করলে সে উপত্যকার জিন সরদারের নিকট তারা আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতো :

«أَعُوْذُ بَسَيِّدِ هَذَا الْوَادِيْ مِنْ شَرِّ سُفَهَاءِ قَوْمِهِ»

“এই উপত্যকার সরদারের নিকট তার জাতির দুষ্টদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[৩৮৯] কুরআনুল কারীমে তাদের এ জাতীয় প্রার্থনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝٦ ﴾ [الجن: ٦]

---

387. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; কিতাব নং ২৩ (কিতাবুন রাআহু), বাব নং ২৪, হাদীস নং ৩৯১০, ৪/১৭।

388. সফিয়্যুর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৮; ইবনে হাজার, ফাতহুলবারী; ৬/৬১।

389. ইকনে কাছীর, তাফছীরুল ক্বুরআনিল ‘আযীম; ২/১২৮ ও ৪/৪৫৭।

“মানুষের মধ্যকার কিছু লোকেরা জিনদের মধ্যকার কিছু জিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতো, ফলে আশ্রিত জিনেরা তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের ভয় আরো বাড়িয়ে দিতো।”[৩৯০]

বরই গাছ দ্বারা বরকত গ্রহণ করা :

তারা ‘যাতে আনওয়াত্ব’ নামের একটি বরই গাছ দ্বারা বরকত অর্জন করতো। এ গাছে তারা তাদের অস্ত্র ও মালপত্র ইত্যাদি বেধে ঝুলিয়ে রাখতো। এ গাছের সম্মান করতো, এর উদ্দেশ্যে মানত করতো ও এর নিচে অবস্থান গ্রহণ করতো। একটি গাছকে কেন্দ্র করে এ ধরনের কাজ করা শির্ক, এ বিষয়টি না জানার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ সে গাছটি দেখে তাঁকে বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য অনুরূপ একটি গাছ নির্বাচন করে দিন। তখন তিনি তাদেরকে এই বলে ধমক দিয়েছিলেন :

«إِنَّكُمْ طَلَبْتُمْ مِثْل مَا طَلَبَ بَنُوْاإِسْرَائِيْلُ مِنْ مُوْسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ»

“তোমরা ঠিক সে রকমই আবেদন করেছো যেমন বনী ইস্রাঈলরা মূসা আলাইহিস সালাম-এর নিকট তাদের শত্রুদের দেবতাদের

---

390. আল-কুরআন, সূরা জিন : ৬।

অনুরূপ একটি দেবতা নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য আবেদন করেছিল।”[৩৯১]

কুরায়শ ও আরবদের দাবী :

কুরায়শ ও আরব জনগণের ধর্মীয় অজ্ঞতার সুযোগে শয়তান তাদের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শির্ক প্রবেশ করিয়ে দিয়ে থাকলেও তারা নিজেদেরকে দ্বীনে ইব্রাহীমের যথার্থ অনুসারী বলে দাবী করতো। কার্যত তাদের মাঝে দ্বীনে ইব্রাহীমের কিছু উপাসনা ও আচার-অনুষ্ঠান যেমন : কা‘বা শরীফের সম্মান করা, এর ত্বওয়াফ করা, হজ্জ ও ‘উমরা করা, আরাফা, মিনা ও মুযদালিফায় অবস্থান করা এবং সেখানে উট উৎসর্গ করা ইত্যাদি ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এ সব অনুষ্ঠান সম্পাদনের ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বেদ‘আতী কর্মকাণ্ডও সংযোজন করেছিল। সে সকল বেদ‘আতের মধ্যকার একটি বেদ‘আত এমন ছিল যে, কুরায়শগণ মনে করতো অন্যান্য লোকদের চেয়ে তাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আরবের অপর কোনো গোত্রই তাদের সাথে সে বৈশিষ্ট্যে শরীক হতে পারে না। এ বৈশিষ্ট্যের কথা ভেবে তারা অন্যান্য মানুষের সাথে

---

[391]. তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ফিতন..., বাব নং ১৮, হাদীস নং ২১৮০; ৪/৪৭৫।

আরাফায় অবস্থান করা থেকে বিরত থাকতো। এর বদলে তারা মুযদালিফায় অবস্থান গ্রহণ করতো এবং সেখান থেকেই মক্কায় ফিরে আসতো। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ কর্মকে অপছন্দ করেন এবং কাফির ও মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে সাধারণ মানুষদের ন্যায় আরাফা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার নির্দেশ দান করে বলেন :[৩৯২]

﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]

"অতঃপর তোমরা (মক্কায়) ফিরে এসো যেখান থেকে (সাধারণ) লোকেরা ফিরে আসে।"[৩৯৩]

তাদের অপর একটি বেদ‘আত ছিল যে, তারা বলতো হরমের বাইরের লোকজন হজ্জ বা ‘উমরা পালনার্থে হরমে আগমন করলে তারা তাদের সাথে নিয়ে আসা খাবার হরমের মধ্যে খেতে পারবে না।[৩৯৪]

তাদের অপর একটি বেদ‘আত এমন ছিল যে, তারা হারামের বাইরের জনগণের প্রতি এ নির্দেশ জারী করেছিল যে, তারা হরমে

---

[392].বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুত তাফসীর, বাব নং ৩৭, হাদীস নং ৪২৪৮, ৪/১৬৪৩; ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত; ১/১১৯।

[393]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ১৯৯।

[394]. সফিয়্যুর রহমান মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৯।

আসলে বিশেষ ধরনের বস্ত্র ছাড়া কা'বা শরীফের প্রথম ত্বওয়াফ করতে পারবে না। সে কারণে উক্ত বস্ত্র কেউ সংগ্রহ করতে অপারগ হলে উলঙ্গ অবস্থায়ই তাকে ত্বওয়াফ করতে হতো। মহিলারা সে কাপড় সংগ্রহ করতে না পারলে বুক খোলা রেখে ত্বওয়াফ করতো এবং বলতো :

"আজ শরীরের পূর্ণ বা অংশবিশেষ অনাবৃত থেকে যাচ্ছে, যা অনাবৃত থেকে যাচ্ছে তা অনাবৃত রাখাকে আমি হালাল মনে করি না।"[৩৯৫]

তাদেরকে এভাবে উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা শরীফের ত্বওয়াফ করা থেকে বারণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ ۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ [الاعراف: ٣١]

"হে আদম সন্তানরা! মসজিদে আগমনের সময় তোমরা পোশাকাদি পরিধান করে সৌন্দর্য গ্রহণ করো।"[৩৯৬]

অনুরূপভাবে তারা ইহরাম পরিহিত অবস্থায় তাদের বাসগৃহের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে জায়েয মনে করতো না।

---

[395]. তারা বলতো : "اليوم يبدو بعضه أو كله ** و ما بدا منه فلا أحله" দেখুন : ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত; ১/২০২, ২০৩; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুত তাফসীর, বাব নং ১, হাদীস নং ৩০২৮, ৪/২৩২০।

[396]. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ : ৩১।

তাই গৃহে প্রবেশের জন্য তারা ঘরের পিছনের দেওয়ালে একটি ছিদ্র করে তা দিয়ে প্রবেশ করতো এবং এ কাজকে তারা একটি পুণ্যের কাজ হিসেবে মনে করতো। তাদের এ কর্মের সমালোচনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٨٩﴾ [البقرة: ١٨٩]

"ঘরের পিছন দিয়ে গৃহে প্রবেশ করা কোনো কল্যাণের কাজ নয়, কল্যাণের কাজতো তা-ই যে তাকওয়া অর্জন করলো। কাজেই তোমরা দরজা দিয়েই ঘরে প্রবেশ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পার।"[৩৯৭]

মোদ্দাকথা :

উপরে মূর্তি, প্রতিমা পূজা এবং শির্ক ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ যে ধর্মের কথা আলোচিত হলো তা ছিল প্রায় সকল আরবদেরই ধর্ম। এ আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, কুরায়শ ও আরবগণ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর ধর্মের ক্ষেত্রে যে বিকৃতি আনয়ন করেছিল, তা শির্কের সকল প্রকারকেই শামিল করেছিল। অনুরূপভাবে তারা আল্লাহর উপাসনার ক্ষেত্রেও বিকৃতি সাধন

---

397 . আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ১৮৯।

করেছিল, যা তাদের নিকট উত্তম বেদ‘আত হিসেবে গণ্য ছিল। তাদের যাবতীয় শির্কী ও বেদ‘আতী বিশ্বাস ও কর্মই তাদেরকে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর দ্বীন থেকে সম্পূর্ণভাবে বের করে দিয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলাকে একক সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং দ্বীনে ইব্রাহীমের কিছু কর্ম করে এর অনুসারী বলে তাদের শত দাবী থাকা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাদেরকে কাফির ও মুশরিক বলে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহর স্বীকৃতি, কা‘বা শরীফের ত্বওয়াফ ও সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি ভাল কর্ম করা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃষ্টিতে তারা মুসলিম থাকতে পারে নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, যুগে যুগে দ্বীনে মুহাম্মদীর অনুসারীদের মধ্যে যারা কুরায়শ ও আরব জনগণের অনুরূপ হবে, তারাও দ্বীনে মুহাম্মদীর অনুসারী হওয়ার শত দাবী করে থাকলেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে তারা মুসলিম থাকতে পারবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলাম পূর্ব যুগসমূহের মানুষের শির্কে লিপ্ত হওয়ার কারণ

মানব সমাজে শির্ক সংঘটিত হওয়ার সূচনা লগ্ন থেকে নিয়ে ইসলাম পূর্ব যুগ পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ের মানুষের শির্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য নিম্নেবর্ণিত কারণসমূহকে দায়ী করা যেতে পারে :

প্রথম কারণ : সৎ মানুষদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে শরী'আতের সীমালঙ্ঘন :

জ্ঞানী, গুণী ও মর্যাদাবানদের প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শন করা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষ কখনও এ প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হতে পারে না। যে ব্যক্তি মানুষের অবদান ও উপকারকে স্মরণ করে তাদের কৃতজ্ঞ হতে পারে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞ হতে পারে না। মানুষ স্বীয় চরিত্র ও কর্মগুণে সাধারণ মানুষের প্রশংসা ও সম্মান পেতে পারে। কিন্তু তাই বলে কোনো মানুষ কখনও আল্লাহর সম প্রশংসা ও সম্মান পাবার যোগ্য হতে পারে না। সে জন্য কারো প্রশংসা ও সম্মান করে তাঁকে রব ও ইলাহের স্তরে পৌঁছে দেয়া যাবে না। তাই কোন মানুষের তা'যীম ও সম্মান করতে হলে অবশ্যই তা শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত সীমারেখার মধ্যে থেকেই করতে হবে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, শয়তান মানব জাতিকে প্রথম

থেকেই তাদের গুরুজনের সম্মান প্রদর্শনের বৈধ পন্থা থেকে বিচ্যুত করেছে। তাদের বুদ্ধি ও বিবেককে নিয়ে শুরু থেকেই সে তামাশায় লিপ্ত হয়েছে। পরিণতিতে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে নিমজ্জিত করেছে। শীছ আলাইহিস সালাম-এর সন্তানদেরকে আদম আলাইহিস সালাম-এর কবরের চার পার্শ্বে ত্বওয়াফে লিপ্ত করেছে[398]। ওয়াদ্দ, সুয়া', য়াগুছ, য়া'উক ও নছর এর অনুসারীদেরকে দিয়ে তাঁদের সম্মান, স্মরণ ও আল্লাহর উপাসনায় আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের আকৃতিতে হাজির হয়ে তাঁদের মূর্তি নির্মাণ করার প্রস্তাব দিয়েছে এবং মূর্তি নির্মাণ করে দিয়েছে। অতঃপর তিন প্রজন্ম যেতে না যেতেই জনগণকে আল্লাহর নিকট সে পাঁচ জনের শাফা'আত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় তাদেরকে সে পাঁচ জনের উপাসনায় লিপ্ত করেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী ও সৎ মানুষদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেই মানুষেরা প্রারম্ভে শির্কের মধ্যে পতিত হয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম এ প্রসঙ্গে বলেন :

"এটিই হচ্ছে সাধারণ মানুষদের শির্কে নিমজ্জিত হওয়ার শ্রেষ্ঠ কারণ। আর বিশেষ লোকদের শির্কে লিপ্ত হওয়ার কারণ

[398] যদিও এ ঘটনাটি কোনো সঠিক বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয় নি। [সম্পাদক]

হলো: তারা সে সব তারকার কাল্পনিক মূর্তি নির্মাণ করেছিল যাদের এ পৃথিবী পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভাব রয়েছে বলে তারা ধারণা করেছিল এবং এ সকল মূর্তির জন্য গৃহ নির্মাণ করেছিল, এর জন্য খাদেম ও রক্ষী নিয়োগ করেছিল, এর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য হজ্জ ও কুরবানীর প্রচলন করেছিল। প্রাচীন ও আধুনিক কালের মানুষের মাঝে এর প্রচলন যথারীতি বর্তমান রয়েছে।"[৩৯৯]

আদম সন্তানদের সাথে শয়তানের খেলা এ পর্যন্তই শেষ হয়ে যায় নি; বরং সে সকল দিক থেকেই তাদেরকে তার বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে। অবশেষে সে তাদেরকে কা'বা শরীফের আঙ্গিণায় ছড়িয়ে থাকা পাথরের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করতে শিখিয়েছে। তাই তারা মক্কার বাইরে বসবাসের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় তাদের সাথে কা'বা শরীফের আঙ্গিণার একটি পাথর বহন করেছে এবং বসবাসের স্থানের এক পার্শ্বে সে পাথরটি যত্নের সাথে রেখে কা'বা শরীফের ন্যায় এর চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ করেছে। সাথে পাথর নিয়ে না গেলে অবতরণ স্থলের একটি সুন্দর পাথর বেছে নিয়ে এক স্থানে তা যত্নের সাথে রেখে দিয়ে এর চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ করেছে। এমনকি উপত্যকায় পাথর না পেলে মাটি বা বালু একত্রিত করে এর উপর ছাগলের দুগ্ধ দোহন করে তা

[399]. ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, এগাছাতুল লাহফান; ২/১৭৪।

শুকিয়ে জমাট বেঁধে শক্ত হওয়ার পরে এর চার পার্শ্বেও ত্বওয়াফ করেছে। শয়তান তাদেরকে এ ধারণা দিয়েছে যে, এভাবে পাথর বা বালুর পার্শ্ব দিয়ে প্রদক্ষিণ করলে তারা কা'বা শরীফের পার্শ্বে ত্বাওয়াফ করার ন্যায় পুণ্য লাভে ধন্য হবে। এটিই ছিল দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলে দাবীদারদের ধর্মীয় অবস্থা।

একইভাবে খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ইতিহাসও নবী ও সালেহীনদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে পরিপূর্ণ ছিল। শয়তান তাদেরকে নবী ও সালেহীনদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এতই বাড়াবাড়িতে নিমজ্জিত করেছিল যে, তারা নবীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট নিদর্শনাদি অন্বেষণ করে সে-গুলোকে ছোট ও বড় গির্জায় রূপান্তরিত করেছিল। উম্মুল মু'মিনীন আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইথিওপিয়ায় দেখা একটি গির্জা এবং তাতে চিত্রাকারে যে সব ভাস্কর্য রয়েছে সেগুলোর কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন। তিনি তা শুনে বলেন :

«أُولٰئِكَ إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ،أُولٰئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ»

“ঐ সকল খ্রিষ্টানরা তাদের মধ্যকার কোন সৎ মানুষ মারা গেলে সে লোকের কবরের উপর মসজিদ (গির্জা) নির্মাণ করতো

এবং সে মসজিদের দেয়ালে তাঁদের ছবি অঙ্কন করতো, আল্লাহর দৃষ্টিতে এরা সব চেয়ে নিকৃষ্ট জাতি।”[৪০০]

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা মতে সৎ মানুষদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এ ধরনের অতিরঞ্জন ও সীমালঙ্ঘন করাই হচ্ছে অতীতের বিভিন্ন জনপদের শির্কে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার মূল কারণ। উম্মতে মুহাম্মদী যাতে এ ধরনের কর্মে লিপ্ত না হয়, সে জন্য তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন :

«إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ»

“সকল ক্ষেত্রে শরী‘আত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা থেকে তোমরা নিজেদেরকে বিরত রাখবে কারণ; এ সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের পূর্বেকার জনপদের ধ্বংস করেছে।”[৪০১]

দ্বিতীয় কারণ : পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ :

নবী-রাসূল ও সৎ মানুষদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করে শির্ক করার পাশাপাশি মানুষের শির্কে নিমজ্জিত

---

[400].বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুস সালাত, বাব নং ১৪, হাদীস নং ৪১৭; ১/১৬৪; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল মাসাজিদ, বাব নং ৩, হাদীস নং ৫২৮; ১/৪৫০; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ১/৪৭।

[401].নাসাই, প্রাগুক্ত; বিতাবুল মানাসিক, বাব : বয়ানু ইলতেকাতিল হাসা; ৩/২১৮; ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ১/২১৫।

হওয়ার অপর কারণ হচ্ছে- বাপ-দাদা ও চৌদ্দপুরুষের অন্ধ অনুসরণ। এর ফলে তারা পূর্বপুরুষদেরকে যে সকল কর্মকাণ্ড করতে দেখেছে সেটাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে। পূর্ব পুরুষদের কাজগুলো সুস্থ বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য কি না, মুহূর্তের জন্যেও তারা তা ভেবে দেখতে রাজি হয় নি। উদাহরণস্বরূপ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর জাতির লোকদের কথাই বলা যায়, তিনি যখন তাদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে একটু ভাবতে বললেন, আরো বললেন : তোমরা যে সকল মূর্তির পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনের সময় আহ্বান করে যাদের উপাসনা করছো, তারা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায়, অথবা তারা কি তোমাদের কোন কল্যাণ বা ক্ষতি করতে পারে? তখন তারা এ বিষয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই এক বাক্যে বলেছিল :

﴿بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ﴾ [الشعراء: ٧٤]

"আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এমনটি করতে পেয়েছি।"[৪০২]

তাদের এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে : তারা যা করছে তা সঠিক কি না, এ নিয়ে তাদের ভাববার কোনো অবকাশ নেই। তাদের দেব-দেবীগুলো তাদের ডাক শ্রবণ করে কি না বা এরা বাস্তবে

---

[402].আল-কুরআন, সূরা শু'আরা : ৭২।

তাদের কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে কী না, তাও খতিয়ে দেখার তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তারা বংশ পরম্পরায় এদের উপাসনার বিষয়টি পেয়ে এসেছে। আর এ পাওয়াটুকুই তাদের নিকট এদের উপাসনা করা সঠিক বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই তাদের অনুসরণ করা থেকে তারা বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হতে প্রস্তুত নয়!

অনুরূপভাবে মূসা আলাইহিস সালাম-এর জাতির দিকে তাকালেও একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর জাতির লোকদেরকে যখন তাদের দেবতাদের পূজা করা ছেড়ে দিতে বলেন, তখন তারাও বলেছিল:

﴿أَجِئۡتَنَا لِتَلۡفِتَنَا عَمَّا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَا﴾ [يونس: ٧٨]

"তুমি কি আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে আমরা যা করতে পেয়েছি তাথেকে আমাদেরকে বিমুখ করার জন্য আগমন করেছ।"[৪০৩]

বিবেকের বিচারে তাদের কর্মের সঠিকতা যাচাই করা ছাড়াই এরাও একইভাবে নিজেদের পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছে।

[403]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ৭৮।

একইভাবে আমরা যখন মক্কার মুশরিকদের দিকে লক্ষ্য করি, তখনও দেখতে পাই যে, এরাও কা'বা শরীফ ও অন্যান্য স্থানে রাখা মূর্তিসমূহের উপাসনা করার ক্ষেত্রে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করেছে। এরাও অতীত জাতির লোকদের ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছে :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ ﴾ [لقمان: ٢١]

"যখন তাদের বলা হয় : আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তা অনুসরণ করো, জবাবে তারা বলে : আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি।"[৪০৪]

এদের ব্যাপারে আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسۡبُنَا مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ ﴾ [المائدة: ١٠٤]

"যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে দিকে ও রাসূলের দিকে তোমরা এসো, তখন তারা বলে:

[404]. আল-কুরআন, সূরা লুকমান : ২১।

আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে আমরা যা করতে পেয়েছি, তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।”[৪০৫]

মূর্তি পূজার কারণ :

মূর্তি পূজার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, অতীতের সাধারণ এবং বিশেষ লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন কারণে মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। সাধারণ ধার্মিক লোকেরা মৃত সৎ লোকদের সম্মান করতে যেয়ে তাঁদের মূর্তি তৈরী করেছিল, আর বিশেষ অধার্মিক লোকেরা এ জগতের তারকারাজির প্রভাবে বিশ্বাসী হয়ে সে সব তারকার কাল্পনিক মূর্তি তৈরী করে এগুলোর সম্মান প্রদর্শন করেছিল। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন:

“সাধারণ মানুষদেরকে যে কারণটি মূর্তি পূজা করতে উৎসাহিত করেছে তা হলো, মৃতদের সম্মান প্রদর্শন (تعظيم الموتى) করা। কারণ; মূলত এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তারা মৃত ব্যক্তিদের আকৃতিতে মূর্তি নির্মাণ করেছিল। আর যে বিষয়টি বিশেষ লোকদেরকে নক্ষত্রের মূর্তি তৈরী করে এর উপাসনা করতে উৎসাহিত করেছিল, তা হলো : নক্ষত্রসমূহের সম্মান প্রদর্শন (تعظيم الكواكب) করা। উদাহরণস্বরূপ সূর্য দেবতার

---

[405]. আল-কুরআন, সূরা মায়েদাহ্ : ১০৪।

পূজারীদের কথাই বলা যায়, তারা সূর্যের ব্যাপারে এ-ধারণা করে যে, এটি হচ্ছে আকাশের রাজা এবং এটি একটি ফেরেশতা। তার রয়েছে আত্মা, বুদ্ধি ও বিবেক। এটিই হচ্ছে সকল নক্ষত্রপুঞ্জ ও চাঁদের আলো প্রদানের মূল উৎস ...কাজেই এর সম্মান পাওয়ার মত যোগ্যতা রয়েছে। এ কারণেই সূর্য পূজারীরা সূর্যোদয়, দ্বিপ্রহর ও তা অস্ত যাওয়ার সময় তাকে সেজদা করে থাকে।"[৪০৬]

আমার মতে প্রচীনকালের লোকদের শির্কে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য মৃত সৎ মানুষ ও নক্ষত্র সমূহের মূর্তির সম্মান প্রদর্শন করাকে কারণ হিসেবে দায়ী করা গেলেও পরবর্তী লোকদের শির্কে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য শুধু সে কারণই দায়ী নয়, বরং এর সাথে তাদের বিশ্বাসগত আরো নানাবিধ কারণ সংযুক্ত হয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে :

তৃতীয় কারণ : দেব-দেবীরা কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা :

তারা তাদের দেব-দেবীদেরকে মানুষের কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের ব্যাপারে সামর্থ্যবান বলে মনে করতো। এ ধারণার ভিত্তিতেই তারা তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করতো। বৃষ্টি না হলে তারা এদের কাছে বৃষ্টি কামনা করতো

---

[406]. ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, এগাছাতুল লাহফান; ২/১৭৪, ১৭৫।

এবং বৃষ্টি হলে তা এদেরই দান বলে মনে করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করেন বলে তাঁকে যে কোনো সময় দেব-দেবীদের অনিষ্টের শিকার হওয়ার ব্যাপারেও তারা ভয় প্রদর্শন করতো। দেব-দেবীদের অকল্যাণের ভয়ে তাদের নামে মিথ্যা শপথ করা থেকে বিরত থাকতো... ইত্যাদি।

চতুর্থ কারণ : দেব-দেবীদের আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মাঝে মাধ্যম বলে মনে করা :

তারা অলি ও ফেরেশতাদের নামে নির্মিত মূর্তিসমূহকে আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে মনে করতো। তাদের মধ্যস্থতায় আল্লাহর নিকট থেকে পার্থিব কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণ কামনা করতো। এদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এদের উপাসনা করতো।

পঞ্চম কারণ : দেব-দেবীদেরকে শাফা'আতকারী বলে মনে করা

তারা তাদের দেব-দেবীদেরকে সাধারণ মানুষদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফা'আতকারী বলে মনে করতো। এদের শাফা'অতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে পার্থিব কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য এদের কাছে তাদের প্রয়োজনের কথা জানাতো।

এছাড়াও আরো কতিপয় কারণ রয়েছে যা নিয়ে সুক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর প্রেরিত ধর্মে বিশ্বাসীদের মাঝে শির্ক সংঘটিত হওয়ার জন্য উপর্যুক্ত কারণসমূহই বিশেষভাবে দায়ী। আর যারা আল্লাহর প্রেরিত ধর্মে বিশ্বাসী ছিল না, তারা চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ ও নক্ষত্রকে তাদের জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে উপকারী মনে করার কারণে এদের সম্মান করতে যেয়ে বিভিন্ন উপায়ে সেগুলোর উপাসনা করেছে।

প্রথম অধ্যায়ের সারকথা :

শির্ক অপরাধটি সকল অপরাধের মধ্যে একটি নিকৃষ্ট অপরাধ। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। কারণ, তা যদি শির্কে আকবার এর অন্তর্গত হয়, তাহলে এটি তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিস্কার করে দিবে। আর তা যদি শির্কে আসগার এর অন্তর্গত হয়, তবে এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিস্কার না করলেও এথেকে সতর্কতা অবলম্বন না করলে এটিও মানুষের পরকালীন মহা বিপদের কারণ হতে পারে।

পৃথিবীর আদি মানুষেরা প্রারম্ভে তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল; কিন্তু তাদের চির শত্রু শয়তানই তাদেরকে এক্ষেত্রে মতবিরোধে লিপ্ত করেছে। ফলে তাদের কিছু সংখ্যক লোক তাওহীদের উপর

প্রতিষ্ঠিত থাকলেও অবশিষ্টরা বিবিধ কারণে মুশরিক এবং নাস্তিকে পরিণত হয়েছে।

মানুষের মাঝে তাওহীদী চিন্তাধারা পুনরায় চালু করার জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু যখনই মানুষেরা তাঁদের শিক্ষা থেকে দূরে চলে গেছে তখনই তারা পুনরায় শির্কে নিমজ্জিত হয়েছে।

প্রারম্ভে যখন নবী ও অলিদের সম্মান প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে শির্ক সংঘটিত হয়, তখন তা ইবাদত তথা আল্লাহর উলূহিয়্যাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল;কিন্তু কালের পরিক্রমায় তা জ্ঞান (علم), পরিচালনা (تصرف) ও অভ্যাস (عادات) তথা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আরব জনপদে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তাঁর জাতির শির্ক আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতে সমভাবে বিরাজমান ছিল। তারা আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যে তাদের দেব-দেবীদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছিল।

তাদের কোনো কোনো দেবতা ছিল অতীতের সৎ মানুষের মূর্তি বিশেষ। তারা ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে মনে করতো।

আল্লাহর সাথে ফেরেশ্তাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে মনে করে লাত, ‘উয্যা ও মানাত নামে মনগড়া তিনজন ফেরেশ্তাকে উদ্দেশ্য করে তিনটি দেবী গ্রহণ করেছিল। সেগুলোকে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম হিসেবে মনে করতো। অনুরূপভাবে সেগুলোকে তাদের পার্থিব কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য আল্লাহর নিকট শাফা‘আতকারী বলেও মনে করতো। এ দু’টি ধারণাকে কেন্দ্র করে তারা বিভিন্নভাবে এদের উপাসনাও করতো; যদিও লাত নামের পাথর সর্বস্ব দেবীটি একজন সৎ ইয়াহূদী ব্যক্তির বসার স্থানের উপর নির্মিত হয়েছিল। আর ‘উয্যা’ নামের দেবীটি তিনটি ছোট-বড় আকারের বাবলা গাছকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল; যার মধ্যে একটি জিন-পরী বাস করতো এবং এ-জিনই সাধারণ জনগণকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করতো। অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্থানে তাদের আরো কতিপয় গৃহ ছিল, যেগুলোকে তারা কা‘বা শরীফের ন্যায় মর্যাদার অধিকারী ও পবিত্র বলে জ্ঞান করতো।

আল্লাহ তা‘আলা যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের ও সকল বিশ্ববাসীর জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তিনি তাদেরকে সকল দেব-দেবী ও প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করতে বলেন, তখন তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছিল এ দলীলের ভিত্তিতে যে, তারা ইব্রাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর ধর্মের অনুসারী এবং আল্লাহর

গৃহের রক্ষক এবং তারাই রয়েছে সঠিক দ্বীন ও সত্য ধর্মের উপর। কারণ, তারা কা‘বা শরীফের ত্বওয়াফ করে, হজ্জ ও ‘উমরা করে, হাজীদের পানি পান করায় ও তাদের সেবা করে। আর মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করবে না এ কারণে যে, তারা তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এ সব দেব-দেবীদের পূজা করতে দেখেছে। তাই এদের পূজা করাও দ্বীনে ইব্রাহীমেরই অংশ।

মহান আল্লাহ তাদের এ জাতীয় বক্তব্যের জবাবে পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিলেন- তারা তাদের দেব-দেবীদের আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম ও শাফা‘আতকারী হওয়ার ধারণার ভিত্তিতে এদেরকে কেন্দ্র করে যে সব কর্ম করে থাকে, সে সব কর্মের কারণে তারা তাঁর উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতে শির্কে লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে তারা দ্বীনে ইব্রাহীম থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেছে। তারা কাফির ও মুশরিকে পরিণত হয়েছে। তারা তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে সব উপাসনা ও সৎকর্ম করছে, তাঁর কাছে সেগুলোর আদৌ কোনো মূল্য নেই। অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দ্বীনকে মুশরিকদের মিথ্যা দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতকে তাওহীদ ও শির্ক পরিচয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দলীল প্রমাণাদি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে তাদেরকে সুস্পষ্ট দ্বীন এবং

সরল ও সঠিক রাস্তার উপর রেখে গেছেন। কেবল ধ্বংস প্রাপ্ত লোকজন ব্যতীত আর কেউই এ পথ থেকে ভ্রষ্ট হতে পারে না।